KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher মীর রেজাউর
Title চতুরঙ্গ	Size 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number : 46/7 46/8 46/9 46/10	Year of Publication : Nov 1985 Dec 1985 Jan 1986 Feb 1986
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : আব্দুর রউফ	Remarks :

I.D. Roll No : KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

নভেম্বর
১৯৮৫

চতুরঙ্গ

প্রাক-স্বাধীনতাপর্ব থেকে আজ পর্যন্ত, ভারতের জাতীয় আন্দোলনে তথা জনজীবনে বামপন্থার প্রভাব এত অকিঞ্চিৎকর কেন? ভারতীয় বামপন্থা কি তার জন্মসময় থেকেই একটি ঐতিহ্যচ্যুত স্লোগানসর্বস্ব রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং আচরণ হিসাবে অস্তিত্বরক্ষা করে আসছে? সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর প্রবন্ধে এইসব প্রশ্ন উত্থাপিত।

একটি য়োরোপীয় এবং প্রতিবেশী একটি এশীয় দেশের সঙ্গে প্রতিতুলনায় আমাদের জনস্বাস্থ্যসেবার তথ্যাশ্রিত পর্যালোচনা করেছেন ডা. চন্দনা মিত্র 'পশ্চিমবঙ্গের জনস্বাস্থ্যব্যবস্থা' নিবন্ধে।

বছরখানেক আগে যে অদ্ভুত শোক-উৎসবে দেশ শিউরে উঠেছিল, ঈগলের-চোখে-দেখা তারই এক বিবরণ।

বিতর্কিত 'পরমা' প্রসঙ্গে বাঙালি মূল্যবোধের নির্মোহ ব্যবচ্ছেদ ঘটিয়েছেন নবনীতা দেবসেন আর তরুণ সান্যাল দুটি রচনায়।

বাংলাদেশের নক্ষত্রকবি শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ এবং আবুল হোসেন, মনজুরে মওলার কবিতা।

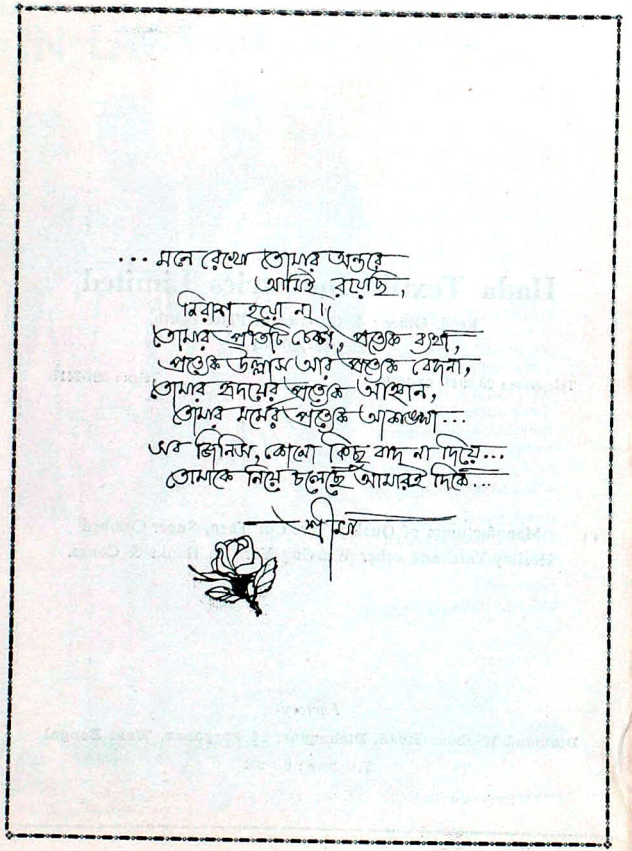

... মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যথা,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মনের প্রত্যেক আকাঙ্খা...
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...

—শ্রীমা

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

বর্ষ ৪৬। সংখ্যা ৭
নভেম্বর ১৯৮৫
কার্তিক ১৩৯২

ভারতবর্ষে বামপন্থার স্বরূপ ও ভবিষ্যৎ সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৫৩৭
পশ্চিমবঙ্গে জনস্বাস্থ্যব্যবস্থা চন্দনা মিত্র ৫৬৯

যাবার আগে আবুল হোসেন ৫৪৫
বহুদিন পর মাকে শামসুর রাহমান ৫৪৬
আষাঢ়ের রাতে আল মাহমুদ ৫৪৮
ছিঁড়ে যায় বই মনজুরে মওলা ৫৪৯

অশরীরীর শোকবিবরণী রঞ্জন ভাদুড়ী ৫৫০
ঢোলগোবিন্দ-র আত্মদর্শন সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৫৬০
পোকামাকড়ের ঘরবসতি সেলিনা হোসেন ৫৮৭
অলীক মানুষ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ৫৯২

গ্রন্থসমালোচনা ৫৯৮
আবুল হোসেন, কামাল হোসেন, তাপস বসু, আবদুর রউফ

আলোচনা ৬০৮
ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল, নবনীতা দেবসেন, বর্ণালী দাস

স্মরণে ৬২১
শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদচিত্র : রনেনআয়ন দত্ত
মুখপাতের ছবি। শুভাপ্রসন্ন
শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক নবজীবন প্রেস, ৬৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ থেকে
অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ,
কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

COLLINS DICTIONARIES

THE NEW COLLINS CONCISE ENGLISH DICTIONARY	55.00
COLLINS POCKET ENGLISH DICTIONARY	45.00
COLLINS COMPACT ENGLISH DICTIONARY	20.00
COLLINS ENGLISH LEARNER'S DICTIONARY	50.00
GEM MINI DICTIONARY	10.00
COLLINS GEM ENGLISH DICTIONARY	15.00
COLLINS GEM THESAURUS	15.00
COLLINS DICTIONARY OF ENGLISH	12.00
NEW COLLINS ENGLISH ROGETS THESAURUS	80.00
DICTIONARY OF ENGLISH PHRASAL VERBS AND THEIR IDIOMS	12.00

Rupa & Co.

15 Bankim Chatterjee Street
Calcutta-700 073
Also at :
Allahabad : Bombay : New Delhi

চতুরঙ্গ

প্রতি সংখ্যা তিন টাকা
সডাক গ্রাহকমূল্য বার্ষিক ৩৬ টাকা,
ষান্মাসিক ১৮ টাকা

এজেন্সির নিয়মাবলী

১। পাঁচ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না।

২। কমিশন শতকরা ২৫। পঁচিশ কপির ঊর্ধ্বে শতকরা ৩০।

৩। ডাক-খরচ আমরা বহন করি।

৪। কপি-পিছু দেড় টাকা আমাদের দপ্তরে জমা রাখতে হবে।

•

লেখকদের প্রতি নিবেদন

যাঁরা প্রকাশের জন্য কবিতা পাঠাবেন তাঁরা যেন অনুগ্রহ করে নকল রেখে পাঠান—অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠানো সম্ভব নয়।

অন্যান্য অমনোনীত রচনা যাঁরা ফেরত নিতে চান তাঁরা অনুগ্রহ করে উপযুক্ত পরিমাণে ডাক-টিকিট পাঠালে আমাদের সহায়তা করা হবে।

প্রেরিত রচনায় অপরিচিত বা স্বল্পপরিচিত বিদেশী ব্যক্তিনাম আর স্থাননাম থাকলে, সঙ্গে আলাদা একটি কাগজে ইংরেজি বড়ো হরফে সেগুলি লিখে দিলে উপকার হবে।

শিল্পী : শুভাপ্রসন্ন

ভারতবর্ষে বামপন্থার স্বরূপ ও ভবিষ্যৎ

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

এক

'বাম' শব্দটির তাৎপর্য কী? 'বামপন্থা' কাকে বলে? অভিধানে 'বাম'-শব্দটির অনেক অর্থ দেওয়া আছে। যথা—অশুভসূচক, প্রতিকূল, বিরোধী, পরাঙ্মুখ, ক্রূর, সুন্দর, মনোজ্ঞ, [তন্ত্রে] বামাচার অর্থাৎ মদ্যাদিপানরূপ আচার ইত্যাদি। 'পন্থা'-র বিশেষণ হিসাবে ব্যবহার হলে 'বাম'-এর তাৎপর্য কী হবে? প্রতিকূল বা বিরোধী পথ? সুন্দর বা মনোজ্ঞ পথ? ক্রূর পথ? বামাচারী পথ? প্রতিকূল বা বিরোধী পথ যদি হয়, তবে প্রশ্ন হবে—কোন্ পথের বিরোধী? কোন্ পথের প্রতিকূলতা? সুন্দর বা মনোজ্ঞ পথ যদি হয়, তবে অসুন্দর পথটি সম্পর্কে পূর্বাহ্নে কিছুটা ধারণা থাকা প্রয়োজন। 'বামপন্থা' যখন বলি, তখন নিশ্চয়ই সাধারণভাবে বামাচারকে বুঝি না, যদিও কতিপয় বামাচারী 'বামপন্থী' হতে পারেন, এবং ভোগসর্বস্ব সমাজে কতিপয় বামপন্থী 'বামাচারী'ও হতে পারেন।

আমার মনে হয় রাজনীতিতে, সমাজদর্শনে, কিংবা নীতিশাস্ত্রে প্রচলিত কোনো ধারণা কিংবা শব্দের সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়া বোধহয় সম্ভব নয়। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্ম, অধর্ম, রক্ষণশীলতা, চরমপন্থা, বামপন্থা—এই ধরনের শব্দের লক্ষণনির্ণয় কূটতার্কিকেরও বোধহয় অসাধ্য। গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের কথাই ধরা যাক। এদের কত না বিচিত্র রূপ। প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র, লিবারেল গণতন্ত্র, টোট্যালিট্যারিয়ান গণতন্ত্র, প্রলেটারীয় গণতন্ত্র, জনগণতন্ত্র, নয়া গণতন্ত্র, নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র, ইসলামি গণতন্ত্র ইত্যাদি। নানা ধরনের—নানা বর্ণের—নানা তাৎপর্যের—কত গণতন্ত্রের কথাই না আজকাল শোনা যায়। তেমনি, ফেবিয়ান সমাজতন্ত্র, গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র, পেতি-বুরজোয়া সমাজতন্ত্র, মার্কসীয় সমাজতন্ত্র, গান্ধীবাদী সমাজতন্ত্র, সোভিয়েত সমাজতন্ত্র, চৈনিক সমাজতন্ত্র, কিউবার সমাজতন্ত্র—সমাজতন্ত্রও তো আজ বহুরূপী। 'বামপন্থা'র কি একটি রূপ? চরম বামপন্থা, উগ্র বামপন্থা, বামসংকীর্ণতা, নরম বামপন্থা, বামবিচ্যুতি, স্তালিনোত্তর যুগের নয়া বামপন্থা—রাজনীতির পরিভাষায় এহেন কত শব্দেরই না ছড়াছড়ি। তাছাড়া, স্থানকালপাত্রভেদে 'বামপন্থা'র গতিপ্রকৃতিও আলাদা। প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয়—'বামপন্থা'ও কি এমন একটি টুপি যা সকলেই মাথায় দেয়? সেজন্যই কি 'বামপন্থা'-র আকার-প্রকার নেই? বামপন্থা কি শুধুই শব্দব্রহ্ম?

দুই

রাজনৈতিক বিশ্লেষণ হিসাবে 'বাম' আর 'দক্ষিণ' শব্দ-দুটির ব্যবহারের সূত্রপাত নেপোলিয়ন-উত্তর ফরাসি-দেশে। তখন 'চেম্বার অব ডেপুটি'-র পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছে। ওই সভার একদিকে আসন ছিল উদারনৈতিক লিবারেলদের। অন্যদিকে অতিরাজতন্ত্রীদের (আলট্রা-রয়্যালিস্টস)। সভা পরিচালনা করতেন একজন স্পীকার। যাঁরা স্পীকারের বাঁ-দিকে বসতেন—প্রথাগত-ভাবে—তাঁদেরই বলা হত 'বাম'। আর যাঁরা ডান-দিকে বসতেন, তাঁদের বলা হত 'দক্ষিণ'। ১৮৭০ সালের মধ্যে শব্দ দুটি সমগ্র ইউরোপ ভূখণ্ডে চালু হয়। কিন্তু সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে এদের ব্যঞ্জনা ক্রমশ পরিবর্তিত হতে থাকে। একদা সংসদের স্বাতন্ত্র্যের জন্য যাঁরা সংগ্রাম করতেন তাঁরাই ছিলেন 'বামপন্থী'। অপর-পক্ষে, যাঁরা রাজতান্ত্রিক কর্তৃত্বের সমর্থক ছিলেন, তাঁদেরই বলা হত 'দক্ষিণপন্থী'। ইউরোপে ক্রমশ ইতি-হাসের রঙ্গমঞ্চে শ্রমিকশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে, সমাজ-তান্ত্রিক ধ্যানধারণা বিস্তার লাভ করে। ইতিহাসের ধারাপথে দক্ষিণপন্থীদের ক্রমাবলুপ্তি লক্ষ করা যায়। এই অবস্থায় 'বাম' 'দক্ষিণ' শব্দ-দুটিরও অর্থান্তর ঘটে। সমাজপরিবর্তন এবং অর্থনৈতিক সম্পদবণ্টন সম্পর্কে কার কী মতামত, তার ভিত্তিতেই শব্দ-দুটির ব্যবহার দেখা যায়। আজ পর্যন্ত, সাধারণভাবে, ওই অর্থেই 'বাম'-'দক্ষিণে'র পার্থক্য সূচিত হয়। যাঁরা সমাজের চিরায়ত ঐতিহ্যে এবং স্থিতিশীলতায় আগ্রহী এবং যথাস্থিত-বাদী—স্টেটাস-কো-পন্থী, তাঁরাই 'দক্ষিণপন্থী'। অন্য-দিকে, যাঁরা সমাজের আমূলপরিবর্তনপ্রয়াসী—যাঁরা নতুন অর্থনীতি—নতুন সমাজ—নতুন মানুষ গড়তে চান—যাঁরা রক্ষণশীলতার বিরোধী—তাঁরাই 'বামপন্থী'।

সমাজজীবনে, নানাকারণসম্পিপাতে, পুরাতনের সঙ্গে নূতনের, গতানুগতিকতার সঙ্গে অভিনবের, মৃতের সঙ্গে বিচারনিষ্ঠতার, পুরাগত শাস্ত্রপ্রামাণ্যের সঙ্গে ব্যক্তিসিদ্ধান্তের বিরোধ দেখা দেয়। সেই প্রাচীন কাল হতে আজ পর্যন্ত ভারতীয় সমাজেও দর্শনচিন্তায়, ধর্ম-আন্দোলনে, কাব্যরীতিতে, কত নূতন তত্ত্ব, কত নূতন বক্তব্য, কত নূতন দৃষ্টিভঙ্গি, কত নূতন পন্থার প্রতিষ্ঠা হয়েছে—কত ভাঙাগড়ার স্মৃতি জমে আছে। ইতিহাসই তার সাক্ষী। একদিকে বেদসম্মত, আস্তিক্যবাদী চিন্তা-ধারা : অন্যদিকে বেদবিরোধী নাস্তিক্যবাদী চিন্তাধারা ; একদিকে সৃষ্টিতত্ত্ববাদী, অন্যদিকে ক্রমবিকাশবাদী ; এক-দিকে বস্তুবাদী, অন্যদিকে নির্বস্তুক চিৎ-শক্তি-বাদী ; একদিকে বর্ণাশ্রম তথা জাতিভেদ-পন্থী, অন্যদিকে মানব-পন্থী ; একদিকে জ্ঞানমার্গী, অন্যদিকে কর্মযোগী ; এক-দিকে বেদাত, অন্যদিকে তন্ত্র—সত্যই ভারতবর্ষ সহা-বস্থানের এক বিচিত্র দেশ! কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, কোনো মতবাদ 'বাম', অপর কোনো মতবাদ 'দক্ষিণ'—এই ধরনের বিশেষণপ্রয়োগ তৎকালে চোখে পড়ে নি। কারণ, শব্দ দুটি উনিশ শতকের এবং আধুনিক কালে আমাদের দেশে আমদানি হয়েছে।

রাজনৈতিক পরিভাষায় অধুনা শব্দ-দুটির বহুল-প্রচলন দেখা গেলেও ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের বিভিন্ন পর্বেও শব্দ দুটির ব্যাপক প্রচলন ছিল না। ওই আন্দো-লনে উগ্রপন্থী, সন্ত্রাসবাদী, নরমপন্থী, চরমপন্থী, পরিবর্তনকামী, পরিবর্তনবিরোধী, সমাজতন্ত্রী, সাম্য-বাদী, বণিক, শিল্পপতি, কৃষক, শ্রমিক, মহিলা—ধর্মপ্রাণ মহাত্মা, অধার্মিক ক্ষুদ্রাত্মা—সকলেই ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে—এখনকার মতো—'বামপন্থা' আর 'দক্ষিণপন্থা'-র এত পুনরুক্তি দেখা যেত না।

তিন

ভারতের 'বামপন্থা'-র বৈশিষ্ট্যটি নিয়ে প্রথমে আলোচনা করেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। পরবর্তী কালে তথাকথিত প্রগতিশীল মহলে—বিশেষত, ভারতীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রবক্তাদের প্রচারে, লেখায়, শব্দ-দুটির খুবই ছড়াছড়ি। নেতাজী ছিলেন আপোসহীন সংগ্রামী এবং জাতীয়তাবাদী। ১৯৪১ সালে 'বামপন্থা'-র যে লক্ষণ তিনি নির্দিষ্ট করতে চেয়েছিলেন, সেই লক্ষণ হয়তো পর্যাপ্ত ছিল না। হয়তো নেতাজীর 'বামপন্থা'-র বিশ্লেষণে একদেশদর্শিতা ছিল। তবুও তাঁর বক্তব্যে দুর্বোধ্যতা নেই। নেতাজীর প্রশ্ন ছিল : "বামপন্থার স্বরূপ কী?" তিনি লিখেছেন—"যখন বিভিন্ন ব্যক্তি বা সংগঠন দাবি করে "আমরা বামপন্থী", তখন কোন্ মাপ-কাঠিতে বিচার করে বলা সম্ভব—"এরা সত্যই বামপন্থী —ওরা নয়।" নেতাজী লিখেছিলেন, "ভারতবর্ষের

জীবনের বর্তমান অধ্যায়ে বামপন্থার একমাত্র লক্ষণ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা।" তাঁর মতে, প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী তিনিই যাঁর নির্ভেজাল স্বাধীনতায় আস্থা আছে,—মহাত্মা গান্ধীর মতো "শুধু স্বাধীনতার মর্ম-বস্তুতে নয়"। নেতাজীর মতে 'বামপন্থা'-র দ্বিতীয় লক্ষণ হল—উদ্দেশ্যসাধনের জন্য "আপোসহীন সংগ্রাম"। নেতাজীর বিশ্লেষণে মহাত্মা গান্ধী নির্ভেজাল স্বাধী-নতায় বিশ্বাসী ছিলেন না, আপোসহীন সংগ্রামেও তাঁর আস্থা ছিল না। উপরন্তু, গান্ধীবাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিত্তবানদের সঙ্গে (হ্যাভস্)। সর্বোপরি, সমাজ-সংগঠন সম্পর্কে গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গি মধ্যযুগীয়, এবং সমাজতন্ত্রবিরোধী। গান্ধীবাদের এই বিশ্লেষণ যে ভ্রান্ত, ইতিহাস তা প্রমাণ করেছে। এখানে সেই প্রশ্ন আলো-চনার অবকাশ নেই। তবে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের নায়কতা, চরিত্র, গতিপ্রকৃতি আর সম্ভাবনা সম্পর্কে শুধু নেতাজী নন, প্রায় সব 'বামপন্থী'রা এবং কমিউনিস্টরাও কোনোদিনই বিভ্রান্তি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হন নি। নেতাজী তাঁর নিজস্ব বিশ্লেষণের ভিত্তিতে 'বামপন্থী সংহতি কমিটি' গঠনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। সাময়িক-ভাবে সমাজতন্ত্রী, কমিউনিস্ট আর বামপন্থীরা ওই কমিটিতে ছিলেন। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে নেতাজীর উপলব্ধি হয়, ওই 'বাম-সমন্বয়' ছিল বালির বাঁধ নির্মাণের মতো অসাধ্য ব্যাপার। বাম-সমন্বয়ের অচিরে ভরাডুবি ঘটে, এবং নেতাজী তাঁর নিজস্ব পথপরিক্রমা আরম্ভ করেন।

চার

ভারতের 'বামপন্থা' যে কোনোদিনই স্বস্থিত হতে পারে নি তার অন্যতম কারণ, গান্ধীজি এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে এর অব্যবস্থিতচিত্ততা। যে মানবেন্দ্র-নাথ রায়ের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য দেখে পণ্ডিত নেহরু মুগ্ধ হয়েছিলেন, সেই মানবেন্দ্রনাথ রায়ও ১৯২২ সালে লিখেছিলেন, "গান্ধীবাদের আসন্ন পতনের সঙ্গে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের একটি রোমানটিক আর উত্তেজনাময় অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটবে। এর থেকে প্রমাণ হবে যে, সামাজিকভাবে বিপ্লবী কোনো আন্দো-লন প্রতিক্রিয়ার শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে না" (ইনডিয়া ইন ট্রানজিশন)। ১৯৩১ সালে রজনী পাম দত্ত লিখলেন : "গান্ধীবাদের মৃত্যুর্বু অবস্থা ইতিমধ্যে দেখা দিয়েছে ; এর সম্ভাবনা নিঃশেষিত হয়ে গেছে।" (লেবার মানথলি, মে ১৯৩১) কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করেছিল, গান্ধীবাদ আরও দীর্ঘকাল জীবিত ছিল এবং দীর্ঘকাল বামপন্থী ও ভারতীয় মার্কসবাদীদের ইতি-হাসচেতনাকে বিদ্রূপ করে ভারতের ভাগ্যবিধাতা হিসাবে পাদপ্রদীপের সম্মুখে বর্তমান ছিল।

গান্ধীজি কোন্ 'শ্রেণী'র প্রতিভূ এ প্রশ্ন নিয়েও বামপন্থী তথা মার্কসবাদীদের কোতাঁর তর্কের কোনো-দিনই নিষ্পত্তি হয় নি। কখনো শোনা গেছে, গান্ধীজি 'পেতিবুরজোয়া' মতাদর্শের প্রতিনিধি, সম্পত্তিবানদের স্বার্থরক্ষাই যাঁর কাজ। কখনো কোনো মার্কসবাদী পণ্ডিত বলেছেন, "গান্ধীবাদ হল 'বুরজোয়া ও জমি-দার'দের দর্শন।" কোনো মার্কসবাদী তাত্ত্বিক বলেছেন, "ভারতীয় রাজনীতির শান্তিবাদী শয়তানী প্রতিভা হলেন গান্ধীজি (ইন্ডিল জিনিয়াস)। লেবার মানথলি, সেপটেমবর ১৯৪২)। এই ধরনের বহু মণিমুক্তার ছড়া-ছড়ি বাম তথা তাৎকালিক মার্কসবাদী সাহিত্যে। ১৯২৯ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত—যখন গান্ধীজি গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেলেন—গান্ধীজি প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই নেতিবাদী লাইনই ভারতের কমিউনিস্ট-'বাম'-দের পথানির্দেশিকা ছিল। এই ভুলের মাশুল তারা দিয়েছে এবং আজও দিচ্ছে।

গান্ধীযুগে (১৯২০-৪৮) ভারতের বামপন্থী আন্দোলন সংহত আন্দোলনের রূপ পেল না কেন? নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে অকংগ্রেসি দলগুলির মোরচা গঠনে একদা তৎপরতা দেখা গিয়েছিল। গান্ধী-যুগে তো সমাজতন্ত্রী দল, কমিউনিস্ট পার্টি এবং অন্যান্য নানা ধরনের 'বাম' দল রাজনীতির প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হয়েছে। এইসব দল নতুন ধাঁচে সংগ্রামী শ্রমিক-সংগঠন, কৃষকসংগঠন গড়ে তুলেছে। এদের পরিশ্রমের ফলে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের সাধারণ প্রবাহে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের ধারা এসে মিশেছে। লিবারেল গণ-তন্ত্রের প্রত্যয়গুলির পরিবর্তে এরাই শ্রেণীসংগ্রাম-তত্ত্ব, মূলধনী সমাজের অবক্ষয় আর অবলুপ্তির তত্ত্ব, শ্রেণী-হীন, শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজের অনিবার্য উদয়ের কাহিনী জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেছে। এরাই

বাঁধা—যে সুরের মধ্যে আছে ঐতিহ্য, ধর্ম, ঐতিহাসিক কারণবিন্যস্ত সমাজের 'বিশেষ গড়ন',—আছে প্রথা, বিশ্বাস, সংস্কার ; আছে আরও নানা উপাদান—এসব কথা বামপন্থীরা বোঝে নি। ইউরোপীয় সমাজে সামন্ততন্ত্রের পরে যেমন মূলধনতন্ত্রের উদয়, এবং মূলধনী সমাজের সাম্যাবস্থাহীনতা থেকে যেমন সমাজতন্ত্রের অভ্যুদয়, সেই ছকবাঁধা চিন্তাধারায় অভ্যস্ত হয়ে বামপন্থীরা ভারতবর্ষে 'সোভিয়েত পথ' কিংবা 'চৈনিক পথ' কিংবা 'কিউবার পথ' আমদানি করবার প্রয়াস পেয়েছে, ইতিহাসকে গড়তে চেয়েছে ইতিহাস-অতিক্রমী কল্পিত মতবাদের সাহায্যে। শান্তিপূর্ণ পথে নতুন আধুনিক সমাজে উত্তরণ, না রক্তাক্ত বিপ্লবের পথে—এই প্রশ্নে বামপন্থীরা তথা মার্কসবাদীরা কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে নি।

দ্বিতীয়ত, বামপন্থীরা বরাবরই নেতিবাদের ভক্ত। ভারতের স্বাধীনতা 'ঝুটা', ভারতের সংবিধান 'মেকি', ভারতের পরিকল্পনা (প্ল্যান) আসলে "চোথা কাগজ", ভারতের শিল্পবিকাশ তথা কৃষির অগ্রগতি সবই 'মায়া' ; ভারতের কংগ্রেস দল প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, শান্তিপ্রয়াসী দল তো নয়ই, বুরজোয়া-জমিদারদের দল, ভারতের স্বনির্ভর অর্থনীতি, শিল্পায়ন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি—সবই বন্ধ্যামাতার মতো অসৎ (নন-একজিসটেনট) এই ধরনের বক্তব্য বামপন্থীদের প্রচারে, পুস্তিকায়, দেওয়াল-লিখনে, শ্লোগানে হামেশাই পাওয়া যাবে। এর ফল হয়েছে জাতীয় প্রবাহে এরা কোনো স্থায়ী আসন লাভ করে নি, সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থেকেছে।

তৃতীয়ত, অন্যদিকে, 'প্রকৃত স্বাধীনতা' কেমন, 'সাচ্চা সংবিধান' কেমন, ভারতবর্ষের শিল্পায়ন তথা আধুনিকীকরণ কোন্ উন্নততর পদ্ধতিতে সম্ভব, ভারতবর্ষের বর্তমান পরিকল্পনার বিকল্প কী হতে পারে, অশ্রু ও স্বেদ ছাড়া বিকাশশীল দেশে অগ্রগতি কি সম্ভব—এইসব প্রশ্নে বামপন্থীরা প্রায়-মৌন। কিভাবে 'বামপন্থী' কায়দায় ভারতের মতো ঐতিহ্যানুসারী সমাজ আধুনিক শিল্পের প্রযুক্তিকৌশল শিখবে, বিকাশধারায় কিভাবে মূলধনসঞ্চয় হবে, কিভাবে একটার পর একটা স্তর অতিক্রম করে চূড়ান্ত সমৃদ্ধির স্তরে পৌঁছবে, 'বামপন্থী' বক্তব্যে এই বিকাশের কোনো 'তত্ত্ব' নেই। বিশেষত জনবহুল, পিছিয়েপড়া দেশে, পারলামেন্টারি কাঠামো বজায় রেখে, দ্রুত উন্নয়নের পথ কী—এ প্রশ্নেরও জবাব নেই।

চতুর্থত, কৃষিপ্রধান নীচু-কারিগরি বিদ্যার সমাজকে শিল্পায়িত সমাজে রূপান্তরিত করা, উঁচু কারিগরি বিদ্যা তথা বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতির শক্তিকে মানুষের আয়ত্তে এনে উৎপাদনশক্তিকে বেশি-বেশি জাগিয়ে তুলে বৈষয়িক সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হওয়া—এর নামই 'বিকাশ', 'উত্তরণ', 'প্রগতি'—কিংবা 'আধুনিক' হয়ে ওঠা। এই আধুনিক হয়ে ওঠাই ভারতবর্ষের বর্তমান পর্বে, বৈপ্লবিক রূপান্তরের অপর নাম। বৈপ্লবিক রূপান্তর প্রকাশ পায় সামাজিক, রাজনৈতিক, আইনি, বৈষয়িক, অনুশাসনগত এবং অন্যান্য বিধি ও প্রথার 'গুণগত' পরিবর্তনের মাধ্যমে। রূপান্তর আরও ঘটে জীবনচর্যায়, মূল্যবোধে এবং চৈতন্যে। বিপ্লব শুধু ধরনা-ধর্মঘট, ঘেরাও, অবস্থান, কর্মবিরতি, কাজে ফাঁকি, মারদাঙ্গা, ব্যক্তিসন্ত্রাস, লাগাতার ধর্মঘট, বন্ধ্, রেল-রোখো, ব্যারিকেড লড়াই, গৃহযুদ্ধ, সশস্ত্র লড়াই নয়। বিপ্লব-এর ব্যঞ্জনা গভীরতর। অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ, বিচার-আচার, প্রথা, বিশ্বাস, মানসিকতা এবং চরিত্রের আমূল, গুণগত পরিবর্তনের নামই 'বিপ্লব'। বামপন্থা 'বিপ্লব'কে স্থূলতা দান করে নিরুদ্দেশী, অরাজক, ভালগার অর্থনৈতিক আন্দোলনের এবং অন্যান্য সংকীর্ণ আন্দোলনের সঙ্গে মিশে গেছে। ফলে, সমাজের উৎপাদনব্যবস্থা হতে আরম্ভ না করে কল্পনাবিলাসী বণ্টনসাম্যের দাবিতে অর্থনীতিবাদকে সমাজপ্রগতির নামে চালাবার চেষ্টা করেছে। ফলে অগ্রগামী অংশের প্রতিভূ হয়ে না উঠে 'বামপন্থা' সমাজের ভোগাসক্তির বাসনাকে জাগিয়ে তুলেছে। কঠোর পরিশ্রম করবার মানসিকতা, কর্মনৈতিকতা, সময়নিষ্ঠা, কর্তব্যপরায়ণতা, নাগরিক চেতনার বিস্তার, স্বাজাত্যবোধ আর দেশপ্রেমকে সমাজে ছড়িয়ে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ না করে তাৎকালিক স্বার্থে সমাজের লুম্পেনশক্তিকে স্বাধিকারপ্রমত্ত করে তুলেছে। এই শক্তি দক্ষিণপন্থা, রক্ষণশীলতা এবং ফ্যাসিবাদেরও উর্বর ক্ষেত্র।

পঞ্চমত, আধুনিক সমাজ গড়ে তোলবার জন্য প্রয়োজন সাক্ষরতার—প্রয়োজন সর্বজনীন শিক্ষার। প্রয়োজন কৃষি তথা শিল্প-উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখার সঙ্গে পরিচিত কুশলী দক্ষ কর্মী-দলের। প্রয়োজন গ্রামীণ কূপমণ্ডুকতার জায়গায় নাগরিক মানসিকতা, ক্রমবর্ধমান যন্ত্রমনস্কতা, জনস্বাস্থ্য-চেতনা, নাগরিক দায়িত্ববোধ। সমাজকে আধুনিকতার পথে বিকশিত করতে হলে এ যুগে প্রয়োজন বিশেষ কোনো 'শ্রেণী'র—কিংবা 'দলে'র—কিংবা 'গোষ্ঠী'র বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ; দেশের আধুনিকীকরণে আগ্রহী, শিল্প-উৎপাদনে, কৃষির বিকাশে, যন্ত্র এবং আধুনিক কৃৎকৌশল তৈরিতে আর আমদানিতে তৎপর কোনো 'কর্তৃত্ব'-এর। কোন 'কর্তৃত্ব' যদি না থাকে, রাষ্ট্র যদি নবনীত-কোমল হয়, গণতন্ত্র যদি অরাজকতায় পর্যবসিত হতে থাকে, বিচ্ছিন্নতাবাদী—আঞ্চলিক—জাতপাতনির্ভর—সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি যদি প্রবল হয়ে উঠতে থাকে, তবে বুঝতে হবে—সেদেশে প্রগতিবিরোধী, প্রতিক্রিয়ার শক্তিই প্রবল হচ্ছে, 'বামপন্থা' সেদেশে ক্রমক্ষীয়মাণ শক্তি। ভারতের 'বামপন্থা'র প্রধান ত্রুটি জাতীয় কর্তব্যাকর্তব্য সম্পর্কে এর বালখিল্য বোধ। দেশপ্রেমিক, দেশগঠন-প্রয়াসী, শান্তিকামী, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক শক্তি-গুলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে, ঐতিহ্যানুসারী অচলায়তন শক্তির বিরুদ্ধে ভারতের 'বামপন্থা' কোনো "জাতীয় পুনর্গঠনের মঞ্চ" গড়তে পারে নি। অপরপক্ষে এইসব শক্তির সঙ্গে মিতালি করেছে সাময়িক স্বার্থের প্রয়োজনে। ভারতীয় 'বামপন্থা'র সারবস্তু শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে কংগ্রেসবিরোধিতায়। সমকালীন বামপন্থী কে? জবাব একটাই—যিনি কংগ্রেসবিরোধী। কংগ্রেস-বিরোধিতাই যেহেতু বর্তমানে ভারতীয় 'বামপন্থা'র স্বরূপলক্ষণ, সেইহেতু 'বামপন্থা' আঞ্চলিক, সাম্প্রদায়িক, রক্ষণশীল শক্তির সঙ্গে হাত মেলানোয় কোনো দ্বিধা করে নি, সূক্ষ্ম দ্বান্দ্বিক ধূম্রজালের আড়ালে। সেই ধূম্রজাল সৃষ্টির জন্য কিছু মুখরোচক শ্লোগান রচিত হয়েছে—যথা স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থরক্ষার সংগ্রাম, বুরজোয়া-জমিদার-বিরোধী শ্রেণী-সংগ্রাম ইত্যাদি। বাস্তবে, সমকালীন 'বামপন্থা' লেজুড়-বৃত্তি অবলম্বন করে কোনোরকমে কালাতিপাত করছে। গর্দভের লেজ ধরে যদি পথ চলি, গর্দভ যদি আমায় পথ দেখিয়ে এগিয়ে চলে, সে দৃশ্য মনোরম হবে না। ভারতের সমকালীন বামপন্থা যখন কোনো এলাকায় ভগবান রামা রাওয়ের, কোথাও কাশ্মীরের ডঃ আবদুল্লার, কোথাও বা শ্রীযুক্ত চরণ সিং-এর, অন্য কোথাও বা অন্য কোন জাতপাতনির্ভর, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও আধুনিকতা-বিরোধী শক্তির লেজ ধরে চলে, প্রচারে বলে—"আমরা 'বামফ্রন্ট' কিংবা 'গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট' গড়ে তুলছি"—তখন সে দৃশ্যও দৃষ্টিকটুই ঠেকে।

'বামপন্থা' অবশ্যই স্থূল রাজনীতিকে সর্বব্যাপক করে তুলেছে। আজ সমাজজীবনে সর্বত্র রাজনীতির একাধিপত্য। পূজামণ্ডপে, পঞ্চায়েতে, খামারে, শিল্পে, সারস্বতভবনে, সাহিত্যলোকে, শিল্পচর্চায়, ক্রীড়াঙ্গনে,—প্রাণঘাতিকা রাজনীতির উপদ্রবে সমাজজীবন বিপন্ন। 'বামপন্থা'র মূল ব্যর্থতা এইখানে যে, সমাজে নূতন সঞ্জীবনীমন্ত্র আনতে এ পারে নি। নেতিবাদ, অরাজকতাবাদ, যদৃচ্ছাচার, নৈষ্কর্ম্যবাদ, স্থূল অর্থনীতিবাদ, সুবিধাবাদের মরুবালুরাশিতে 'বামপন্থা' আটকা পড়েছে। ভারতীয় রাজনীতিই এইসব দোষে দুষ্ট। বামপন্থা সেই দোষগুলিকেও পূর্ণতা দান করেছে।

আট

'বামপন্থা'র ভবিষ্যৎ কী? সমাজবিজ্ঞানে সম্ভাবনার আলোচনা সম্ভব, নিশ্চিতভাবে ভবিষ্যৎ-কথন সম্ভব নয়।

অধুনা ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্নতাবাদী, উগ্রপন্থী, ধর্মমোহগ্রস্ত মৌলিকবাদী, সন্ত্রাসবাদী এবং আঞ্চলিকতাবাদী শক্তির অভ্যুত্থান হচ্ছে। অনেকের সন্দেহ, এসবের পিছনে আন্তর্জাতিক শক্তির সমর্থন আছে। জাতীয়তাবাদী, বিকাশকামী, ধর্মনিরপেক্ষ, শান্তিকামী শক্তি নানা অঞ্চলে পিছু হটছে। ভারতীয় সমাজে এইসব শক্তির পিছু-হটার কাহিনী সকলেরই জানা। 'বামপন্থা' তো কোনদিনই ভারতীয় সমাজে স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে নি। গত দুই দশকে সংকীর্ণ মতান্ধতা এবং সুবিধাবাদী রাজনীতির দৌলতে 'বামপন্থা' আজ ক্রমক্ষীয়মাণ শক্তিই। কি পানজাবে, কি আসামে, কি মহারাষ্ট্রে, কি অন্ধ্রে, কি তামিলনাড়ুতে সর্বত্রই 'বামপন্থা' আজ পিছু হটছে। ভারতের 'বামপন্থা'র খোকামি-রোগ প্রৌঢ়ত্বেও গেল না। ভারতের 'বামপন্থা'র মাথায় এখনও 'সশস্ত্র বিপ্লবে'র পোকা ঘুরঘুর করছে। পারমাণবিক যুগে, জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সাফল্য আর সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অবক্ষয়ের যুগে, 'গণতান্ত্রিক' সমাজে—এমনকি

পারলামেনটারি গণতন্ত্রের ঠাট বজায় আছে এমন সমাজে, ধ্রুপদী কায়দায় যে বিপ্লব সম্পন্ন করা যাবে না, ব্যবহারিক বিপ্লবীদের সেটাই শিক্ষা (মার্কস, চে গুয়েভারা)। এইসব সমাজের অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষাদীক্ষা এবং চৈতন্যের বিস্তারের প্রকরণ-পদ্ধতি এদেশের বামপন্থীদের অজানা। ভারতীয় সমাজকে তারা ছকে ফেলে বুঝতে চায়। এরা হাতুড়ে ডাকতার। রোগটা কী—রোগনিরাময়ের পথ কী—রোগীর অনুপথ্য কেমন হবে—এসব বিষয়ে এদের কয়েকটি ধরাবাঁধা সূত্র আছে। সেই সূত্র যদি কাজে না লাগে তবে এরা নিরুপায়।

প্রসঙ্গত বলা যায়, বিকাশশীল ভারতের সামনে পাঁচটি গুরুতর সমস্যা বর্তমান। বিচ্ছিন্নতাবাদ, আঞ্চলিকতাবাদ, অস্থিতিবাদকে সংযত করে 'জাতীয় ঐক্য তথা অখণ্ডতা' রক্ষা করবার সমস্যা। দ্বিতীয়, ভারতের রাজনীতিকে সুবিধাবাদের ঊর্ধ্বে তোলা, সমাজদেহ হতে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করা, দেশপ্রেমের নতুন জোয়ার আনা। তৃতীয়ত, নিরুদ্দেশযাত্রায় অভ্যস্ত, নরম রাষ্ট্রকে সিদ্ধান্তপটু, 'সংগ্রামী গণতান্ত্রিক' রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা। চতুর্থ, প্রত্যয়ের দাসত্ব বর্জন করে ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে দ্রুতগতিশীল তথা আধুনিক করে তোলা। পঞ্চম, দেশের নিরাপত্তাকে এবং সংহতিকে সুনিশ্চিত করা।

এ-যাবৎ মুক্তি-আন্দোলনের এবং গান্ধী-নেহরুর ঐতিহ্যবাহক কংগ্রেস দল এ কাজ সম্পন্ন করেছে। ভারতের প্রজাসাধারণ আজও কংগ্রেসকে আপন করে রেখে মোটামুটি ভারতভাগ্যবিধানের দায়িত্ব এই দলের উপরই অর্পণ করে এসেছে। বিগত লোকসভার নির্বাচনেও দেখা গেছে, ভারতের প্রজাসাধারণের সাধারণ বোধ তথা সহজাত প্রজ্ঞার অভাব নেই।

কিন্তু ভারতের আত্মসন্তুষ্টির কারণ নেই। দেশজ অন্তর্ঘাতী শক্তি এবং বিদেশী কুচক্রীদের সতত প্রচেষ্টা—ভারতবর্ষকে হীনবল করে এই ভূখণ্ডে অস্থিতি নিয়ে আসা। এবং এও মনে রাখতে হয় যে, ভারতে প্রগতিবিরোধী শক্তির নানা রূপ—কোথাও উগ্রপন্থা, কোথাও আঞ্চলিকতা, কোথাও সার্বভৌম শিখ বাসস্থানের দাবি—আর কেন্দ্র বিরোধী জিগির তো আছেই। এইসব শক্তি-সংঘাতের পরিণামে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে কেমন অবস্থা দাঁড়াবে, বলা শক্ত। কংগ্রেস দল যতদিন ভারতবর্ষকে ধারণ করে রাখতে সক্ষম হবে, ততদিন জাতীয় ঐক্য, সর্বভারতীয় পরিকল্পনা, পরিকল্পিত বিকাশ হয়তো হবে। যদি রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ হতে কংগ্রেস দলের অপসারণ ঘটে, তবে ভারতবর্ষ কাণ্ডারীবিহীন নৌকার মতো নিরুদ্দেশী পথে যাত্রা করতে বাধ্য হবে। ভারতবর্ষ নতুন করে খণ্ড-খণ্ড, বিক্ষিপ্ত হবে। সেই সংকটমুহূর্তে হয়তো সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করবে। অথবা রক্ষণশীল শক্তি একজোট হয়ে ক্ষমতায় বসবে। ক্রমক্ষীয়মাণ বাম-শক্তি ভারতবর্ষের নায়কতা নেবে, হিসাবে এ অঙ্ক এখনও মেলে না।

যাবার আগে

আবুল হোসেন

যাবার সময় হয়ে এল বুঝি।
যাব।
একটুখানি জিরিয়ে নিই তার আগে।
কী বল?
কিসের তাড়া? অনেকটা পথ?
সন্ধে হয়ে আসে?
আসুক।
অ্যাশট্রেটা দাও এগিয়ে
আর এক কাপ চা,
বালিশটা দাও, একটু না-হয় হেলান দিয়ে বসি।
দু-একটা গান শোনাবে কি?
কিছুই ভালো লাগছে না?
আচ্ছা এসো, কাছেই একটু বোসো।
তৈরি হই নি? নাই বা হলাম।
কী এমন সব ধনরত্ন আছে বলো
তাই নিয়ে ফের মাথা ঘামানো!
বাঁধাছাঁদা করবে যারা করুক।
আমি যেমন এসেছিলাম, সঙ্গী ছাড়াই,
খালি-হাতেই যাব।
যার বরাতে আসা সেই তো পথ দেখাবে।
তার আগে
একটুখানি জিরিয়ে নিতে দাও।

বহুদিন পর মাকে

শামসুর রাহমান

সুরমা রঙের মেঘে রোদ্দুরের পাড়, চরাচরে
চকিতে ছড়িয়ে পড়ে সুর,
হৃদয়ের ভোরবেলাকেই ভরে তোলে, পিছুডাক ;
আসমানে চিলের পাখার ঝলসানি।

বারান্দায় জায়নামাজের মখমলে প্রজাপতি,
এক কোণে তস্‌বি ধ্যানস্থ,
হঠাৎ কী ভেবে তিনি ঘরের ভেতরে
গেলেন আমার আম্মা। চৌকাঠে লুটায়
রোদ্দুর, শিশুর হাসি। বহুদিন পর
মাকে দেখলাম তাঁর
আলমারি গোছাতে, একটা ঘ্রাণ, পুরানো দিনের,
সারা ঘরে গুণীর তানের মতো ব্যাকুল ছড়ানো।

আমি অগোচরে ;
নানা কাপড়ের ভাঁজে কী যেন তন্ময়
খুঁজছেন ; ঘরে ওড়ে প্রজাপতি। ফটোগ্রাফ থেকে
আমার পিতার চক্ষুদ্বয়
চেয়ে থাকে, যেন বা আবৃত্তি করে জন্মদিন। কারুকাজময়
আলমারি থেকে
একটি গোলাপি বানারসী শাড়ি হাতে
নিয়ে উলটে-পালটে দেখলেন কিছুক্ষণ,
তাকিয়ে লাজুক চোখে এদিক ওদিক
জড়ালেন গায়ে।

অকস্মাৎ রঙধনু তাঁর সমগ্র সত্তায়, যেন
তিনি পুনরায় নববধূ অতীতের
চন্দ্রিল বাসরঘরে। বৈধব্যের গোধূলিতে একটি গোলাপি
বানারসী শাড়ি হাতে
দাঁড়ানো আমার আম্মা। চোখে
তাঁর বাইফোকাল চশমা,
এবং স্খলিত দাঁত, সময়ের নখের আঁচড়
উৎকীর্ণ অস্তিত্বময়, যেন কবিতা লিখতে গিয়ে
কিছু হিজিবিজি এঁকে ফেলেছি খাতায়। আজ এই
সন্তরেও দেখি
যৌবন আনত তাঁর কাছে।
'এর আগে এমন সুন্দর আমি দেখি নি তোমাকে',
মনে-মনে উচ্চারণ করে অন্তরালে
সৌন্দর্যলুণ্ঠনকারী সরে যাই সে বাসর থেকে।

সুরমা রঙের মেঘে রোদ্দুরের পাড়, কতিপয়
কবুতর রেলিঙ-এ আতিথ্য নেয়, গম
পাবে ; মা আমার
দাঁড়ান দরজা ঘেঁষে, তাঁকে
কী এক উৎসব
ত্যাগ করে গ্যাছে, মনে হয়। আলগোছে
নেবেন কুড়িয়ে তিনি ফিরোজা তস্‌বি
একটু পরেই—
কখন যে মদির গোলাপি বানারসী হয়ে যায়
পশ্চিম আকাশ আর তিনি
আছেন দাঁড়িয়ে
একাকিনী, প্রতীক্ষার কাতর প্রতিমা।

আষাঢ়ের রাতে

আল মাহমুদ

কেন যে আবিল গন্ধে ভরে ওঠে আমার নিঃশ্বাস।
এই রাত, এই হাওয়া নীলিমায় নক্ষত্রনিচয় আর
আত্মীয় চাঁদের পিঠ, সবি যেন আচ্ছন্ন ধোঁয়ায়
যেন সবি প্রয়াস চোখের কাছে অস্পষ্ট সুদূর
শুধু দিগন্তবিস্তৃত বৃষ্টি ঝরে যায়, শেওলাপিছল
আমাদের গরীয়ান গ্রহটির গায়।
যেন শত শতাব্দীরও আগে
মৃত এক অতিকায় কাছিমের খোলের ওপরে বসবাস
করছে মানুষ। আর
পৃথিবী উঠেছে পচে, চতুর্দিকে তার
গলিত পুঁজের উৎস খুলে গিয়ে উপচে পড়ে মাংসভুক কীট
ঈথারে ঝিল্লির রব দীর্ণ করে আবহমণ্ডল।

সবুজের গলিত তরঙ্গে ভাসে লক্ষ-লক্ষ পাখির পচন
উদ্যত মেঘের স্তম্ভ নুয়ে আসে ; বৃষ্টি হয়ে ঝরে
পৃথিবী-কর্ষণকারী কিষানের ক্ষয়ে-যাওয়া ফালের ওপর।
দুর্গন্ধিত সারের নীচে শিরশিরে উদ্যত অঙ্কুর
পাখির পেটের নীচে ডিম, সবুজের অন্তরে সবুজ
আমার বুকের কাছে মুখ। ঘামে ভেজা মাংসের কিষাণ
তৃপ্ত করে জ্যামিতির গুল্মময় ত্রিকোণ কর্দম।

ছিঁড়ে যায় বই

মনজুরে মওলা

একটি বেড়াল ছিল মেঘের মতোই।
দুষ্টু বেড়াল
যখন-তখন ঘরে ঢুকে যেত সে।
দুষ্টু বেড়াল।

তছনছ করে দিত বালিশ-চাদর
ভেঙে দিত শখ করে কিনে আনা
গ্লাস।
পড়ার টেবিলে, বইয়ে চলে যেত
উড়ে।
গুটিসুটি এসে যেত ঘুমের ভেতর।
চুপিচুপি ঠিক-ঠিক চুমু খেত হাতে।
দুষ্টু বেড়াল।

বেড়াল এমন নয়, ভালো হয়ে থাক,
এ-ই চাই আমি?
চলে যাক ঘর ছেড়ে বাগানে বা
মোড়ে,
এ-ই চাই আমি?

বেড়াল তাকিয়ে থাকে
চোখে চোখ রেখে।
ভেঙে যায় কাপ গ্লাস
ছিঁড়ে যায় বই।
দুষ্টু বেড়াল।

একটি আত্মিক প্রতিবেদন

অশরীরীর শোকবিবরণী

রঞ্জন ভাদুড়ী

আমার শরীর নেই। শরীর থাকলেই তাকে বহন, পালন, পরিচর্যা করতে হয়, ভিতর-বাইরের নানান আক্রমণ থেকে বাঁচাতে হয়—আমার সে-সব বালাই নেই। আমি এক অশরীরী আত্মা, অবিনাশী কিনা জানি না। তবে যাদের দেহভার নেই তারা বিনষ্টও হয় না সচরাচর। যেমন রোদ বাতাস আলো অন্ধকার। আমি এক হিসেবে এদের চেয়েও এলেমদার, কারণ আমি সর্বগ। আমি যেখানে খুশি যেতে পারি, যা খুশি দেখতে পারি, অবশ্য যা খুশি করতে পারি না। সেটা করতে চাইলে যা থাকা দরকার সেই শরীরটাই যে আমার নেই। শরীর থাকার জ্বালা অনেক, না-থাকার জ্বালা এই একটাই।

সেদিন এই শহরের শূন্যমার্গে নিরালম্ব ভাসছিলাম। তুল্যমূল্য দোষগুণ নিয়ে এই বিরাট শহরটি আমার বড়ো প্রিয়। যখন দেহবন্ধ ছিলাম, তখন এই শহরই ছিল আমার কৈশোরের স্বপ্নলোক, যৌবনের মল্লভূমি এবং বার্ধক্যের বন্দিশালা। তাই দেহান্তের পর এর আকাশে-বাতাসেই আমি ভেসে বেড়াই। সেদিক থেকে আমার একটু বন্ধন আছে, তবে সে বন্ধন অন্য-নিরপেক্ষ। তা ছাড়া যা নেই 'ভারতে' তা নেই ভারতে। এই শহরও তো 'ভারতে'র মতো এক সমগ্রতার আধার। এখানে যত থাকি তত দেখি, তত শিখি। দেহী থাকতে যা দেখতে পারি নি, বিদেহী হয়ে অক্লেশে অনায়াসে তা দেখতে পাই। এই দেখা স্থানিক নয়, এর পরিধি আদিগন্ত বিস্তৃত। কারণ এখন আমার দেখাশোনার সীমানা তো শুধু বহির্লোকে আবদ্ধ নয়, অন্তর্লোক পর্যন্ত তার ব্যাপ্তি। সেদিন, এবং সেদিনের ঘটনার জের হিসেবে পরে আরো কটা দিন কত কী যে দেখলাম শুনলাম। মানুষের হিসেবে কয়েকটা দিন মানে আমার কাছে কয়েকটা মুহূর্তমাত্র। ব্রহ্মার এক নিমেষ মানে যেমন জীবলোকের ষাট হাজার বছর, অনেকটা সেইরকম আর-কি! ভাগ্যিস বিখ্যাত লোক বা নেতাদের মতো হঠাৎ ট্যুরে বেরিয়ে পড়ি নি! তাহলে এত-সব দেখা-শোনা হত না!

শূন্য থেকে ঈগলের অধিক চোখে আমি দেখতে পেলাম, নীচের শহর আর শহরতলির চাপ-চাপ চাক-চাক এলাকা জুড়ে দারুণ দাপাদাপি কান্ড বেধে গেছে। বিধ্বংসী দাবাগ্নি যেমন উৎসস্থল থেকে অগোণে গ্রাস করে বিশাল অরণ্যকে, তেমনি কোনো-এক দুঃসংবাদ যেন আণবিক বিস্ফোরণের ব্যাপ্তি নিয়ে চতুর্দিকে ফেটে পড়ছে। বিক্ষুব্ধ মানুষ শহরের পথে-পথে নির্বিচারে যানবাহন অবরোধ করছে। সাইকেল, মোটর-সাইকেল, ট্যাকসি, প্রাইভেট গাড়ি জোর করে থামিয়ে তাদের চাকা থেকে পাম্প খুলে নেওয়া হচ্ছে, রিকশা থেকে টেনে নামানো হচ্ছে হাসপাতালগামী অসুস্থ সওয়ারিকে, ট্রামে-বাসের উপর দমাদম ইট-পাথর পড়তে থাকায় যাত্রীরা ভয় পেয়ে নামতে শুরু করে দিয়েছে। এখানে-ওখানে কয়েকখানা বাস দাউদাউ করে জ্বলছে।

সময়টা শহুরে ভাষায় যাকে বলে পীক আওয়ার। অফিস-আদালত স্কুল-কলেজ দোকানপাট হাসপাতালের আউটডোর—সব এই সময়েই চালু হয়। কাজেই শহরের রাস্তায় মানুষ থিকথিক করছিল। তারা বিহ্বল বিভ্রান্ত হয়ে পরস্পরকে জিজ্ঞেস করতে লাগল, যা শোনা যাচ্ছে তা কি সত্যি?

কী শোনা যাচ্ছে? দেশের প্রধানমন্ত্রীর আচমকা গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর এই শহরের উপর ঘূর্ণিঝড়ের মতো বয়ে এসেছে। সঠিক খবর কেউই জানে না, তবে সবাই বুঝতে পারছে একটা-কিছু সাংঘাতিক কান্ড ঘটে গেছে। অনেকে পথে দাঁড়িয়ে, কিংবা গাড়িতে বসে ট্রানজিসটারের নব ঘুরিয়ে খবর শোনার চেষ্টা করছে। তাদের ঘিরে ধরছে আরো অনেকে। কেউ বলছে, গুলি নয়, সম্ভবত বোমা বিস্ফোরণে তিনি মারাই গেছেন। কেউ বলছে, মারা যান নি, গুরুতর আহত। কেউ বলছে, এ সেই সম্প্রদায়ের কাজ, যাদের সঙ্গে তাঁর মর্যাদার লড়াই চলছিল। কেউ বলছে, এটা বিদেশী চরচক্রের ষড়যন্ত্র। কেউ মনে-মনে খুশি হয়েও পিঠের চামড়া হারানোর ভয়ে শোকে বিহ্বল হবার ভাব দেখাচ্ছে। আসল ঘটনাটা কী জানতে হয়! অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার বলে আমি তৎক্ষণাৎ খোদ রাজধানীতে পেঁছে গেলাম। সেখানকার অবস্থা আরো বিশৃঙ্খল আর ভয়াবহ। প্রধানমন্ত্রীর নিথর নিস্পন্দ দেহ তাঁর বাড়ির কাছের এক হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে শায়িত রয়েছে। বড়ো-বড়ো ডাকতাররাও অবুঝ শিশুর মতো শেষ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি, কিছুই করার নেই। উনি যেভাবে পয়েনট ব্ল্যাঙ্ক রেনজ থেকে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন তাতে দৈবও কিছু করতে পারবে না। ওঁর শরীরের অধিকাংশ হাড়, চারটি কশেরুকা এবং সুষুম্নাকান্ড সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। তার ওপর ডাকতাররা আবার কাটা-ছেঁড়া করছেন। করতেই হবে, কারণ যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। এক্ষেত্রে অবশ্য শ্বাস নেই, শুধু আশ-টুকুই আছে। অচিরেই তা নৈরাশ্যে পর্যবসিত হবে। কিংবা এখনই হয়েছে, শুধু সাংবিধানিক কারণে শেষ বুলেটিন প্রচার করা যাচ্ছে না।

যাই হোক, সেই কাটাছেঁড়ার দৃশ্য আমি বেশিক্ষণ দেখতে পারলাম না। আবার উড়াল দিলাম নিজের শহরের উদ্দেশে। অবশ্য ফেরার পথে রাজধানীর আকাশে একটুক্ষণ থাকলাম, কারণ ওখানে নীচের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রচুর শকুন ঘুরপাক খাচ্ছিল এবং নীচে ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে চলছিল এক ভ্রাতৃঘাতী নৃশংস শোকোৎসব। শোক যে কতখানি অপবিত্র অপরিণামদর্শী হতে পারে তারই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রদর্শনী চলছে যেন এখানে। জানি না, আমার শহরের অবস্থা এতক্ষণে কী দাঁড়িয়েছে! যাব-যাব ভাবছি, এমন সময় স্থানীয় দু-তিনটে রঙবাজ আত্মা আমার দিকে তেড়ে এল। বলল, 'এখানে এসে কী দেখছ চাঁদু? যা দেখলে ফিরে গিয়ে তার চেয়ে তো সাতকাহন বেশি গাইবে। ভালোয়-ভালোয় নিজের জায়গায় কেটে পড়ো।' দেখেই বুঝেছি, এরা সব বায়ুস্তরের ট্রোপোস্ফিয়ার মানে ক্ষুব্ধমন্ডলের নীচাত্মা। এদের মধ্যেও আঞ্চলিকতা প্রাদেশিকতা ইত্যাদি রয়েছে। এদের সঙ্গে কথা বাড়িয়ে কাজ নেই। তা ছাড়া আমি এখন আমার শহরটাকেই দেখব। একদা-দেহবন্ধ আমার কৈশোরের স্বপ্নলোক, যৌবনের মল্লভূমি।

নিমেষেই আমি পেঁছে গেলাম আমার শহরের উপকণ্ঠে। সেখানে খবরটা ততক্ষণে ভীষণভাবে চাউর হয়ে গেছে। অবশ্য সেই কঠিন সংবাদের গায়ে জড়ানো রয়েছে নানান রটনার রাঙতা। যে যেমন শুনছে তাতে এককাঠি রঙ চড়িয়ে আর-একজনকে বলছে। এখন দেখতে পাচ্ছি, শহরপ্রান্তে আর শহরতলিতে আপ-ডাউন লোকাল ট্রেনগুলো দাঁড়িয়ে পড়ছে। যে-যেখানে-আছে অবস্থায় তাদের দাঁড় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ভ্যাকুয়াম, টাই-বার ইত্যাদি খুলে নেওয়ায় গাড়িগুলো পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। যারা এসব করেছে তাদের চালচলন চেহারায় যে চুল্লুমি ফুটে বেরুচ্ছে তা থেকেই বোঝা যায় এই ধরনের একটা শোক এইভাবে পালনের জন্য তারা মুখিয়েই ছিল। সুযোগটা এত তাড়াতাড়ি পেয়ে গিয়ে দিশেহারা হয়ে

পড়েছে। কেউ-কেউ রেললাইনের ফিশপ্লেটও সরাবার চেষ্টা করছে। কোথাও-কোথাও লেভেল ক্রসিং-এ লাইনের উপর ঠেলাগাড়ি, ড্রাম, কাঠের কুঁদোর ব্যারিকেড। ওই তো উত্তর-শহরতলিতে একজন একবগ্গা ড্রাইভার গাড়ি চালাতে গিয়ে প্রথমে খিস্তি এবং পরে পাথর খেল। তার অপরাধ, প্ল্যাটফরমের আশ্রয়চ্যুত গাড়িখানাকে মাঝপথ থেকে সে সামনের স্টেশনে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। তাতে করে নারী শিশু বৃদ্ধ অশক্ত অসুস্থ বা প্রতিবন্ধীরা নিরাপদে নেমে যেতে পারত। অবরোধকারীরা সেই প্রস্তাবে প্যাঁক দিল। কে একজন বলল, "বান্‌চোত দেশের শত্রু, নইলে এই দুস্যবাদ জানার পরও গাড়ি চালাতে চায়! দে শালাকে মায়ের ভোগে পাঠিয়ে!" একটা স্টেশনে একখানা দুরপাল্লার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তার আর-এম-এস-কামরায় কিছু লোক জোর করে ওঠার তালে ছিল। কিন্তু কামরার ঘেরাটোপে আপাত-অদৃশ্য দুই রেলপুলিশ বন্দুক উঁচিয়ে এগিয়ে আসতেই সড়সড়ে করে সব কেটে পড়ল। দুই স্টেশনের মাঝখানে দাঁড়ানো একখানা ই-এম-ইউ-কোচ থেকে কেউ লাফিয়ে নামছে, কাউকে ধরে নামানো হচ্ছে, শিশুরা নীচে-দাঁড়ানো বড়োদের প্রসারিত হাতে ঝাঁপ দিচ্ছে, পুরুষ-নির্ভরতায় নামবার সময় তরুণী মেয়ে-মহিলারা লাজুক হেসে বেশবাস সামলাচ্ছে। ভেনডাররা হৈ-হৈ করতে-করতে তাদের মালপত্র নামাচ্ছে। রেললাইন ধরে পিঁপড়ের সারির মতো মানুষ। পিল-পিল করে এগিয়ে যাচ্ছে। কোলে-শিশু, কাঁখে-শিশু, হাতে-শিশু, হাতে-বোঝা মাথায়-বোঝা মানুষ উদ্বাস্তুদের মতো হেঁটে চলেছে। পিছনে গাড়ি স্থির দাঁড়িয়ে আছে। যাত্রায় অপ্রত্যাশিত নতুন মাত্রা যোগ হলে কেউ আতঙ্কিত হয়, আবার কেউ হয় আনন্দিত। এক্ষেত্রেও তাই। তবে দুঃসংবাদটা অনেককেই ভাবিয়ে তুলেছে, বিমর্ষ করেছে। তাদের মুখে প্রশ্নচিহ্ন—গুজব না সত্যি? এরপর দেশের কী হবে? প্রতিবেশী কোনো দেশ এই সুযোগে হয়তো আক্রমণই করে বসবে, হয়তো মিলিটারির শাসন হবে, দেশ হয়তো টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে। রোদ আর বোঝা মাথায় করে পদযাত্রার কষ্ট এই-সব আলোচনার নীচে চাপা পড়ে গেছে। রেললাইন ধরে এই ধরনের পদযাত্রা কোথাও শহরমুখী, কোথাও বহির্গামী। চলছে চলুক, এই ফাঁকে আমি আবার শহরের ঘটনাবহুল জনাকীর্ণ এলাকায় কী ঘটছে দেখি।

শহরের পথে-পথে এখন কাতারে-কাতারে সচল মানুষ আর নিশ্চল যানবাহন। মস্তানদের বাইক, মোটর-বাইক ইতিউতি টহল দিয়ে ফিরছে। যেসব মস্তান সাইকেলে চক্কর দিতে-দিতে শোকপালনের খবরদারি করছে তাদের অনেকেরই লক্ষ্য মেয়েরা। মেয়েদের গা ঘেঁষে শাঁ-শাঁ করে সাইকেলের ভড়িকাবাজি দেখাচ্ছে। এখানে-ওখানে বাস ট্রাম জ্বলছে। দমকল আগুন নেবাতে গিয়ে বাধা পেয়ে ফিরে আসছে। এক জায়গায় কিছু স্কুলের শিশু চাক বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের স্কুল-বাসের চাকার পাম্প খুলে নেওয়া হয়েছে। তাদের চোখেমুখে একই সঙ্গে বিস্ময়, আতঙ্ক আর কৌতূহল। একেবারে ছোটোরা চোখ মুছছে। একটু বড়োরা তাদের সামলাচ্ছে, সাহস দিচ্ছে। এটা হচ্ছে মরনিং স্কুলের বাসের অবস্থা। স্কুল ছুটির পর যেসব পড়ুয়া বাড়ি ফিরছিল তাদের অবস্থা। তাদের অভিভাবকরাও রাস্তায় বেরিয়ে গোরুখোজা খুঁজছে ঘার-যার ছেলেমেয়েকে। যারা স্কুলে টেলিফোন করে জানতে পেরেছিল যে স্কুল-বাস রওনা হয়ে গেছে তারাই এমনটা করছে। অনেক ছেলেমেয়ে পিঠে ব্যাগ, হাতে সুটকেস জলের বোতল ইত্যাদি নিয়ে দল বেঁধে বাড়ির পথে হাঁটা দিয়েছে। আস্তে-আস্তে তাদের দলটা ছোটো হতে থাকছে। অনেকে পথেই অভিভাবকের সঙ্গে পিঁপড়ে-মুখোমুখি হচ্ছে। তখন তারা এবং তাদের মা-বাবারা এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন বহুদিন বাদে পরস্পরকে খুঁজে পেল। ওদিকে দুঃসংবাদটা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ায় ডে-স্কুলগুলোও বসার আগেই ছেলেমেয়েদের ছুটি দিয়ে দিচ্ছে। গুজব বা উড়ো খবর মনে করে গুরুত্ব না দিয়ে যারা ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠিয়েছিল, খবরটা ক্রমশ কুয়াশাভেদী সূর্যের মতো স্পষ্ট হতে থাকায় এবং শহরের যানবাহন-অবরোধলীলা ক্রমশ তীব্র হওয়ায় তারা এখন দুশ্চিন্তায় ছটফট করছে। পথে বাবা মা ভাবছে, ছেলেটা-মেয়েটা যদি স্কুলে রওনা হয়ে থাকে তবেই তো চিন্তির! ছেলে-মেয়ে ভাবছে বাবা-মা অফিসে পৌঁছতে পেরেছে তো? বাড়িতে কোনো-কোনো মা ভাবছে, ভালোয়-ভালোয় সবাই বাড়ি ফিরলে বাঁচি!

বেলা বাড়ছে। খবরের কাগজ আর সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলোর অফিসের সামনে ভিড়ও বাড়ছে। খবরের কাগজের অফিসে টেলিপ্রিন্টার টেলেকসের সামনে সেখানকার কর্মীদের ঔৎসুক্য জমাট বাঁধছে। টেলিপ্রিন্টারে প্রথমে খবর এসেছিল—'প্রাইম মিনিসটার শট অ্যাট...' তারপর থেকে বিস্তারিত খবর আসছে। কখন কারা কোথায় তাঁকে কতগুলো গুলি করেছে, কোন্ কোন্ ধরনের অস্ত্রাদি থেকে গুলি ছোঁড়া হয়েছে, আততায়ীদের কাকে কোন্ অবস্থায় পাওয়া গেছে বা গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাঁকে কোন্ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তাঁর শরীর থেকে কতগুলো গুলি বার করা হয়েছে, তাঁকে নিয়ে যমে-ডাকতারে প্রবল লড়াই চলছে, প্রতি সেকেনডে অবস্থার অবনতি হচ্ছে—ইত্যাদি খবর পর-পর আসছে। অবশেষে সেই নিদারুণ খবর এল —'প্রাইম মিনিসটার ইজ নো মোর...'। এ-খবর অবশ্য মনে-মনে জানা হয়ে গিয়েছিল অনেকেরই, কারণ পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেনজ থেকে দেড়-দু জন গুলি খেলে বর্মহীন অমিতশক্তিধর যোদ্ধাও বাঁচে না। আর, আমি তো সেই কখন দেখে এসেছি তাঁর দেহের প্রাণহীনতা। বেতার অবশ্য এখনও রেখে-ঢেকে সংবাদ প্রচার করছে। কিন্তু বিদ্যুৎপ্রবাহের মতো তাঁর মৃত্যুসংবাদ সারা শহরে ছড়িয়ে পড়েছে। যেসব দোকানপাট বন্ধ হতে বাকি ছিল তারা ঝাঁপ নামিয়ে দিচ্ছে। এলাকায়-এলাকায় শোকমিছিল বেরুচ্ছে। অনেক সরল নিরীহ বেকার যুবক কান্নায় ভেঙে পড়ল। তারা সত্যিই তাঁকে ভালোবাসত, তাঁর কথায় আশ্বস্ত হয়েছিল, কারণ তিনি প্রত্যেক পরিবারের অন্তত একজন বেকারকে চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ওই যে মায়ের হাত ধরে একটি শিশু হেঁটে-হেঁটে যাচ্ছে, সে-ও খবরটা শোনা ইস্তক খুব মনমরা হয়ে গেছে। মাকে বলছে, "উনি কী ভালো ছিলেন, তাই না মা? আমি একদিন স্বপ্ন দেখেছিলাম উনি আমার গাল টিপে আদর করছেন আর হাসছেন। উনি তো আমাদের মতন ছোটোদের খুব ভালোবাসতেন, তাই না? তবু ওঁকে কেন মেরে ফেলল?" তার মা বলছে, "খারাপ মানুষগুলো চিরকালই ভালোমানুষদের মারে। কেন মারে বড়ো হয়ে বুঝতে পারবি।" এক ঝুলবারান্দায় দাঁড়িয়ে একটি কিশোরী ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কিছুদিন আগে সে প্রধানমন্ত্রীকে একখানা চিঠি লিখেছিল। তিনি আপনজনের মতো সেই চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন।

একটা ডাকাবুকো অফিস-বাড়ির অভ্যন্তরে চোখ পিছলে গেল। সেখানে কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্ভাষণের চিনির প্রলেপের নীচে সন্দেহ অবিশ্বাস চরিত্র-হনন—যা আগেও ছিল, এই দুঃসময়ে পুরনো বাতব্যথার মতো চাগাড় দিয়ে উঠেছে। অনেকে অনেকের উপর নজর রাখছে—কার কী প্রতিক্রিয়া হয় দেখতে হবে। কেউ-কেউ মানুষের স্বাভাবিক অভ্যাসবশত অসতর্ক মুহূর্তে একটু-আধটু হেসে ফেলছে, কারণ সময়টা শোকের হলেও ঘটনাচক্রে হাসি পেতেই পারে। কিন্তু নজরদাররা সেই হাসির মধ্যে দেশদ্রোহিতার গন্ধ পাচ্ছে। গোপনে গোপন খবর পৌঁছে দিচ্ছে যথাস্থানে। যারা শোকে লোক-দেখানো মুখভার করে আছে তাদের অনেকেই কিন্তু মনে-মনে ফূর্তির আমেজ উপভোগ করছে—দু-তিন দিনের সবেতন ছুটি—যা খাটনি, একটু বিশ্রাম পাওয়া যাবে—কাছাকাছি কোথাও প্রমোদ-ভ্রমণ—সন্ধ্য-ভেট-পাওয়া স্কচের বোতল—আঃ, ভাবতে চোখ বুজে আসছে!

বিখ্যাত সব খবরের কাগজের অফিসের সামনে দুটো-তিনটে করে লাইন পড়েছে। টেলিগ্রাম বেরুবে। দুটো লাইন হকারদের, একটা জনতার। লাইনে কে আগে কে পরে এ নিয়ে মাঝে-মাঝে বচসা, গা-জোয়ারিও চলছে। অন্য অফিসগুলো ছুটি হয়ে গেলেও খবরের কাগজের অফিসে এখন যজ্ঞবাড়ির ব্যস্ততা। একটু পরেই টেলি-গ্রাম, কাল সকালেই আবার তাঁর জীবন আর মৃত্যু নিয়ে সর্বাঙ্গীণ সংবাদ। তার সঙ্গে দিতে হবে দেশময় অশান্তি-অস্থিরতার সচিত্র বিবরণ।

পথে-পথে পঙ্গু নিশ্চল যানবাহনের সংখ্যা বাড়ছে। বাস-লরি-টেমপোর টায়ারের হাওয়া বার করে সেগুলোকে রাস্তার মাঝখানে আড়াআড়ি দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে যাতে ফাঁকফোকর গলে ছোটোখাটো গাড়িগুলো বেরিয়ে যেতে না পারে। বিভিন্ন রাস্তায় আটকে পড়া স্কুল-বাসের সংখ্যা বাড়ছে। শহরের অধিকাংশ অফিস-কাছারি স্কুল-কলেজ বন্ধ হয়ে গেছে। সিনেমা-হলগুলো ঝাঁপ ফেলে দিয়েছে। কোনো-কোনো অল্প ভিড়ের রাস্তায় সাইকেল প্র্যাকটিস চলছে, রেখে-ঢেকে অনেকে ক্রিকেটও খেলছে। পথবাসী ছেলেপুলেগুলো কুকুর-বেড়ালের মতো পথে ছুটোছুটি করছে। তারা ভেবে নিয়েছে এটা একটা মজার দিন। এই ধরনের মজার স্বাদ তারা আগেও পেয়েছে—হরতাল-বন্‌ধের সময়ে। শহরে অলস মন্থর

নিষ্কর্মা দিন না এলে বোঝা যায় না এখানকার রাস্তায় কেলোকিষ্টি নাকে-শিকনি ছেঁড়া প্যানটের জানালার ফাঁক দিয়ে পাছা-দেখানো কত হতকুচ্ছিত ছেলেপুলে ঘুরে বেড়ায়। পাঁচমিশেলি ঝড়তিপড়তি জিনিসে তৈরি আশ-পাশের ঠুনকো ঝুপড়িতে তাদের মা-মাসি-দিদিরা কেউ কারও উকুন বাছছে, কেউ কুটনো কুটছে, কেউ উরুত কেউ বুক বার করে পা ছেদড়ে বসে পুরুষদের সঙ্গে হাসি-মশকরা করছে, কেউ হাইড্র্যানটের জলে অসময়ে চান করে কোনো আড়াল-আবডাল না রেখেই কাপড়-চোপড় ছাড়ছে। অবশ্য এদের আবার সময়-অসময় কী! যে-কোনো সময়েই এরা আহার-নিদ্রা-মৈথুনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এইসব মেয়েছেলেগুলোও আজকের এই হঠাৎ-বন্ধের ফলে নিজেদের ডেরা ছেড়ে ধান্দায় বেরোয় নি। আগেই যারা বেরিয়ে গিয়েছিল তারাও আস্তানায় ফিরে এসেছে, কারণ পথে তারা শুনেছে এখন যে-কোনো সময় দেশে যুদ্ধ লেগে যেতে পারে। কিন্তু আস্তানায় এসেও সবাই শান্তিতে থাকতে পারছে না, কেউ-কেউ জায়গার দখল নিয়ে ঝগড়া করে মরছে, কেউ কাউকে মা-বাপ বা চরিত্র তুলে গালাগাল দিচ্ছে, কেউ ছেলেপুলেদের ঝগড়া-মারামারির মধ্যে নাক গলিয়ে রাস্তায় খিস্তিখেউড় করে লোক জমিয়ে ফেলছে। এদের ঝগড়া শুনতে সেখানেই বেশি লোক দাঁড়িয়ে পড়ছে যেখানে এদের মধ্যে বা আশে-পাশে উলিঝুলি কাপড়-জামা-পরা ডবকা ছুঁড়ি-টুঁড়ি আছে। শোক-ঔদাস্যের আড়ালে আদিম প্রবৃত্তিও কাজ করে যাচ্ছে।

শহরে এখন বিকেল। পথে-পথে আরোহী-বিহীন অসংখ্য যানবাহন বোবা হয়ে দাঁড়িয়েই আছে। কোনো-কোনো গাড়ি থেকে চালকও বেপাত্তা হয়ে গেছে। নতুন করে যেসব প্রাইভেট গাড়ি সওয়ারি নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছে শোকজনিত অবরোধের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে ভেবে, মোড়ে-মোড়ে তাদের গুনাগার দিতে হচ্ছে। তারা হয়তো ভাবছে ওই পথে যাই, শোককর্তারা হয়তো ও-পথে নেই, কিন্তু খানিকটা যাবার পর ঠিক একদঙ্গল শোকার্ত কোত্থেকে এসে তাদের পথ আটকে দাঁড়াচ্ছে। এক কুখ্যাত পল্লীর কাছাকাছি রাস্তায় শোকার্তরা এই-ভাবে একটা মোটরগাড়ি আটকাল। গাড়ির আরোহীদের মধ্যে এক অশীতিপরা বৃদ্ধা ছিলেন। তিনি তাঁর ছেলেকে দেখতে যাচ্ছিলেন। ছেলে হাসপাতালের ক্যানসার ব্লকে ভরতি আছে—ডাকতাররা তাকে আর মাত্র তিন মাস পরমায়ু দিয়েছেন। শোকার্তদের নেতা হাতমুখ নেড়ে বলল, "এই যে দাদা-বউদি-ঠাকুমারা, এখানে গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে যেখানে যাবার যান। আজ গাড়ি-টাড়িতে কারও চড়া চলবে না শোনেন নি?' শেষকালে কাকুতি-মিনতি করায় দয়ালুভাব দেখাল—'ঠিকাছে, আমাদের দশটা টাকা দিয়ে যান, আমরা ফুলমালায় প্রধানমন্ত্রীর ফটো সাজিয়ে ওই ওখেনে শোকপালন করব। আমাদের এরিয়ায় আর কেউ আপনাদের আটকাবে না।' গাড়ি-খানাকে মাছির মতো ছেঁকে ধরেছে রঙবাজগুলো। গাড়ির আরোহীদের মুখপাত্রটি ইতস্তত করছে—"কিন্তু এর আগেও যে দু জায়গায় টাকা দিতে হয়েছে।" "দিয়েছেন ভালোই করেছেন, আজকের দিনে সোবাই তো একটু সোকপালন করবে। যাক, টাকাটা ছাড়ুন, এর পর আর কেউ চাইবে না।" এমনভাবে বলল যে এইটেই পৃথিবীর চাওয়া-পাওয়ার শেষ প্রান্ত।

অলিগলিতেও লাঠিসোটা ইঁট-পাটকেল নিয়ে ছোটো বড়ো মাঝারি দুঁদে-খুদে মস্তানরা ছুটোছুটি করছে। কোথাও বিশেষ রাজনৈতিক দলের নামে, কোথাও বিশেষ ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের নামে মুর্দাবাদ ধ্বনি উঠছে। ওই তো, এক কুখ্যাত পল্লীর পথ থেকে বেরুনোর মুখে এক-জন গোবেচারা চেহারার লোককে ধরেছে ওই অঞ্চলের দু-তিনটে গুন্ডা। একথা-সেকথার পর একজন তার কলার চেপে ধরে বলছে, "শালা চুস্‌কিবাজ, দেশের এই দুঃসোময়ে ফুর্তি মাড়াতে এয়েছ? মাল ছাড়ো, আমরা সোকসভা করব, তাঁর ছেরাদ্দও করব।" উত্তর-দক্ষিণ শহরতলি থেকে যেসব হাফগেরস্ত দেহোপজীবিনী সাত-সকালেই শহরে এসে কুখ্যাত পল্লীর আশপাশের রাস্তায় খদ্দের ধরার জন্যে ঘোরাঘুরি করছিল তারা অনেকেই শূন্য হাতে ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ির পথ ধরেছে, কারণ কেউ-কেউ ঘরে দুধের বাচ্চা রেখে এসেছে, হেঁটে বাড়ি ফিরতে হবে। যাদের রূপ যৌবন বয়স আছে এমন তিনজনকে ওই পল্লীর রঙবাজরা অভয় দিয়ে বলছে, অন্দুর ঠেঙিয়ে আজ আর হেঁটে-হেঁটে তোদের বাড়ি ফিরতে হবে না, রাতে থাকার ব্যবস্থা করে দেব। মেয়ে তিনটের একজন বেশ ভয় পেয়ে বলছে, "কিন্তু রাত্তিরে কোনো দিন বাড়ির বাইরে থাকি নি—" "দুর পাগলি, আজ না থেকে উপায় আছে?"

খানিকটা দূরে আর-একদল রঙবাজ প্রেস-স্টিকার লাগানো একখানা গাড়ি আটকেছে। গাড়ির আরোহীরা বলছে, আমরা প্রেসের লোক। তখন অবরোধকারীদের একজন বেশ রোয়াবের সঙ্গে বলল, "প্রেসের লোক তো হয়েছে কী! গাড়ি এখানে রেখে হেঁটে যান।" আসলে ওরা প্রেস মানে ছাপাখানা বুঝেছে। শেষকালে খবরের কাগজ বলায় ছাড়ান মিলল। গাড়িখানা চলে যেতেই অবরোধকারীদের একজন তার দোসরকে বলল, 'সালা প্রেস-প্রেস করছিল কেন বল্‌ তো! ফাস্টেই খপরের কাগজ বলতে পারত, খামোখা ঝামেলি করতাম না। সিধে কতা কেউ বলতে পারে না, খালি ভ্যান্তারা। লে, ওই আরেকখানা আসছে।"—"ও সালা ডাকতারের গাড়ি রে।" রুগির গাড়ি আটকানো চললেও ডাকতারের গাড়ি যে আটকাতে নেই সেটা এরা জানে।

বেলা পড়ে আসছে। শহরের প্রধান কয়েকটি পথে বহির্গামী জনস্রোত বাড়ছে। শহরে সবার তো আর রাত কাটাবার আশ্রয় নেই, তা ছাড়া না-ফিরলে বাড়িতেও ভাববে, তাই দশ-বিশ মাইল দূরের শহরতলির নিত্য-যাত্রীরা দল বেঁধে বাড়ি ফিরছে। যারা আরও দূরে থাকে তারা অনেকেই শহরের দুই প্রান্তিক রেলস্টেশনে রাতের আশ্রয়ের জন্য ছুটছে। সড়কপথ ছাড়াও রেলপথ ধরেও বহু মানুষ ঝেঁটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে শহর থেকে। অফিসে কারখানায় কাজ করা মেয়েরাও এই গৃহযাত্রায় শামিল হয়েছে। তারা কেউ-কেউ নিরাপদ পুরুষ-সঙ্গী খুঁজে নিয়েছে, কেউ-কেউ খুঁজে নেবার চেষ্টা করছে। রেল-লাইনের দুধারে জায়গায়-জায়গায় অন্ধকারে পথ দেখাতে মোমবাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। ক্লান্ত পদযাত্রীদের গলা ভেজানোর জন্য কোথাও-কোথাও জল আর বাতাসা নিয়ে অনেকে দাঁড়িয়ে আছে। এরা রেললাইনের দুপাশের জবরদখল জায়গার বাসিন্দা। এই সামাজিক কর্তব্যের কথা কোনো নেতা তাদের মনে করিয়ে দেয় নি।

এখন গভীর রাত। এখনও চলছে মানুষের হেঁটে ঘরেফেরার পালা। ক্লান্ত অবসন্ন পায়ে এক-একটা অলস স্টেশন পার হয়ে যাচ্ছে তারা। স্টেশন বা জনপদে এসে মূল স্রোত থেকে দুপাশে অনেক শাখানদী বেরিয়ে যাচ্ছে —অনেকের যাত্রা শেষ হচ্ছে। তাদের সৌভাগ্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাকিরা এগিয়ে চলেছে। মহিলা পদযাত্রীর সংখ্যা কমে গেছে। যে দু-চারজন আছে তারা সশব্দে হাঁফাচ্ছে। এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলা হোঁচট খেতে-খেতে তার স্বামীকে ধরে ফেলে গর্ভস্থ সন্তানটিকে বাঁচাল। সব যাত্রারই শেষ আছে, কাজেই সবচেয়ে দূরের মানুষটির পদযাত্রাও এক সময় শেষ হল।

পরদিন সকাল থেকে আরও তিন দিন। শহরে খবরের কাগজের চাহিদা দারুণ বেড়ে গেছে। নামি কাগজগুলো কালোবাজারে চলে গেল। বেশি দামে কাগজ বিক্রি করার দায়ে পুলিশ কয়েকজন চুনোপুঁটিকে ধরে নিয়ে গেল, রাঘববোয়ালদের গায়ে অবশ্য হাত পড়ল না। কোথাও জনতার হস্তক্ষেপে ন্যায্য মূল্যে কাগজ বিক্রি হতে থাকল। অনেক ধূমপায়ীর সিগারেট বাড়ন্ত হয়েছে। তারা কাছাকাছির আধখোলা দোকানে সিগারেট কিনতে গিয়ে বিষম খেল। রাতারাতি দাম বেড়ে গেছে। এ নিয়ে ক্রেতা-বিক্রেতাদের মধ্যে ইতস্তত বচসাও হতে লাগল।

লোকাল ট্রেন চলছে, তবে খুব কম এবং অনিয়মিত। সময়সূচির বালাই নেই। শহরের বাজারগুলো প্রায় খাঁ-খাঁ করছে। মাছের বাজারে এলেবেলে কিছু মাছ, বাসি আঁশটে গন্ধ আর মাছির ভনভনানি। পেট বড়ো বালাই, সেখানে খিল মেরে শোকপালন চলে না। ক্রেতারা হন্যে কুকুরের মতো ছুটোছুটি করছে। একজন দরদস্তুর করছে তো আর-একজন ছোঁ মেরে নিয়ে নিচ্ছে। দাম শুনে অনেকে ভিরমি খাচ্ছে। অনেকে স্বগতোক্তি করছে—নিজেও মরলেন, আমাদেরও মেরে গেলেন। সরকারি দুধের ডিপোয় দুধ আসে নি, খালি-বোতল আসছে আর ফিরে যাচ্ছে। দোকানপাট কিছু-কিছু খুলছে। সূর্যের কোরামিন ম্রিয়মাণ শহরকে আস্তে-আস্তে চাঙ্গা করতে চাইছে। রাস্তায় যানবাহন তেমন বেরোয় নি। বেসরকারি বাস নেই। কয়েকটি রুটে সরকারি বাস চলার চেষ্টা করে-ছিল, কিন্তু বোমা-পটকা ইট-পাটকেল খেয়ে লেজ গুটিয়ে ডিপোর গর্তে ঢুকেছে। রাষ্ট্রীয় ছুটি ঘোষিত হয়েছে, তাই অফিস-কাছারি-স্কুল-কলেজের ঝাঁপ বন্ধ। যারা কাল ম্যারাথন হেঁটে বাড়ি ফিরেছে তারা অবশ্য আজ আসতেও পারত না। বেতারে আবেগকম্প্র সংবাদপাঠ আর বেহালা-সারেঙ্গির করুণ সুরে বাজছে। ফুল আর মালার জন্য হাহাকার পড়ে গেছে। বহু মোড়ে আর মহল্লায় তাঁর প্রতিকৃতি ফুলমালায় এখনও সাজানো হয় নি। অত প্রতিকৃতিই বা অল্প সময়ের মধ্যে কোথায় পাওয়া যাবে! কেউ ক্যালেনডার কেটে যোগাড় করছে,

কেউ হাতে আঁকছে, কেউ খবরের কাগজের ছবি কাটছে। অনেকে জরুরি অর্ডার দিয়ে ফোটো বাঁধাইয়ের দোকান থেকে বাঁধিয়ে নিল, অনেকে ছবিটাকে চাটাইয়ের চালচিত্রে আঠা দিয়ে সেঁটে নিল। মোড়ে মহল্লায় অস্থায়ী ইটের বেদীতে, টেবিলে বা ল্যাম্পপোসটের গায়ে সেইসব ছবি ফুল দিয়ে সাজিয়ে সুগন্ধি ধূপ জেলে দেওয়া হল। মাইকে তাঁর বিখ্যাত সব বক্তৃতার টেপ বাজতে থাকল। দুটি নিরীহ কিশোর এক ছবির দোকান থেকে ফিরে আসছে খালি হাতে। তারা কয়েক বন্ধু মিলে নিজেদের বাড়ি থেকে সামান্য চাঁদা তুলে প্রধানমন্ত্রীর একখানা বাঁধানো ছবি কিনতে গিয়েছিল। চার-পাঁচটা দোকান চুঁড়েও পায় নি, সব বিক্রি হয়ে গেছে। একজন দোকান-দার বলছে, ছোটো একখানা ছবি যোগাড় করে দিলে ঘন্টা-দুয়েকের মধ্যে বাঁধিয়ে দেবে, কিন্তু দশ-বারো টাকা পড়বে। ওরা এখন পাড়ায় ক্যালেনডার খুঁজবে—যদি তাঁর ছবি পাওয়া যায়। ওদের চাঁদাই উঠেছে মোট সাড়ে-দশ টাকা, ছবি বাঁধাতে সব টাকাটা লেগে গেলে ফুল-মালা কেনা হবে কী দিয়ে! ওরা শুনেছে, ফুল-মালারও দাম ডবল-তেডবল বেড়ে গেছে। ওদের পাড়ার এক 'দাদু' রাত্রে মারা গেছেন। তাঁর বাড়ির লোকজন অনেক খুঁজে-পেতে চড়া দাম দিয়ে সামান্য কিছু ফুল আর মালা কিনে এনেছে!...

কিছু খল বুদ্ধিজীবীর ব্যস্ততা আর তৎপরতা বেড়ে গেছে। তাঁরা জানেন, অচিরেই বেতার আর দূর-দর্শন থেকে ডাক আসবে। কে কতখানি শোকবিহ্বলতা দেখিয়ে কী বলবেন বা করবেন মনে-মনে তার মহড়া দিচ্ছেন। কেউ-কেউ তাঁর ক্ষমতাচ্যুতির পর তাঁকে গণ-তন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক ব্যক্তি বলে অভিহিত করে-ছিলেন। বিবৃতি দিয়েছিলেন, লেখালেখিও করেছিলেন। তিনি পুনর্বার স্বরাজ্যে স্বরাট্ হবার পর অবশ্য তাঁদের সুর পালটাচ্ছিল। তাঁরা আশা-আশঙ্কার দোলায় দুলতে লাগলেন—বেতার-দূরদর্শন থেকে ডাক পড়বে তো! কেউ-কেউ বাড়ির বৈঠকখানায়, অফিসের টেবিলের কাঁচের তলায় তাঁর ছবি রাখলেন। কেন্দ্রীয় শাসকদলের দু-একজন মাতব্বর ব্যক্তি ইদানীং এঁদের কারও-কারও বাড়িতে বা অফিসে যাতায়াত করছেন, তাঁদের নজরে পড়ুক। তার ফলে একটা রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বা খেতাব-টেতাব যদি জোটে। তা ছাড়া এই সুযোগে বেতারে দূরদর্শনে শ্রুতিদৃশ্যের মাধ্যমে উপস্থিত হবার চেষ্টাও করতে হবে। ঝোঁকের মাথায় বেফাঁস বিবৃতি দিয়ে একটু কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন। এবার হাওয়ার অনুকূলে পাল তুলতে হবে। একজন তো বেতার থেকে তাঁর কণ্ঠ টেপ করে নিয়ে যাবার পর কিঞ্চিৎ অধৈর্যই হয়ে উঠলেন। দূরদর্শন থেকে ডাক আসছে না কেন? তাঁর নজরে হেঁজিপেঁজি অনেকেই শোকজ্ঞাপন করে ফেলল। তবে কি তাঁর অতীত ভূমিকার কথা ভুলে কেউ কলকাঠি নেড়েছে? সমজীবীদের মধ্যে বন্ধুর মুখোশ পরা শত্রু তো অনেক আছে। কিন্তু দূরদর্শন কর্তৃপক্ষের তো জানা উচিত তিনি তাঁর মত পালটেছেন। গোপনে ঝোপ বুঝে কোপ মারলেও এখন তো তিনি নিহত প্রধানমন্ত্রীর মতাদর্শকেই প্রকাশ্যে সমর্থন করেন।

এই এক হয়েছে। দিন-দিন এই শহরে আত্মপ্রচার-লোলুপ বিখ্যাত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। যাঁরা স্বয়ং-সিদ্ধ সম্ভ্রান্ত তাঁরা বাদে অন্যান্যরা, একটা-কিছু উপলক্ষ হলেই হল, বেতারে দূরদর্শনে কিছু বলা-টলার জন্য ল্যা-ল্যা করে হামলে পড়েন। শুধু খবরের কাগজে নিজের নাম বা বক্তৃতা-বিবৃতি দেখে এঁদের মন ভরে না। কোনো অতিবিখ্যাত ব্যক্তিত্বের প্রয়াণ ঘটলে স্মৃতিচারণা আর শ্রদ্ধানিবেদনের নামে এঁদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়, কারণ নিজেদেরকেও লোকচক্ষে বিখ্যাত বোদ্ধা প্রতিপন্ন করার এটা একটা মস্ত সুযোগ। এই সুযোগে প্রতিপক্ষকেও সমঝে দেওয়া যায়—দ্যাখো, আমি যে-সে লোক নই। এমন মানসিকতারই আর-একজন এক শোক-সভায় বিশেষভাবে প্রস্তুত কণ্ঠস্বরে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীর সম্বন্ধে একটি চারুবাক্ ভাষণ দিলেন। বেতারকেন্দ্র থেকে সেই ভাষণ টেপ করে নিয়ে গেল এবং সেদিন রাত্রেই তা সাধারণ্যে সম্প্রচারিত হল। তাঁকে যারা জানে না, নামে চেনে, তারা সেই ভাষণের ভূয়সী প্রশংসা করল। যারা তাঁকে হাড়ে-হাড়ে জানে চেনে, তারা মনে-মনে আওড়াল, "এই সুযোগে মাকড়া আবার একচোট কুমিরকান্না কাঁদল—আসলে সবই ধান্দাবাজি।" প্রতিপত্তি-পদাধিকারবলে এঁদের মতো লোকেরা যাদের কিছু পাইয়ে দেন বা দিতে পারেন তারা আবার এইসব শোকাপ্লুত ভাষণ-টাষণ শুনে বিগলিত হয়ে বাড়ি বয়ে গিয়ে এঁদের স্তাবকতা করে এল। যেমন, ভাষণে যেসব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা নাকি অদ্ভুত ব্যঞ্জনাময়, শোকপ্রকাশনের ভাষায় এই হৃদয়-দ্রাবী পরিমিতিবোধ এবং পরিশীলতা নাকি অপরের পক্ষে শিক্ষণীয়। এইভাবে অনেক ক্ষেত্রেই যাঁর উদ্দেশে শোকভাষণ, চামচাসুলভ আলোচনায় তিনি গৌণ থেকে গেলেন।

দূরদর্শনে বিখ্যাত শিল্পীদের নাম না-দেখিয়ে গান-বাজনার সকরুণ অনুষ্ঠান চলতে লাগল। ঘরে-ঘরে দর্শক-শ্রোতারা সেই দৃশ্যশ্রুতিময় শোকার্দ্র সুরমূর্ছনায় উদ্বেল, অভিভূত হয়ে উঠল। অল্প সময়ের মধ্যে এত বড়ো-বড়ো প্রিয় শিল্পীর অনুষ্ঠান দেখে-শুনে তারা নিজেদের কৃতকৃতার্থ মনে করল। অনেক শিল্পীকে ঠিকমতো চিনতে না পেরে কেউ-কেউ 'ইনি অমুক না?' 'ইনি তো অমুক' ইত্যাদি বলাবলি করতে লাগল। কেউ-কেউ অসহিষ্ণুতাও প্রকাশ করে ফেলল, "নাম দেখালে কী আর এমন মহাভারত অশুদ্ধ হত!" কণ্ঠশিল্পী-যন্ত্র-শিল্পীরা ছাড়া আর যাঁরা দূরদর্শনে বাঙ্ময় মুখ দেখালেন তাঁদের অনেকেই কিন্তু টিভির পরদার সমক্ষেই উপস্থিত হলেন। ক-বাবু বললেন, "আমার সঙ্গে তাঁর একটা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল যেটা অনেকেই জানেন না—" ইত্যাদি। শুনে তাঁর বিরোধী গোষ্ঠীর লোকেরা বলল, "হরিদাস পাল—মিথ্যে কথা বলে নিজের ইম্পর্ট্যানস বাড়াচ্ছে। বিখ্যাত মানুষেরা মারা গেলে অনেকেই তাঁদের কাছের মানুষ হয়ে যায়।" খ-বাবু শোক-নিবেদনের বেলাতেও এই ধরনের মন্তব্য হল। এক দর্শক-শ্রোতা আবার দূরদর্শন-পরদার দিকে চোখ রেখে মন্তব্যকারী পার্শ্ববর্তীকে রসিকতা করে বলল, "এই, আস্তে বল, শুনতে পাবে।" এ-কথায় উপস্থিত সবাই হেসে উঠল। পরক্ষণেই আবার সব গম্ভীর হবার চেষ্টা করল, কারণ অনুষ্ঠানটি শোকের।

চার দেওয়ালের চৌহদ্দি থেকে এবার আবার মুক্তাঙ্গনে তাকানো যাক। শহরের কয়েকটি বারোয়ারি পুজো-মণ্ডপের বেদীতে পিলসুজের উপর প্রদীপ জ্বলছে। প্রদীপের পাশে প্রধানমন্ত্রীর মালা-পরানো ছবি। ধূপদানি থেকে গুচ্ছ ধূপকাঠির ধোঁয়া যেন অব্যক্ত যন্ত্রণার মতো জড়িয়ে-পেঁচিয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে। এইসব মণ্ডপ আলোকসজ্জায়, মাইক্রোফোনের চোঙ, আর প্রতি-মায় সজ্জিত থাকার কথা ছিল। বেকার, বাউন্ডুলে আর মস্তানের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে বারোয়ারি মণ্ডপে পূজিত দেবদেবীর সংখ্যাও শহরে বাড়ছে। এই একটি সম্প্রতি-প্রসারমাণ বারোয়ারি পুজোর প্রাক্কালেই তাঁর তিরোভাব উদ্যোক্তাদের সব আনন্দ মাটি করে দিয়েছে। তারা এখন জনগণের চাঁদার টাকা কীভাবে খরচ করা যায় তা নিয়ে শলা-পরামর্শ করছে। সুগন্ধি ধূপের আড়ালে কোথাও অবিরাম সিগারেট পুড়ছে, কোথাও গেলাসে-গেলাসে অতিসন্তর্পণে ঢালা গোপন পানীয় থেকে বুদ্বুদ উঠছে। কেউ সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, অবশিষ্ট চাঁদার টাকাটা আগামী বছর খরচ করা যাবে ; কেউ বলছে, এই টাকা দিয়ে মহল্লায় তাঁর একটি মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা হোক ; কেউ ঠিক করল, জম্পেশ একটা শোকসভা করে টাকাটার খরচা দেখিয়ে দিলেই হবে ; কেউ প্রস্তাব করল, তাঁর শ্রাদ্ধের দিন দরিদ্রনারায়ণসেবা করিয়ে দিলে কেমন হয় ; কেউ বলল, সামনে শীত, পাড়ার গরিবদের মধ্যে খান-কয়েক কম্বল বিতরণ করলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। কম্বলগুলো অবিশ্যি অমুক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে 'ফ্রি'তে বাগাতে হবে। আবার কেউ সিদ্ধান্তে এল, পাবলিকের টাকায় এসব 'নশ্‌কাবাজি' না করে আমাদের খরচখরচা বাদে বাকি টাকাটা ফেরত দিয়ে দেওয়াই ভালো।

শহরের কয়েকটি এলাকায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা, লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ, সম্পত্তিনাশ ইত্যাদি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সেইসব থানায় দশ-বারো ঘন্টার সান্ধ্য আইন জারি হয়েছে। বিশেষ উপদ্রুত এলাকায় রাতে মিলিটারির ফ্ল্যাগ মার্চ চলছে। এক বড়ো রাস্তার দুপাশে দুই দৃশ্য। একটা দিক সান্ধ্য আইনের আওতায় পড়েছে—সেদিকে যথাকালে দোকানপাট, লোক-চলাচল, মোড়ে-মোড়ে আড্ডা-গুলতানি বন্ধ হয়ে গেছে। কল থেকে ছরছর করে জল পড়ে যাচ্ছে—নেবার লোক নেই। শুধু পথের কুকুরগুলো সান্ধ্য আইন-টাইন জানে না বা মানে না বলে সেদিকে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছে। অপর পাশটা যেন মেলার মতো গমগম করছে। একপাশে কোলাহল, আর-একপাশে স্তব্ধতা। একপাশে জীবন অসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, অন্যপাশে প্রতিটি ইন্দ্রিয় সজাগ রেখে প্রবলভাবে জেগে রয়েছে। চিলতে-ঘর যাদের কাছে শুধু আহার-নিদ্রার স্থল, অসময়ে সেই ঘরে ঢুকে যারা অভাব-অশান্তির ভাগীদার হতে চায় না, তেমন কিছু ছেলে-ছোকরা ওপর থেকে এপারের কারফিউমুক্ত 'ঠেক'-এ এসে আড্ডা দিচ্ছে, যথাসময়ে রাস্তা পার হয়ে সুড়ুত করে

ওপাশে চলে যাবে। মাঝে-মাঝে টহলদার পুলিশভ্যান দেখে তারা ফুটপাথের কিনার থেকে একটু হটে যাচ্ছে। পরে আবার এগিয়ে আসছে।...

কাগজে খবর বেরুচ্ছে, প্রধানমন্ত্রীর শোকে নানান জায়গায় নানাবয়সী মানুষ আত্মাহুতি দিচ্ছে। সেসব খবর দেখে শহরের জিঘাংসু-রিরংসুরা মতলব এঁটে ফেলল। এই একটা সুযোগ। এই মওকায় যদি কাউকে খতম করে দেওয়া যায় তবে তা প্রধানমন্ত্রীর শোকে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়া যাবে। এক স্পর্শকাতর তরুণী গৃহবধূ আবেগভরে তার ডায়েরিতে লিখেছিল, 'আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রীর নৃশংস হত্যাকাণ্ড আমার বুকে শেলের মতো বিঁধেছে, আমারও মরে যেতে ইচ্ছে করছে।' বাড়ির সুযোগসন্ধানীদের হাতে সেই ডায়েরি পড়ায় মেয়েটির মৃত্যুসাধ আর অপূর্ণ থাকল না। তার গায়ে কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে মেরে সে তাঁর শোকে আত্মহত্যা করেছে বলে চালিয়ে দেওয়া হল। এক কিশোরীকে গণধর্ষণ করে গুন্ডারা তাকে বেহুঁশ অবস্থায় পুকুরের জলে ডুবিয়ে মারল। এই পাশবিক হত্যাটিকেও তাঁর শোকে আত্মহত্যা বলে চালানোর জোর চেষ্টা হতে লাগল, কারণ অপরাধীদের 'দাদা'র জোর আছে।

শহরের কিছু নামি-দামি জ্যোতিষীর আখড়াতেও শোকের ছায়া নেমেছে। সে-শোক প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াণের জন্য ততটা নয়, এই জ্যোতিষীরা মুষড়ে পড়েছেন তাঁদের গণনা মেলে নি বলে। তাঁর জীবনহানি সম্বন্ধে ঘুণাক্ষরেও ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন নি তাঁরা, উলটে কেউ-কেউ বলেছিলেন, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর শরীর সুস্থ থাকবে। প্রশ্ন-পিছু পাঁচশ টাকা ফি নেন এমন এক জ্যোতিষী মনে-মনে সাফাই গেয়ে রাখলেন, এখন কথা উঠলে বলতে হবে—তিনি জানতেন, কিন্তু ইচ্ছে করেই এই সাংঘাতিক ভবিষ্যদ্বাণী করেন নি, তাতে দেশবাসী মুষড়ে পড়ত, দেশের সংহতি নষ্ট হত, শত্রু-দেশ সুযোগ নিত। আর-এক জ্যোতিষীর আখড়ায় বসে কয়েকজন বলাবলি করছেন, নির্ঘাত কোষ্ঠীতে জন্ম-সময়ে বা তারিখে গড়বড় আছে, তাই তাঁদের অভ্রান্ত গণনা মেলে নি। কিন্তু দেশের প্রধানমন্ত্রীর মতো অতি-বিখ্যাত ব্যক্তির ক্ষেত্রে নথিবদ্ধ জন্মদিনক্ষণ নিয়ে অকৃতো-ভয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা চলে না, সুতরাং বলতে হবে, দেশের স্বার্থে তাঁরা এই ভয়ংকর সত্য গোপন রেখে-ছিলেন।

বইপাড়ার এক প্রকাশকের ঘুপচি ঘর। টেবিলের উপর সদ্যপাকার খবরের কাগজের কাটিং। এমন একটা রাগরঙে বিষয় পেয়ে আশাতিরিক্ত লাভের সম্ভাবনায় প্রকাশক গোঁফ চুমরোচ্ছেন। ভাবখানা যেন—যা একখানা ছাড়ব এবার বাজারে! তাঁর সামনে এক মরসুমি লেখক বসে। প্রকাশকের সময়োচিত বিচক্ষণতার তারিফ করে তিনি বললেন, "এ-বই আপনার হিট করবেই।"

প্রকাশক : দেখুন—আপনার হাতযশ আর আমার কপাল। টপিকাল সাবজেকটের ওপর মারকাটারি-মারকা দুখানা বই তো করলাম, পাঠক তেমন নিল না। এবার ক্রাইম, ভায়োলেনস আর পলিটিকসের সঙ্গে সেনটি-মেনটটা একটু ভালোভাবে পানচ করে দেবেন।

চার দিনের দিন রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর নশ্বর দেহের অন্ত্যেষ্টি হল। সারা দেশের সঙ্গে এই শহরের অসংখ্য মানুষও বেতার বা দূরদর্শনের শ্রুতিদৃশ্যময় শোক-বিবরণীতে শেষবারের মতো চোখ মুছতে লাগল। অনেকে বলল, তিনি সশরীরে আজ পর্যন্তও ছিলেন, এবার সত্যি-সত্যি চলে গেলেন। এইভাবেই মানুষ মৃত প্রিয়-জনের নিষ্প্রাণ নশ্বর দেহ আঁকড়ে রেখে তাকে জীবিত ভাবতে চায়। অন্ত্যেষ্টির আগে পর্যন্ত তাঁর সত্যি-সত্যি চলে-যাওয়ায় বিশ্বাস করে না। কিন্তু আমি সেই প্রথম দিনই রাজধানীর আকাশপথে যেতে-যেতে তাঁর সত্যি-সত্যি চলে-যাওয়া দেখেছি। দেহের খোলস ছেড়ে তাঁর অবিনশ্বর আত্মা থাপখোলা তরোয়ালের মতো বায়ু-মণ্ডলের সর্বোচ্চ স্তরে—অর্থাৎ এক্সস্ফিয়ারে উঠে গেছে, যে-স্তর মৃত্যুত্তীর্ণ মানুষের বহু-আকাঙ্ক্ষিত দেবযান। কিন্তু সবাই সেখানে যেতে পারে না, একমাত্র উত্তমাত্মা-দেরই গতি হয় সেখানে। মধ্যমাত্মা, অধমাত্মা আর নীচাত্মারা কর্মফল অনুযায়ী যথাক্রমে আয়নোস্ফিয়ার, স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার এবং ট্রোপোস্ফিয়ারে ভেসে বেড়ায়। উচ্চমার্গের আত্মারা অবশ্য প্রয়োজনে নীচে নামতে পারে, যেমন আমি স্ট্র্যাটো-স্ফিয়ারের বাসিন্দা হয়েও ট্রোপোস্ফিয়ারে নেমে এসে-ছিলাম একটু কাছ থেকে দেখব বলে। কিন্তু নিম্নমার্গের আত্মারা তাদের শূন্যসীমার ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না। কাজেই তাঁর আত্মার নাগাল পাওয়ার সাধ্য আমার নেই।

তবে মানুষের টেলিভিশনের মতো শূন্যমার্গে স্থানে-স্থানে আমাদেরও ইথারোভিশন আছে। এবার এখান থেকে নিজের এলাকায় ফিরে গিয়ে তার একটায় চোখ রাখলেই তাঁর আত্মার অবস্থা-অবস্থান্তর প্রতিক্রিয়া-বিক্রিয়া সব দেখতে পাব। দুই প্রকাশ্য আততায়ী তাঁর শরীরকে নিহত বিকৃত করেছিল, আর সংখ্যাতীত ছদ্ম আততায়ী তাঁর অবিনাশী আত্মাকে বিনষ্ট করতে না পারলেও অবিকৃত থাকতে দেয় নি—এ-বিষয়ে আমি স্থির নিশ্চিত। নিহত হবার আগের দিন এক জনসভায় তিনি বলেছিলেন, '...আমার দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দুই এই দেশের সমৃদ্ধি, শক্তি ও গতিকে বাড়িয়ে তোলার কাজে নিবেদিত হবে, একথা আমি নিশ্চিতভাবে জানি।' কিন্তু পরদিনই তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর সুযোগ নিয়ে দেশব্যাপী নরহত্যা, তাণ্ডব, ধ্বংসলীলা ইত্যাদি দূর থেকে দেখে তাঁর আত্মা নিশ্চিত শিহরিত হচ্ছে। জীবদ্দশায় তিনি ভাবতেও পারেন নি, তাঁর অবিরলক্ষরিত অজস্র রক্তবিন্দু দেশের সমৃদ্ধি, শক্তি ও গতির চাকাকে এইভাবে উলটো দিকে ঘুরিয়ে দেবে। আমি নিজের এলাকায় উঠে গিয়ে ইথারোভিশনে দেখতে পেলাম, তাঁর হেমবর্ণ আত্মা যন্ত্রণায় নীল হতে-হতে মহাকাশের সর্বগ্রাসী নীলিমার প্রেক্ষাপটে ক্রমশ দুর্নিরীক্ষ্য হয়ে উঠল, তারপর একসময় অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমাদের সবার আপন

ঢোলগোবিন্দ-র আত্মদর্শন

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

১৩

সময় হল, নোঙর তোলো

পেছনের খাল পেরোলে ফুটবলের মাঠ। তার পশ্চিম দিয়ে গেছে দূরদূরান্তরে যাওয়ার সেই রাস্তা। ঘাড়ে চিঠির থলি নিয়ে ঘন্টা ঠুনঠুনিয়ে রোজ বাঁধা সময়ে যায় রানার। মাঝেমধ্যে আসে জমিদারদের হাতি। উট আসে বকরিদের আগে কোরবানির জন্যে।

উত্তরে একটু এগোলে আশ্রম। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের। তখনও ওঁদের তেমন নামডাক হয় নি।

কী একটা উপলক্ষ থাকায় আশ্রমে লোক আসছিল কাতারে-কাতারে। তার আবার বিশেষ একটা কারণও ছিল।

ঢোলগোবিন্দ থামল। এই প্রসঙ্গে ও একটু আলুদার কথা বলে নিতে চায়।

স্মৃতির পুঁজি যাদের কম, তাদের সকলেরই কিছু ব্যাঙের আধুলি থাকে। আলুদা হল ঢোলগোবিন্দ-র এমনি এক ব্যাঙের আধুলি। ওর সব স্মৃতিকথাতেই আলুদা ঘুরেফিরে আসে।

গ্রীক পুরাণে শিল্পের দিক্‌পাল দেবী ন-জন। (আমাদের সরস্বতী অবশ্য একাই একশো।) হালে সিনেমাকে অবশ্য দশম স্থানে বসানো হচ্ছে। ফলে, দশটা দিক্‌ই ভরে ফেলা গেছে। সাহিত্য যে সবার ওপর দিয়ে যায়, এটা গুমর করে বলবার জন্যেই পুরাণের এই অবতারণা। সাহিত্যে দেশকালের বেড়া যখন খুশি টপকানো যায় বলে সাহিত্যের প্রতি ঢোলগোবিন্দ-র এই পক্ষপাত।

ছাই! আসল কারণটা আমি জানি। বেজায় ভুলো বলে ঢোলগোবিন্দ যখন যেটা মনে আসে সেটা তখন তখনি কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে হালকা হতে চায়। পরে সুযোগ মিলবে কিনা কিংবা কন্‌ই চালিয়ে জায়গা করে নেওয়া যাবে কিনা কে বলতে পারে?

নওগাঁ থেকে ঢোলগোবিন্দরা চলে আসার পর দু-তিন বছরের মধ্যে একবার বাংলা খবরের কাগজে সেকালের প্রথম বাঙালি বৈমানিকদের ওপর একটা লেখা বেরিয়েছিল। তাতে ছিল আলুদার ছবি। তার নীচে লেখা ছিল কে. এন. চৌধুরী। কৃষ্ণেন্দুনাথ চৌধুরী।

দু বছর আগে বৈমানিকের বেশে আলুদার সেই ফটো শিলিগুড়িতে ও'র বাড়ির বৈঠকখানার দেয়ালে টাঙানো আছে দেখে এসেছি।

সে যুগে প্লেন চালানো শিখতে বিস্তর টাকা লাগত। আলুদার পক্ষে সেটা খুব বড়ো রকমের হয় নি। প্রথমে জমিদারি ছিল। কিন্তু অত কাঠখড় পোড়ানোর পরও শেষরক্ষা হল না। তখন ছিল ইংরেজদের আমল। স্বদেশি করে কেউ জেলের চৌকাঠ ছুঁলেই সরকারের কাছে সে হত অচ্ছুত। পুলিশ রিপোর্টে সেটা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় আলুদা ওড়া-বিদ্যে শিখেও পাইলটের লাইসেনস পেলেন না।

এরপর মনে-মনে ঢোলগোবিন্দ একলাফে চলে আসে আজকের শিলিগুড়িতে। মাঝখানের আধখানা শতাব্দী যেন কিছুই নয়।

আলুদার জীবনে তা অনেক কিছু। দেশভাগ হওয়ার পর লাখ-লাখ টাকার কারবার আর বিষয়-সম্পত্তি ফেলে দিয়ে একদিন হঠাৎ রাতারাতি আলুদাকে একবস্ত্রে সীমান্ত পেরিয়ে চলে আসতে হয়েছিল। ধরাশায়ী না হয়ে আলুদা যে আবার মাটি থেকে ঠেলে উঠেছিলেন, সমস্ত ঝড়ঝাপটা কাটিয়ে এখন যে তিনি শিলিগুড়ির মস্ত লোক, আলুদা বললে লোকে যে একডাকে চেনে—হয়তো এটা সম্ভব হয়েছে আকাশের মতিগতি বুঝে শূন্যে ভাসার মন্ত্রটা যৌবনে পা দিয়েই তিনি শিখে নিতে পেরেছিলেন বলে।

বাবুপাড়ায় আলুদার বাড়ির দুই গেটে দুটো মূর্তি।

একটি মূর্তি ঢোলগোবিন্দর চিনতে একটু মুশকিল হয়েছিল। সে মূর্তি সৌম্যকান্তি এক সাধুর।

আলুদার বাবা। কামদাকান্ত চৌধুরী।

আমরা নওগাঁয় থাকতেই উনি সংসার ত্যাগ করে সাধু হন। আমি ওঁকে একবারই দেখেছি।

সন্ন্যাসী হয়ে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের উৎসব উপলক্ষে সেও তাঁর প্রথম নওগাঁয় আসা। সাধুবেশে ওঁকে দেখার জন্যে শহর ভেঙে লোক এসেছিল।

এখনও মনে আছে, বাঁশের বেড়া ধরে দাঁড়িয়ে আমি আর দাদা ঠায় তাকিয়ে আছি। আলুদার বাবা কামদাবাবু এক জায়গায় আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে চোখ বুঁজে ধ্যান করছেন।

এক সময়ে এসে হাজির হলেন আলুদার মা। তাঁর চোখের কোণে জল। ভেতরে গিয়ে গড় হয়ে প্রণাম করলেন। মনে হল, আলুদার বাবা একবার চোখ খুলে তাকালেন। পরক্ষণেই চোখের পাতা বুঁজে গেল। মুখে কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। কিছুক্ষণ আঁকা ছবির মতো দাঁড়িয়ে থেকে চোখে আঁচল চাপা দিয়ে আলুদার মা বেরিয়ে এলেন।

একটু আগে আলুদার বাবাকে দেখে ঢোলগোবিন্দ মনে-মনে খুব তারিফ করছিল। আলুদার মা চলে যাওয়ার পর-পরেই তার সেই মনের ভাব হঠাৎ বদলে গেল। আলুদার বাবার ওপর তার খুব রাগ হতে লাগল। যারা সাধু-সন্ন্যাসী হয়, তাদের নিশ্চয় দয়ামায়া কম।

সাঁতারটা রপ্ত করে চলে গেলাম তার পরের ধাপ সাইকেলে।

বাঁ পা প্যাডেলে রেখে ডান পায়ের ঠেলায় টুক করে গোটা শরীরটা মাটি থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া। ডান কাতে সাইকেলটা থাকবে সামান্য হেলানো। তখন আর মাটিতে পা পড়বে না গর্বে।

এরপর শরীরের ভার সামলে ডান পা-টা আরেকটু উঠিয়ে রডের তলা দিয়ে গলিয়ে খপ করে ডান প্যাডেলটা ধরে নেওয়া। এবার পুরো পাক প্যাডেল ঘোরাতে পারলে আর নামা বা থামা নেই। চরৈবেতি চরৈবেতি।

মাথায় আরেকটু বড়ো না হওয়া অবধি এমনি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই চলতে থাকে। তারপর সময় আর সুযোগ বুঝে একদিন হ্যানডেল-দুটো ঝুটির মতো পাকড়ে লাফ দিয়ে ঘাড়ে উঠে সিটের উপর বসে পড়ো।

তখন চলার গতিবেগে এক স্বর্গীয় সুখ। খানাখন্দ মাঠ-ঘাট পেরিয়ে শয়নে স্বপনে চালিয়ে নিয়ে যাবে দুটো দুরন্ত ঘুরন্ত চাকা।

দুটো চড়নদার পায়ের নীচে ক্রমাগত পিছলে যাবে ধুলোয় ধরাশায়ী মাটি।

আর ছেলেবেলার সেই দিনগুলোতে হঠাৎ-হঠাৎ যে কারো বাড়ির পৈঠেয় দাঁড় করিয়ে রাখা সাইকেলগুলো চোখের নিমেষে বেপাত্তা হয়ে গিয়ে খানিক পরে যে-কে সেই কখন যে ফিরে এসে যাবে, যার সাইকেল সে হয়তো তা জানতেও পারবে না।

শরীরে কিছু একটা হয়। খেলতে-খেলতে ঠ্যাংটা একটু বাড়িয়ে দেওয়া। ডিগবাজি খেয়ে কেউ পড়ে গেলে

হাততালি দিয়ে হেসে ওঠা। কে দুর্বল সেটা বুঝে নিয়ে খুনসুটি করা। চাঁটি মারা। চিমটি কাটা। যাতে সে ব্যথা পায়। যাতে তার লাগে।

পায়ে পা বাধিয়ে ঝগড়া করতে ইচ্ছে করে। রাগ চড়ে গেলে মনে হয় মেরে ফাটিয়ে দিই। 'কাম অন, ফাইট' হয়ে যায় কথার মাত্রা।

ঢোলগোবিন্দর মনে পড়ে, এক সময় সে কী নিষ্ঠুর ছিল। ছুতোনাতায় একবার কারো গায়ে হাত তোলা। মেরে হাতের সুখ করা।

তার মধ্যে আত্মরক্ষার কোনো ব্যাপারই ছিল না। হিংস্র জন্তুর মতন আগ বাড়িয়ে শিকারের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়া। খেলায় প্রতিপক্ষকে হারাবার জন্যে সে জান লড়িয়ে দিত।

বাইরে প্রকাশ পেত না। ইচ্ছেগুলো থাকত প্রচ্ছন্ন। মনের কোণে লুকোনো।

ছায়াদিদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল কিভাবে মনে নেই।

রায়সাহেব আসার পর থেকেই শহরের হাওয়াটা ঘুরে গিয়েছিল। তার কারণটা শুধু এ নয় যে, তাঁর দুই মেয়ে প্রায় জোর করেই ছেলেদের ইস্কুলে ভরতি হয়েছিল।

শুধু মহকুমার হাকিম তো নন। ইস্কুলেরও চাঁই লোক। কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে তাঁর হুকুম নড়াবে?

শুনে মনে হবে, খুব জাঁদরেল লোক। নিশ্চয় খুব জবরদস্ত। একেবারেই নয়।

তার একটা প্রমাণই যথেষ্ট। সামান্য আবগারি দারোগার ছেলে হয়ে আমরা অকুতোভয়ে তাঁকে মেসো-মশাই আর তাঁর স্ত্রীকে মাসিমা বলে ডাকতাম। আস্ত একটা মহকুমার হাকিম। সে কি যা-তা কথা?

আগে পরে অনেক হাকিমই এসেছে গেছে। আত্মীয়-স্বয় আর মিশুকে বলতে ওই একজনই। রায়সাহেব।

হয়তো এর পেছনে মাসিমারও হাতযশ ছিল। এটা তো ঠিক যে, মেয়েদের উনি আঁচলের তলায় রেখে পুতু-পুতু করে মানুষ করেন নি।

ছায়াদি কণাদি প্রথম দিনই সোজা নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিল ওদের খাবার ঘরে।

বাড়িটাও ঘুরে-ঘুরে দেখেছিলাম। বাপরে, কী বড়ো বাড়ি। নদীর দিকে মুখ ফেরানো। কী বড়ো-বড়ো ঘর আর বারান্দা। বাগানে কত ফুলের গাছ।

হওয়ারই কথা। হাকিম যে।

মাসিমা খুবই দরাজ মনের ভালোমানুষ। মা-র মতো ভাব আছে, তবু ঠিক-মা নয়। মা-র মতোই গা-গতরে ভারী। তবে রঙ অনেক ফরসা। আঁচলে চাবির ভারটাও অনেক বেশি।

সচ্ছল সংসারের মানুষ যারা, তাদের চালচলন কথা-বার্তা আদর-আপ্যায়নের ধরনটাই হয় একটু আলাদা। ঢোলগোবিন্দ লক্ষ করেছিল মাসিমার সোনার চুড়িগুলো একটুও মাড়মেড়ে নয়। কিংবা ক্ষয়ে পাতলা হয়ে যায় নি। হাঁকডাকের মধ্যে ছিল একটা নিঃসংশয় কর্তৃত্বের সুর। আমার মার মতন কালো রঙের মুখে একটা শুকনো খড়িওঠা ভাব কিংবা কপাল-কোঁচকানো কোনো রেখা নেই।

অভাবের সংসারে মানুষ হওয়ার এই একটা মুশকিল। মনটা কখনই খুব একটা নির্ভাজ হতে পারে না। কুঁকড়ে ছোটো হয়ে যায়। তুলনা আর প্রতিতুলনার ফেরে পড়ে কিছুই আর সহজভাবে নেওয়া হয়ে ওঠে না।

শুধু ছায়াদিই যা আলাদা।

অরগান বাজিয়ে গান শোনায় ছায়াদি। শুনেই বোঝা যায়, চিত্তকাকার শেখানো রবিঠাকুরের গান। সেসব গানের কোনো সুরই যে ঠিক নয়, ছায়াদি তা নিশ্চয় পরে পদে-পদে ঠেকে শিখেছিল।

ছোটোদের যতটা হাবাগোবা ভাবা যায়, আসলে তারা তা নয়। ঢোলগোবিন্দ সেই সময়েও নিজেকে দিয়ে তা বুঝতে পারত। ওরা মিচকে শয়তান। সব বুঝেও না-বোঝার একটা ভান করে।

সব বোঝে, এটা বলা অবশ্য ঠিক হল না। খানিকটা কুকুরের মতো। গন্ধ পায়। একটা কোনো ব্যাপার আছে —এটা বড়োদের কথা থেকে আঁচ করতে পারে। স্ত্রীলিঙ্গ-পুংলিঙ্গের ব্যাপারটাই যে জগতে সবচেয়ে মুখরোচক, কান একটু খাড়া রাখলেই তা টের পাওয়া যায়।

রায়সাহেবদের বাড়িতে ঢোলগোবিন্দ এই যে এতক্ষণ কাটাচ্ছে, বাইরে সেটা লক্ষ করবার লোকের অভাব নেই। এ বাড়িতে থেকে বেরোনো মাত্র কেউ না কেউ ধরবে। 'কী রে, হঠাৎ এদিকে? গিয়েছিলি কোথায়? তা তোকে

গান গাইতে বলল? আবৃত্তি? শুধু তোরা না আরও কেউ ছিল ওখানে?'

ঢোলগোবিন্দ মনে-মনে হাসে। ওদের পরীক্ষায় এক আর অষ্টিতীয় প্রশ্নটা কিছুতেই ওরা মুখে আনবে না। জিগ্যেস করবে না, 'হ্যাঁ রে, তোর ছায়াদি কী করছিল রে?' টোপের চারপাশে হয় বড়শবুড়ি কাটবে, নয় ঘাই মেরে দূরে পালাবে।

কাজেই ঢোলগোবিন্দ ওদের বুকে জ্বালা ধরাবার জন্যে ইচ্ছে করেই বলবে, "ছায়াদি আমাকে লজেনচুস দিয়েছে।"

এই মিথ্যুক, লজেনচুস তোকে মাসিমা দিয়েছে না?

চালের মন আট টাকা উঠেছে।

শোনার পর থেকে বাবার মেজাজ চড়ে গেছে। খুব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মা-কে বাবা এমন বাকযন্ত্রণা দিয়েছেন যে, অভিমানে মা-র গলা দিয়ে আজ ভাত নামে নি।

ঠাকুরদা কোথায় এরকম সময়ে মা-র পক্ষ নিয়ে বড়ো ছেলেকে কিছু বলবেন, তা নয়। ও'র তখন বেজায় আঠা গাঁতায়।

আবার এক সাকরেত জুটেছে নতুন। ঠাকুরদা যা বলেন হাঁ করে গেলে। রেকর্ড আপিসে কেরানি ছিলেন। রিটায়ার করে হঠাৎ পরলোকের কথা মনে পড়ে গেছে।

সব আমাদের কানে যায়। কেননা একই জোড়াদেওয়া তক্তাপোশে বসে আমাদের পড়তে হয়।

সাকরেতটি পাওয়ার পর থেকে ঠাকুরদার ঠাটবাটও বদলে গেছে। গলার পৈতেটা রোজ রগড়ে-রগড়ে ধোন। সাবানও লাগান। খুব সম্ভব ঠাকুরদার সাকরেতটি খুব একটা উচ্চবর্ণের ছিলেন না। নইলে ঠাকুরদাকে প্রায়ই কেন 'আপনি ব্রাহ্মণের সন্তান' 'আপনি ব্রাহ্মণের সন্তান' বলে উনি অত তোল্লা দেবেন।

ঠাকুরদা এমন ভাব দেখান যেন কত না সংস্কৃত জানেন। আসলে উনি পড়েন বাঙলা অক্ষরে সংস্কৃত। সেখানে সব শ্লোকেরই বাঙলায় মানে দেওয়া আছে।

'অহং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা তমবমান্যো মাং মর্ত্যঃ কুরুতেঽর্চাবিড়ম্বনম্॥ যো মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্। হিত্বার্চাং ভজতে মৌঢ্যা-ত্তস্মান্যেন জুহোতি সঃ॥ অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎ-পন্নয়ানঘে। নৈব তুষ্যেঽর্চিতোঽর্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ॥ অথ মাং সর্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্। অর্হয়েদ্দান-মানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা॥'

'অর্থাৎ কিনা, ভগবান বলছেন : আমি সর্ব সময় সবার মধ্যে জীবাত্মা হয়ে বিরাজ করছি। সেভাবে না দেখে মানুষ যে আমার পুজো করে, সেটা তার অনর্থক দুর্ভোগমাত্র। আমি তো সর্ব জীবের মধ্যে আত্মা হয়ে, ঈশ্বর হয়ে রয়েছি—তবে আর কেন বোকার মতো ভস্মে ঘি ঢেলে ভজন-পূজন করা? জীবে যার অভক্তি, সে ভালো-মন্দ জিনিস দিয়ে এই করে সেই করে হাজার পুজো-অর্চনা করেও আমায় তৃপ্ত করতে পারে না। আমি সবার মধ্যে জীবাত্মা হয়ে ঠাঁই নিয়ে আছি। কাজেই বন্ধুভাবে সমান চোখে দেখে দিয়ে-থুয়ে সসম্মানে সকলের সেবা করো।

'মনে রেখো, গীতার এটাই হল সার কথা। জীবে প্রেম, পরকে আপন বলে ভাবা, সকলের সেবা করলেই ভগবানের পুজো করা হবে।'

ঢোলগোবিন্দ আর তার দাদা এসব শুনে মনে-মনে হাসে।

সবচেয়ে বেশি হাসি পায় ঠাকুরদার চেলার গদ্গদ ভাব দেখে। আহা বেচারা! যাক, এতদিনে ঠাকুরদা এক-জন শ্রোতা পেয়েছে।

বেলুড় মঠে দীক্ষা নেওয়ার পর থেকে মা-বাবার সম্পর্কের তুলাদণ্ডে মা-র পাল্লা একটু ভারী হয়েছে। পুজোর আসনে বসে বাবার চোখ চাওয়া-চাওয়ি থেকে আর মাঝে-মাঝে ইশারায় কথা বলা থেকে বোঝাই যাচ্ছিল এসব জপতপ বাবার বেশিদিন সইবে না।

সেটা আরও বোঝা গেল, যখন পশুপতিদাদুর দোহাই দিয়ে বাবা একদিন বলেই ফেললেন, আসলে মালা জপার চেয়েও বড়ো কথা হল মনে-মনে ঠাকুরকে স্মরণ করা। আপিসে বসে কাজ করতে-করতেও তা করা যায়।

শুনে মা চুপ করে রইলেন। কিন্তু মা-র পশুপতি-মামা তো আর শুধু নওগাঁর মুনসেফ নন, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে মা-র কাছে তিনি হলেন সাক্ষাৎ হাইকোর্ট। পটল মহারাজের দাদা। সেখানে আগেভাগেই বাবা আপিল জিতে বসে আছেন।

বাবা হাতের বাইরে চলে যাওয়ায় মা-র পুজোআর্চার মাত্রাটা যেন বেড়ে গেল। এর পেছনে হয়তো বাবাকে শিক্ষা দেবারও একটা ব্যাপার থেকে থাকতে পারে। তার

ওপর শুরু হয়ে গেল প্রতি শুক্রবার মা-র সংকটা। সারাদিন শুকিয়ে থেকে সন্ধেবেলা একটু ফলাহার।

বাবা বেশ ফাঁপরে পড়লেন।

মা-ও বোধহয় সেটাই চেয়েছিলেন।

মা সেবার কলকাতায় গিয়ে কালীঘাট থেকে কিনে এনেছিলেন পকেট সাইজের একটা বাঙলা গীতা আর নরোত্তম দাসের শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশতনাম।

মা সুর করে-করে পড়েন :

জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর
কৃষ্ণচন্দ্র কর দয়া করুণাসাগর॥
জয় রাধে গোবিন্দ গোপাল গদাধর
শ্রীরাধার প্রাণধন মুকুন্দ মুরারি।...
শ্রীনন্দ রাখিল নাম নন্দের নন্দন।
যশোদা রাখিল নাম যাদু-বাছাধন॥...

আমাদের বাড়িটাকে গানের বাড়ি বলা হত মা-কে হিসেবের মধ্যে না এনে। মা-র গলায় সুর ছিল না বটে, কিন্তু নামকীর্তন করার সময় সুরের ঘাটতিটুকু পুষিয়ে দিত মা-র প্রাণের আবেগ। আবেগের চেয়েও বেশি ছিল কিসের যেন একটা ব্যগ্রতা। সংসারের বজ্র আঁটুনিতে কিছু ফসকা গেরো ছিল মা-র মুঠোর মধ্যে।

'নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার।
অনন্ত কৃষ্ণের নাম মহিমা অপার॥...
যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি॥'

ঢোলগোবিন্দ এখন বোঝে, একটা কিছুতে হেলান দিতে পারলে চোখ বোঁজাটা সহজ হয়।

নাম ছিল মা-র কাছে এই রকমের ঠেস দেবার একটা জায়গা।

বাবা নিজেকে ধরে রেখে বুদ্ধির রাস্তায় চলতে চান। মা চলেন হৃদয়ের তাড়নায় বিশ্বাসের রাস্তায়।

আর এ-দুইয়ের মাঝখান দিয়ে পা টিপে-টিপে চলেন ঠাকুরদা।

ইস্কুলের মাঠ পেরিয়ে পশুপতিদাদুর বাড়ি যাওয়ার রাস্তায় শহরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে নওগাঁর টাউন ক্লাব, পাবলিক লাইব্রেরি আর তার পেছনে বাঙালির চিরন্তন কালীবাড়ি।

বাঙালি কথাটার এখানে বিশেষ একটা তাৎপর্য আছে।

উত্তর বাঙলার প্রায় সব নতুন শহরেই মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা সকলেই বহিরাগত। রাজারাজড়া আর নবাবদের হাত-ধরা হয়ে এসে নিষ্কর জমি-জায়গা হাতিয়ে নিয়ে একদল আগে থেকেই প্রথমে ভূস্বামী এবং পরে জমিদার হয়ে বসেছিল।

আরও পরে তারা হয় গ্রামে গরহাজির খাজনাভোগী শহুরে সম্প্রদায়। পরে তাদের জ্ঞাতিগোষ্ঠীদের সঙ্গে চলে আসে নানা পেশার আরও বিস্তর লোকজন। কেউ গঙ্গা পেরিয়ে, কেউ পদ্মা পেরিয়ে।

বাঘ-ভালুকের সঙ্গে লড়ে জঙ্গল হাসিল করে তৈরি হয়েছিল এখানে ফসলের খেত। তারা কোণঠাসা হয়ে বাইরের জোয়ারে চাপা পড়ে আর মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

নওগাঁর বাবুসমাজের মধ্যে গ্রামের সেইসব সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগ ছিল একমাত্র আমার সেজোকাকার। ইস্কুলে পড়ানোর সুবাদে হপ্তার ছ-টা দিন গ্রামেই বাস করত বলে আঞ্চলিক কথ্য ভাষাটাও সেজোকাকা বেশ রপ্ত করে নিয়েছিল। মিশুকে স্বভাবের মানুষ আর সেইসঙ্গে গানের গলা ভালো হওয়ায় সেজোকাকা অক্লেশে রাজবংশীদের হেঁসেলে ঢুকে গিয়ে চায়ের জন্যে গরম জল আর পানদোক্তা চেয়ে আনতে পারত। গাঁয়ে মাস্টারবাবুদের ছিল সাতখুন মাপ।

পরের মুখের ভাষা নিয়ে হাসাহাসি করাটা আমাদের একটা রোগ। সব জাতেরই অল্পবিস্তর এ রোগ আছে। নওগাঁর বহিরাগতরা ঠোঁট উলটে যাকে বলত বাহে ভাষা, সেজোকাকার মুখে শুনে ঢোলগোবিন্দ বুঝেছিল কী মিষ্টি সেই ভাষা।

'নিন্দালু-রে, রে-নিন্দালু! এইঠে আইসো। কোঠেকার অ্যাল্যায় বড়ো নোকের ছোয়া হইসে, বায় রে বায়।'...

'বাপো গেইসে হাট, মাও গেইসে হাট,
মাও আনিবে মোলার নাড়ু, বাপ আনিবে খাট।
ওই খাটত চড়িয়া যাম বিন্দাবনের হাট।
বিন্দাবনের হাটতে নাউ ফলিসে।
নাউর উপর ঢোঁড়া সাপ ফপ্পেয়া উঠিসে।
দুই কোণা পিতলের থুরি ভাসিয়া বেড়াসে।
একনা নিগিল ধরম ঠাকুর, একলা নিগিল টিহা
টিহার বেটি বিহাও হসে নাল খরিখান দিয়া
নাল খরিখান ঘোটোর মোটোর মোন্দে আঙ্গার ডোর
প্যাট মাঙ্গিটা ফরফরাসে ভাতার নিগা তোর॥'

বড়ো রাস্তায় পড়ার আগে টানা একফালি জমিটাতে শীতে ফি বারের মতো এবারও টোল ফেলেছে বেদেরা। বেদেনীদের কী সুন্দর যে দেখতে। কোলে বাচ্চাদের নাকে জল গড়ায়। কাঠকুটো পাতা জড়ো করে রেখেছে। একটু রাত হলে জেলে নিয়ে আগুন পোয়াবে। কোর্ট-কাছারির লোকেরা বাড়ির পথে একটু দাঁড়িয়ে যায়। জড়িবুটি বেচে। হাত দেখে। চোখে-চোখে কথা হয়। ঘাঘরাগুলো পায়ের কাছে খসর-মসর করে। উড়তে চায়।

বাড়ি গিয়ে গিন্নিদের সবাই সাবধান করে। ঘরে খিল এঁটে রেখো। থালা-বাটি শাড়ি-জামা হুঁশিয়ার।

একদিন দেখা গেল, শুধু কিছু ছাইভস্ম পড়ে। লোকগুলো ভোঁ-ভাঁ। কেবল এর বাড়ি অমুকটা নেই, ওর বাড়ি তমুকটা নেই। চুরি করা নাকি ওদের জাতধর্ম। যুগ যুগ ধরে এটা হয়ে আসছে। লোকের মন থেকে চুরির সে দাগ সহজেই মুছে যায়।

শহরে যে ঢেঁঢরা পড়ে গেছে। রায়সাহেবের বাড়িতে চায়ের নেমন্তন্ন।

অ্যাং যায় ব্যাং যায় খলসে বলে আমিও যাই।

আজ্ঞে না। শুধু বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র, শিবের ত্রিশূল, ব্রহ্মার অক্ষ, ইন্দ্রের বজ্র, বরুণের পাশ, যমের দণ্ড, কার্তিকেয়ের শক্তি, দুর্গার অসি। অষ্টবজ্রসম্মেলন যাকে বলে। শহরের বাছা-বাছা লোক। বিশেষ অতিথি বলতে আমি আর দাদা। একমাত্র ছানাপোনা।

মহকুমা হাকিম বলে কথা। তার বাড়ির গেটে সেপাই দাঁড়িয়ে। মাছি গলুক দেখি।

কেন, কী ব্যাপার—কেউ জানে না। কারো ফেয়ারওয়েল নিশ্চয় নয়।

দাদা বলল, দূর বোকা! ফেয়ারওয়েল হলে তো ক্যারিকেচার করতে দাড়িওলা পাঁচুবাবু আসতেন। আর রাজশাহী থেকে ঘোমটা-দেওয়া ক্যামেরা নিয়ে সেই মার্কামারা লোকটা আসত। ফেয়ারওয়েল নয়।

বিরাট বারান্দা ততক্ষণে লোকজনে ভরে গেছে।

টেকো-মাথা সরকারি ডাকতার। তথৈবচ মুনসেফ মশাই। চোগাচাপকান-পরা শুষ্কং কাষ্ঠং হেডমাস্টার মশাই। রসিকপুরুষ পশুর ডাকতার। ছোকরা সার্কেল অফিসার। ব্যাঙ্কের ঘোড়েল ম্যানেজার। পুলিশের বড়ো দারোগা। সুটবুট পরে গাঁজার খেতাল এম-এল-সি। শহরের সব বাঘা-বাঘা উকিলমোকতার। পাটচাষী কো-অপারেটিভের ম্যানেজার। ইস্কুলের কেষ্টবিষ্টুরা সবাই। সোডাকলের বোকা মালিক। সবাই হুজুরে হাজির।

দাদা চোখের ইশারা করে বলল, দ্যাখ্—

পাটভাঙা সাদা খদ্দরের ধুতিচাদরে চিত্তকাকা ভিড়ের মধ্যে ঘুরঘুর করছে। একেবারে ভেতরে গিয়ে অরগানে টুং-টাং করে ফিরে আসছে।

চা-পর্বের পর ভেতরের হলঘরে ডাক পড়ল। মেঝেতে ফরাস পাতা।

ঘরের মধ্যে অরগান বা অন্য কোনো বাদ্যযন্ত্র না দেখে সবাই একটু ধাঁধায় পড়ল।

ঘরের একপাশে টেবিলের ওপর কী একটা বাক্স-মতন জিনিস। তাতে লাগানো হরেক রকমের বিজলির তার। তারগুলো জানলা গলিয়ে বাইরে চলে গেছে। সেখানে ভটর-ভটর করে চলছে ভাড়া-করা একটা ডায়নামো। বাক্সটার মধ্যে থেকে-থেকে জ্বলছে কী-সব আলো।

রায়সাহেব ধুতি-পানজাবি-পরা একজনকে দেখিয়ে বললেন, আমার বড়ো জামাই। একজন মস্ত ইনজিনিয়ার। ও রেডিও শোনাবে। সেইজন্যেই আজ আপনাদের ডেকেছি।

হঠাৎ ঘর থেকে সমস্ত শব্দ কেউ যেন এক গণ্ডূষে শুষে নিল।

রেডিও? অসম্ভবকে সম্ভব করা সেই বেতার?

ঢোলগোবিন্দর শিরদাঁড়ায় বিদ্যুৎ খেলে গেল। কাগজে পড়েছে সে। কলকাতা থেকে কাকিমা চিঠিতেও লিখেছে। টেলিফোন-টেলিগ্রাফের চেয়েও আশ্চর্য ব্যাপার। বিনা তারে এক আজব বাক্সে দূরের শব্দতরঙ্গ ধরা পড়ে।

রায়সাহেবের জামাই জটিল কলকাঠি নেড়ে সমানে সেই চেষ্টাই করে চলেছেন।

গানের মতন একটা আওয়াজ মুহূর্তের জন্যে এসেছিল। হঠাৎ কেউ গলা টিপে ধরায় গোঁ-গোঁ করে যেন মূর্ছা গেল। পরের আওয়াজটা কুকুর-বেড়ালের মতন।

রায়সাহেবের জামাই পরিত্রাহি চেষ্টা করে চলেছেন

যন্ত্রটাকে বাগে আনতে। এ-কানে মোচড় দিচ্ছেন, এটা খুলে সেটা লাগাচ্ছেন। কখনও কুঁই-কুঁই, কখনও কড়-কড়-কড়াৎ, কখনও যেন শাঁকচুন্নির ঝগড়া। কিছুতেই আর কিছু হয় না।

আস্তে-আস্তে শ্রোতাদের আস্থায় চিড় ধরছে। গোড়ায় ফিসফিস করে, পরে সবাই সরবে নিজেদের মধ্যে গল্প জুড়ে দিয়েছে।

ঘণ্টাখানেক পরে প্রথমে একজন-একজন করে, পরে দল বেঁধে লোকে নানা রকমের ওজর দেখিয়ে উঠে পড়তে লাগল।

যারা স্বাধীন পেশার লোক, যেমন উকিল আর মোকতার, তারপর ইস্কুল মাস্টার—এরাই আগে খসে। কিন্তু সবচেয়ে দেরিতে ওঠে সোডাকলের মালিক। লোকটার এত টাকা, তবু সরকারি আমলাদের দেখলে আর জ্ঞান থাকে না। হাত কচলে হেঁ-হেঁ করে আর কুকুরের মতো ল্যাজ নাড়ে।

উকিলরাও তাই। জজ-ম্যাজিসট্রেটদের পয়লা নমবরের ধামাধরা।

দেখা গেল, কয়েকজন ধামাধরা মেরুদণ্ডহীন প্রাণী—তার মধ্যে একমাত্র সোডাকলের মালিকটি বাদে রায়সাহেবের জামাইয়ের ব্যর্থতায় সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছে তারাই।

যেতে-যেতে ঘরের বাইরে থেকে তাদের উচ্চকণ্ঠের আলাপ আর হো-হো হা-হা শুনে ঢোলগোবিন্দ বেশ বুঝতে পারছিল যে, বিজ্ঞান ব্যাপারটাকেই ভুয়ো জিনিস বলে উড়িয়ে দিতে পেরে, হাকিমেরা যে কত মূর্খ তা ওই অপোগণ্ড জামাইটা প্রমাণ করে দিয়েছে বলে ওরা সবাই মহা খুশি। কাল সারা শহরে ঢি-ঢি পড়ে যাবে। কিছু শিক্ষিত লোক বলবে, রেডিও হল ভূত নামানোর যন্ত্র। প্ল্যানচেটের সঙ্গে তফাত এই যে, এতে নিরক্ষরদেরও ডাকা চলে।

ঢোলগোবিন্দ আর তার দাদাকে মাসিমা না খাইয়ে ছাড়লেন না।

পড়ার ঘরে বসে ছায়াদি-কণাদির সঙ্গে অনেক গল্প হল। ঢোলগোবিন্দ এই প্রথম বুঝল, দূর থেকে কাউকে ঠিক জানা যায় না। ছায়াদি মানুষটা যে কী ভালো, কাছে এসে তবে সে অনুভব করতে পারল।

চলে আসার সময় গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিল ছায়াদি।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে ছায়াদি হঠাৎ ওর একটা হাত ধরে ফেলায় ঢোলগোবিন্দর সারা শরীরে যেন রক্ত নেচে উঠেছিল। ছায়াদি অনেক বড়ো। বার বার বলেও নিজেকে সেদিন কিছুতেই সে বোঝাতে পারে নি।

ছায়াদি টের পেয়েছিল নিশ্চয়।

গেটের কাছে এসে খুব আস্তে হাত ছেড়ে দিয়ে বলেছিল, 'তুমি অত লাজুক কেন? আবার এসো কিন্তু।'

সেদিন বোধহয় ছিল মা-র সঙ্কটার দিন।

সে সময়ে কোনো বাড়ির বউ রাস্তায় একা বেরত না। গিন্নিবান্নিরাও নয়।

বাড়িতে ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো আমি। মা যাবেন কালীবাড়িতে পুজো দিতে।

আমাকেই মা-র সঙ্গে যেতে হয়। মা-কে পৌঁছে দিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াই। কিছু করার না থাকলে উঠোনে একা-একা লাট্টু ঘোরাই।

ইস্কুলের মাঠে সদ্য নতুন একটা সারকাসের দল এসেছে। লোকজন লাগিয়ে বিশাল তাঁবু খাটানো হচ্ছে। বাইরে জন্তুজানোয়ারদের বড়ো-বড়ো খাঁচা।

ছোটো-ছোটো তাঁবুর বাইরের খেলোয়াড়রা খাটিয়ার ওপর বসে। রিং-মাসটার আর জোকারদের দেখলেই চেনা যায়। ঘুরে ঢোলগোবিন্দ সব দেখে। সিড়িঙ্গে চেহারার মেয়েরা কেউ-কেউ বিড়ি টানছে। দেখে ঢোলগোবিন্দর কষ্ট হয়। কিন্তু তার চেয়েও শক্ত হয় মুখ ঘুরিয়ে নিতে। তাকালেই ওদের শরীরের ঢেউগুলো ছেড়ে ওর চোখ নড়তে চায় না।

হঠাৎ চোখে পড়ে মাঠের একধারে বসে আছে হাবলুদা।

ঢোলগোবিন্দ পৌঁছুবার আগেই আরও কয়েকটা ছেলে এসে হাবলুদাকে ঘিরে ধরেছে। ব্যাস, শুরু হয়ে গেল কবিতা। আজকেরটা নজরুলের :

'বাবুদের তালপুকুরে/হাবুদের ডাল-কুকুরে/সে কি, ব্যাস, করলে তাড়া—'

হাবলুদা একেবারেই হাতমুখ না নেড়ে, শুধু গলার স্বরের ওঠাপড়ায় এমনভাবে নাটকীয়তা ফুটিয়ে তুলতেন যে, আমরা একবার তাঁকে পেলে আর ছাড়তাম না।

বলতে-বলতে একেক সময় হাবলুদার চোখদুটো স্থির হয়ে দাঁতে দাঁত লেগে যেত। তক্ষুনি শুইয়ে দিয়ে ভিড় সরিয়ে দেওয়া হত। বড়োরা এসে আমাদের ধমক দিত। আমরা হতাম অপ্রস্তুতের একশেষ।

এরপর সেদিন আর আমি দাঁড়াই নি। একছুটে চলে গিয়েছিলাম কালীবাড়ি। সন্ধেও তখন প্রায় হয়ে এসেছে।

গিয়ে দেখি কালীমন্দিরের সামনে কার বাড়ির একজন বউ আছাড়ি পিছাড়ি হয়ে কাঁদছে। আর বলছে, 'মা, তুমি এত নিষ্ঠুর। কত করে ডাকলাম, তবু আমার ভাইটাকে তুমি বাঁচালে না—'

তার কপালময় লেপটে গেছে সাঁথির সিঁদুর। হাতে শুধু লোহা আর শাঁখা।

আমার মা-ও কাঁদছে। কাঁদতে-কাঁদতে চেষ্টা করছে তাকে সান্ত্বনা দিতে।

সেদিন কালীবাড়ি থেকে ফিরতে আমাদের রাত হয়ে গিয়েছিল।

ফেরার পথে মা আমাকে বললেন, "কে জানিস? অনন্তহরি মিত্র-র দিদি। কাল রায় বেরিয়েছে ওর ফাঁসি হবে।"

নওগাঁ থেকে একদল ছোকরা কাঁথি গিয়েছিল নুন তৈরি করতে। পুলিশের মারে আধমরা হয়ে যখন তারা ফিরে এল, সারা শহরে প্রচণ্ড উত্তেজনা।

ঢোলগোবিন্দ শুনল, এবার আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় 'সর্বসাধারণের জন্য' বিভাগে সুন্দরমত যে ছোকরাটি ফার্স্ট হয়েছিল, সেই তপনদাকে স্ট্রেচারে করে স্টেশন থেকে সোজা বাড়িতে আনতে হয়েছে। পুলিশের কাঁটা-মারা বুটে তার সারা পিঠ নাকি ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

ওই বিভাগে সেও এবার নাম দিয়েছিল। বড়োদের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে ঢোলগোবিন্দ সেকেনড হওয়ায় সবাই ধন্য-ধন্য করেছে।

তপনদার একটা ছাপাখানা আছে। উকিলপাড়ায় থাকে। ঢোলগোবিন্দর মনে হল, ফার্স্টের পরেই সেকেন্ড—তখন এ শহরে সেই কনকদার সবচেয়ে কাছের লোক। ফার্স্টের যখন এমন একটা অবস্থা, তখন একবার গিয়ে দেখা করে আসাটা সেকেন্ডের কর্তব্যও বটে।

কিন্তু তপনদাদের বাড়ির গলির মুখটাতেই একদল ছোকরা ঢোলগোবিন্দকে আটকে দিল। ছেলেগুলোকে সে অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করায় তারা ওর গলার কলার ধরে সরিয়ে দিল। তার চেয়েও বড়ো কথা, ভিড়ের মধ্যে কে যেন চেঁচিয়ে বলছিল—অরে চেনস না, ওই যে আবগারি দারোগার পোলা—সরকারি চাকুর্যার ব্যাটা।

ঢোলগোবিন্দর কান গরম হয়ে উঠল। আর তারপরই অপমানে দুঃখে রাগে তার কান্না পেল। সে সরকারি চাকুরের ছেলে—এটাই তার একমাত্র পরিচয় হল?

এক মুহূর্তে ঢোলগোবিন্দর কাছে বিস্বাদ হয়ে গেল এই শহরটা। ভিড় থেকে ঠিকরে সরে যেতে-যেতে সে শুনল ফিসফিস করে একজন বলছে—সাবধান, টিকটিকি।

বাড়ি ফিরতে-ফিরতে ঢোলগোবিন্দর হঠাৎ মনে হ.ল আগের নওগাঁ আর নেই।

এতদিন সে দেখেছে, পাতার মধ্যে গুটিসুটি মেরে থেকে হঠাৎ একদিন শুঁয়োপোকা প্রজাপতি হয়ে গেছে। এখন দেখছে উলটো জিনিস। রঙচঙে ভারি সুন্দর একটা প্রজাপতি যেন ডিগবাজি খেয়ে কালোকুচ্ছিত শুঁয়োপোকা হয়ে যাচ্ছে।

এ শহরের বন্ধ দরজার তালা খুলে ঢোলগোবিন্দর মা একদিন তাদের বাড়ির বাইরে খোলা আকাশের নীচে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। বাবার জন্যে সে-দরজায় আবার নতুন করে তালা পড়ল।

বাইরেটা হঠাৎ পার হয়ে গিয়ে এক ধাক্কায় ঢোলগোবিন্দকে ঠেলে ঘরে ঢুকিয়ে দিল। অনেকদিন পর ঘরটাকে তার এমন একটা নিরাপদ আশ্রয় বলে মনে হল, যেখানে সে চেষ্টা করবে সেকেন্ড থেকে ফার্স্ট হতে।

তল্পিতল্পা গুটিয়ে আমরা চলে এসেছি গাঁজাগোলার কোয়ার্টারে।

হোক টিনের ছাদ। স্যাঁতসেঁতে পুরনো বাড়ি। গাঁজাগুদামের বিটকেল গন্ধ।

পাশেই এস-ডি-ওর বাঙলো। রায়সাহেব বদলি হয়ে চলে গেছেন। থাকলে ছায়াদিদের সঙ্গে রোজ দুবেলা দেখা হত। মাসিমা ভাঁড়ার খুলে কত কী খাওয়াতেন। ও'রা গেছেন রানাঘাটে। রান্না নয় রে, পেটুক! রানা।

সামনেটা একেবারে ফাঁকা। হেঁটে অনেকখানি গিয়ে তবে বড়ো রাস্তা। গাড়ি-ঘোড়া লোকজন ভিড়। বারান্দায়

বসলে দেখা যায়। কিন্তু হট্টগোল চিৎকার চেঁচামেচি কানে আসে না।

কোয়ার্টার বলতে একটাই।

বাঁ-পাশে গাঁজাগোলার প্রকান্ড গেট। গেটে সেপাই।

বড়ো রাস্তা ধরে বাঁহাতে একটু এগিয়ে গেলে দোকানপাট বাজার। কাছেই সোডাকল। ইস, মেজোকাকার সেই স্টেশনারি দোকানটা যদি থাকত। প্যাকিং বাক্সের ভেতরকার সেই সরু ফিতের মতো কুচি-কুচি কাগজ। খড়ে-মোড়া কাঁচের চিমনি। কাপ ডিশ।

ট্রেজারি কাছেই। রাত হলেই থেকে-থেকে তার ধারকাছ থেকে ভেসে আসে 'হুকামদার' আওয়াজ।

নইলে একেবারে চুপচাপ। হাওয়া থাকলে শুধু সারাক্ষণ ঝাউয়ের পাতার হাহাকার।

ভেতরের উঠোন পেরিয়ে খিড়কি। তারপরই নদীতে নেমে গেছে বাঁধানো ঘাট। সেখানে ছলাৎ-ছল ছলাৎ-ছল।

এ বাড়িতে আগে কারা থাকত জানি না। উঠোনে আম আর কাঁঠাল ছাড়া কোনো গাছ নেই। দেয়ালের কলি ফেরানো হয় নি কতদিন তার ঠিকঠিকানা নেই। মর্চে-পড়া টিনগুলো থেকে-থেকে দমকা হাওয়ায় কাতরে ওঠে।

পুরনো পাড়াটার জন্যে মন কেমন করে না তা নয়। কিন্তু অতদূর ঠেঙিয়ে কে যায়?

মন কেমন করে পুকুরটার জন্যে। যখন-তখন ছিপ নিয়ে বসে পড়া যেত। উঁচু পাড় থেকে ঝাঁপ দিয়ে জলে পড়তে কী যে মজা লাগত বলার নয়।

এ বাড়ি নির্জন নিস্তব্ধ। ঝাঁকড়া গাছের জ্বালায় আকাশ দেখার জো নেই। চারদিক ছায়ার চাদর মুড়ি দিয়ে ঝিমিয়ে থাকে।

যে হাতছিপগুলো আনা হয়েছিল, সেগুলো ঘরের কোণে যেমন তেমনি পড়ে রাছে। তাতে মাকড়সার জাল পড়েছে। উঠোনে কেঁচোগুলো অকেজো হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছিপ দিয়ে নদীতে মাছ ধরা যার তার কর্ম নয়।

বাড়ি প্রায় ফাঁকা। সেজোকাকা রামনগর ইস্কুলে কাজ পেয়েছে। হোস্টেল থেকে। মেজোকাকার কাছে থেকে ছোটোকাকা বঙ্গবাসীতে পড়ছে। এক আছেন ঠাকুরদা। সামনের মাঠে টুকুস-টুকুস করে বেড়ান।

দাদার খুব পড়ার চাপ।

চিত্তকাকা মাঝে রানাঘাটে গিয়েছিলেন। কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার মতন কোনো ব্যাপার। চিত্তকাকার মুখটা খবু করুণ দেখায়।

এ বাড়িতে আসবার কথায় মন যে কী নেচে উঠেছিল বলার নয়। নদীর ঠিক ধারে। সারবাঁধা কোয়ার্টার নয়। বাড়ি বলতে একটাই। ভেতরে বড়ো উঠোন। সামনেটা উদোম ফাঁকা। বড়ো-বড়ো ঘর। কত গাছগাছালি।

তখন কি ঢোলগোবিন্দ বুঝেছিল যে, লোকের মধ্যে থেকে-থেকে তার স্বভাবের বারোটা বেজে গেছে? প্রকৃতির ভাষা না শেখার ফলে এই ফাঁকার মধ্যে এসে সে এমন বোকা বনে যাবে?

গোড়ায় চেষ্টা করেছিল নদীর সঙ্গে ভাব করতে। যার কোনো বাঁধন নেই, একটু স্থির হয়ে দুদণ্ড ছায়া বুকে করে নেওয়ারও যার সময় নেই, নিজের ধান্ধায় শশব্যস্ত হয়ে যে কেবল ছুটছে—তার সঙ্গে হয়তো অনেকদিন ঘর করলে তবে ভাব হয়।

হঠাৎ একদিন জানা গেল, বাবা নাকি শিগগিরই কলকাতায় বদলি হচ্ছেন। বছর ঘুরবার দু-চার মাসের মধ্যেই।

আমরা চলে যাব তার আগে। আমরা বলতে ঠাকুরদা, দাদা, আমি আর লিলি। অ্যানুয়াল পরীক্ষা শেষ করে। যাতে নতুন সেশনের গোড়াতেই আমরা নতুন ইস্কুলে ভরতি হয়ে যেতে পারি।

মা মাথায় হাত দিয়ে সান্ত্বনা দিলেন—কাকিমার কাছে কয়েকটা মাস থাকবি। তারপরই তো আমরা এসে পড়ে সবাই একসঙ্গে ব্যারাকের বাড়িতে গিয়ে থাকব।

পয়লা খেল খতম

পশ্চিমবঙ্গের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা

চন্দনা মিত্র

'২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য'—কলকাতার রাজপথে ঝলমলে পোসটারের বুকে স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তথা জাতীয় নেতাদের এই প্রতিশ্রুতি বা শপথবাণী আমাদের অনেকের চোখে পড়েছে।

এই প্রতিশ্রুতির কথায় কিছু মানুষ 'সুস্থ শরীর ক্লান্তিবিহীন'-এর আশায় বুক বাঁধছেন। সংশয়ী অনেকে 'হাজারটা বিজ্ঞাপনের একটা' মনে করে অগ্রাহ্য করছেন। আর বাস্তব নিয়ে যাঁরা বেশ একটু চিন্তিত থাকেন, বা থাকতে বাধ্য হন, তাঁরা ভাবছেন : আজ আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি? আজকের অবস্থান থেকে আর মাত্র পনেরো বছর পরে ওই মহৎ লক্ষ্যে পোঁছনো কি যাবে? পোঁছতে যদি হয়ই, তাহলে কেমন তালে পা ফেলতে হবে?

জিজ্ঞাসু সামাজিক মানুষের এই প্রশ্নের উত্তরসন্ধান এই প্রবন্ধের উদ্দিষ্ট।

ভারতবর্ষ তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নতিশীল দেশ—যেমন প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ, তেমনি লোকবলে বলিষ্ঠ। আর তার অঙ্গরাজ্য যে পশ্চিমবঙ্গ, আয়তন যার ৮৭,৮৫৩ বর্গকিলোমিটার, আর ১৯৮১-র আদমসুমারি অনুসারে যার লোকসংখ্যা ৫,৪৫,৮০,৬৪৭, তার প্রতিও প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে কৃপণতা নেই। আসাম, বিহার, ওড়িষা—প্রতিবেশী এই তিনটি রাজ্যের বহু মানুষ নানা কাজের সূত্রে এখানে বসবাস করেন। এইসব কারণে পূর্বভারতে পশ্চিমবঙ্গ আর তার রাজধানী কলকাতার গুরুত্ব অপরিসীম।

চন্দনা মিত্র ১৯৭৫ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম. বি. বি. এস. পাস করেন। পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য-অধিকর্তার অধীনে চার বছর রানাঘাটের অনাথা ক্যাম্পে কাজ করার পর বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্লাড ব্যাঙ্কে মেডিক্যাল অফিসার পদে নিয়োজিত।
প্রথমে ড. বিজয়কুমার বসুর কাছে, পরে চীনে আকুপাংচার চিকিৎসায় শিক্ষালাভ করেন। এই উপলক্ষে চীনে বেশ দীর্ঘকাল অতিবাহিত করার ফলে ওই সমাজতান্ত্রিক দেশের গণস্বাস্থ্য-ব্যবস্থা বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণের সুযোগ গ্রহণ করেন। এই শিক্ষামূলক সফর শেষ করে তিনি একটি তথ্যপূর্ণ পুস্তকও রচনা করেছেন। এখন আকুপাংচার চিকিৎসা এবং শিক্ষাদানও করেন।
১৯৭৩ সাল থেকে কোটনিস স্মৃতিরক্ষা কমিটির সদস্য। নারীসমাজকে সচেতন এবং সংগঠিত করার আদর্শ নিয়ে কর্মরত, এবং নারীসমাজের মুখপত্র 'অহল্যা' সম্পাদনা করেন।
পশ্চিমবঙ্গ হেলথ সারভিস অ্যাসোসিয়েশনেরও একজন সক্রিয় কর্মী।

পূর্বভারতে উন্নত শহর বলতে যখন ছিল কেবল কলকাতা—যাবতীয় প্রগতি তথা সংস্কৃতির ধারক বাহক—তখন বঙ্গদেশের গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্য বলতে চোখের সামনে ভাসত ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, বসন্ত আর অন্যান্য যাবতীয় সংক্রামক রোগের আক্রমণে জর্জর চিররুগ্ণতা। সেই সময়ের ছবি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের লেখনীতে ফুটেছে এইভাবে : "গত পাঁচ বৎসর আমি পূর্ব ও পশ্চিম বাঙ্গালার নগরে নগরে, এমনকি গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়াছি এবং আমার দৃষ্টি কেবল এদিকেই রহিয়াছে—বাঙ্গালীর শোচনীয় শারীরিক অবস্থা ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব।" ,

এ হল পরাধীন ভারতের বাঙলার ছবি।

আটত্রিশ বছরের স্বাধীনতাপ্রাপ্ত উন্নতিশীল ভারতবর্ষের এই অঙ্গরাজ্যের এখনকার ছবিটি কেমন?

আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় জনস্বাস্থ্য, অর্থাৎ সাধারণ দেশবাসীর স্বাস্থ্য—ব্যক্তিবিশেষের বা গোষ্ঠীবিশেষের স্বাস্থ্য এক্ষেত্রে বিবেচ্য নয়।

জনস্বাস্থ্য একটি জাতির উন্নতির মানের পরিচায়ক, জাতির প্রাণশক্তির প্রতিফলন ঘটে তাতে ; সুস্থসবল দৃঢ়চিত্ত মানুষই দেশকে বিকাশের পথে নিয়ে যেতে পারে।

উন্নত জনস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন সুপরিকল্পিত সামগ্রিক আয়োজন। অভিজ্ঞ জনের অভিমতের আলোকে একটু দেখা যাক আদর্শ জনস্বাস্থ্যব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়।

আদর্শ জনস্বাস্থ্যব্যবস্থা

"রোগী ডাকতারের কাছে যাবেন না, ডাকতারই পৌঁছে যাবেন রোগীর কাছে"—এই একটি বাক্যেই জনস্বাস্থ্যব্যবস্থার মূলনীতিটি প্রতিফলিত। কথাটি বলেছিলেন ডাকতার নরম্যান বেথুন।

কথাটির তাৎপর্য এই যে, রোগী রোগাক্রান্ত হয়ে চিকিৎসকের কাছে যাবার আগেই জনস্বাস্থ্যব্যবস্থার বিস্তৃত জালে তার রোগ যেন ধরা পড়ে যায়, চিকিৎসা হয়, সুস্থতা আসে, এবং রোগটি যেন ছড়িয়ে পড়তে না পারে রোগীর নিজের দেহে অথবা প্রতিবেশীদের মধ্যে।

জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক সনদে সংঘের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি দেশের প্রতিটি নাগরিকের স্বাস্থ্যের অধিকার স্বীকৃত। এই সনদ অনুযায়ী, কোনো দেশের সমাজব্যবস্থা যাই হোক না কেন, এই অধিকারটি তাকে কার্যকর করতেই হবে।

এই কার্যকর করার তিনটি দিক আছে—তিনটিই সমভাবে গুরুত্ববহ :

এক—প্রয়োজন পড়লেই সুচিকিৎসা পাওয়ার মতো বিস্তৃত এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থা ;

দুই—যত্রতত্র এবং ঘন-ঘন যাতে রোগাক্রান্ত না হতে হয়, তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশসৃষ্টি এবং প্রতিরোধব্যবস্থা ;

তিন—এই-সমস্ত ব্যবস্থাকে ব্যবহার করার মতো জনসচেতনতা।

সমস্ত নাগরিকের নাগালের মধ্যে চিকিৎসার সুযোগ পৌঁছে দিতে হলে সারা দেশে প্রচুর সংখ্যায় চিকিৎসাকেন্দ্র গড়ে তোলা দরকার—নির্দিষ্টজনসংখ্যা-পিছু বিশেষ চিকিৎসাবিদ্যার জন্য উন্নতব্যবস্থাযুক্ত হাসপাতাল প্রয়োজন। ,

একটু বুঝিয়ে বলা যাক। যে কৃষক মাঠে চাষ করছে, খনিতে কয়লা কাটছে যে শ্রমিক, গহন বনে কাঠ কাটছে যে কাঠুরিয়া, বা সমুদ্রপারে মাছ ধরছে যে জেলে—হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল। তার চিকিৎসা, শুশ্রূষা কোথায় হবে? পঞ্চাশ-একশ মাইল দূরের হাসপাতালে যদি তাকে বয়ে আনতে হয় বা আদৌ আনা যায়, ততক্ষণে রোগীর অবস্থা হয়তো আরো খারাপ হয়ে পড়বে। সেই কারণে, শুধু শহরেই বড়ো-বড়ো হাসপাতাল বানিয়ে রাখা নয়, ব্যাপক গ্রামাঞ্চল আর শিল্পাঞ্চল জুড়ে সুষ্ঠুব্যবস্থাসম্পন্ন অসংখ্য চিকিৎসাকেন্দ্র থাকা দরকার। এতে লোকের হয়রানি হয় না, রোগ দ্রুত ধরা পড়ে, সুষ্ঠু চিকিৎসা হয়, মহামারী আটকানো যায়, অন্যান্য বহু ধরনের রোগেরও প্রতিরোধ করা যায়।

ধরা যাক কোনো প্রত্যন্ত গ্রামের চিকিৎসাকেন্দ্র। হয়তো সেখানে লোকসংখ্যা কম, তাই বারো মাস একই রকম রোগীর চাপ থাকে না। কিন্তু তাতে এই ক্লিনিকের গুরুত্ব কমে যায় না। প্রয়োজনমত চিকিৎসা ছাড়াও সেখানে স্থানীয় অধিবাসীদের নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষা, বিশেষ-বিশেষ রোগের (টিবি, যৌনব্যাধি, কুষ্ঠ, অপুষ্টি, রক্তচাপ, এমনকি ক্যানসার) জন্য অনুসন্ধানমূলক পরীক্ষা হতে পারে।

দুটি প্রাসঙ্গিক উদাহরণ দেওয়া যাক। দারজিলিঙ জেলার কোনো ব্লকের একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র। বারো মাস দিবারাত্র সেটি বন্ধ থাকে। দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন মাত্র নারস কাছেই বাসাবাড়িতে থাকেন। কিন্তু কেন্দ্রটি কখনও খোলা দেখা যায় না।

তাহলে কি ওই অঞ্চলের মানুষের অসুখই হয় না? পাহাড়ি অঞ্চলের লোকের স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভালো, কিন্তু তা বলে অসুখই হয় না এমন নয়। অসুখ হলে আজও তারা সেই প্রাচীন কালের মতোই টোটকা, ওঝা, ঠাকুরদেবতা করেই চলেছে। এই-সমস্ত অঞ্চলে আধুনিক চিকিৎসার সুফল যদি সাধারণ মানুষের কাজেই না লাগল, তাহলে তার ধ্বজাটিকে খাড়া করে রেখে কী লাভ?

আর একটি দৃশ্য। চীনের পাহাড়ি অঞ্চল তাচাইয়ের একটি গ্রামীণ হাসপাতাল। দুপুর দুটোর সময় সেখানকার সমস্ত আউটডোর এবং এমারজেনসি বিভাগ খোলা। প্রতিটি বিভাগে চিকিৎসক, নারস উপস্থিত। বহির্বিভাগ প্রায় ফাঁকা। অধ্যক্ষ জানালেন, স্থানীয় মানুষ যাতে কাজের শেষে সন্ধ্যার পর পর্যন্ত যে-কোনো সময়ে এসে দেখাতে পারে, তার জন্য বহির্বিভাগ সারাক্ষণ খোলা থাকে। চিকিৎসকেরা হাসপাতাল-চত্বরেই থাকেন, এবং পালা করে ডিউটি দেন।

ওই কাউনটি বা জেলারই একটি সু-উচ্চ গ্রামের সাজানো-গোছানো ডিসপেনসারিতে একলা বসে ছিলেন একজন বেয়ারফুট চিকিৎসক। কোনো রোগী নেই। তাঁর সহকর্মীর দল গেছেন বাড়ি-বাড়ি স্বাস্থ্যপরিদর্শনে। তাঁদের কাজ—স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া, পরামর্শ দেওয়া, প্রয়োজন হলে বাড়িতে বা কর্মস্থলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

চিকিৎসাকেন্দ্রে বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাতে প্রতিটি রোগীকে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে দেখা যায়, চিকিৎসা করা যায়, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মনীতি রোগীদের কাছে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করে বলা যায়, এবং বিভিন্ন রোগের তুলনামূলক গবেষণা করা যায়, তার জন্য প্রতিটি কেন্দ্রেই উপযুক্ত সংখ্যায় চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মী থাকা দরকার। সেবাযত্ন ত্রুটিহীন হওয়ার জন্যও পর্যাপ্ত সংখ্যায় নারস আর আয়া থাকা প্রয়োজন। চিকিৎসক এবং নারস যেমন একটি দিক, ওষুধপত্র, রোগপরীক্ষার যন্ত্রপাতি, শয্যা ইত্যাদি আরেকটি দিক। প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র—তা সে বড়ো হাসপাতালই হোক আর সুদূর গ্রামের ছোট্ট ডিসপেনসারিই হোক—এইসব বিষয়ে যদি স্বয়ংভর হয়ে উঠতে নাও পারে, যাতে সম্পূর্ণ থাকে, অর্থাৎ কোনোভাবেই যাতে উপকরণাদির ঘাটতি না হয়, সেটা নিশ্চিত করা দরকার। নয়তো রোগী, চিকিৎসক, আর নারসদের হয়রানিই সার হবে, কেন্দ্রটি কোনো কাজেই আসবে না। এর জন্য শুধু এক ধরনের চিকিৎসাব্যবস্থার ওপর নির্ভর না করে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থার সমন্বয় করা উচিত। বিশেষত, স্থানীয় গাছপালা, খনিজ যাতে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা যায় তার জন্য ক্রমাগত গবেষণার প্রয়োজন।

কিন্তু চিকিৎসাই জনস্বাস্থ্যব্যবস্থার একমাত্র কথা নয়

ব্রকিংটন তাঁর 'ওয়ার্ল্ড হেলথ' বইতে বলেছেন, "জাতীয় স্বাস্থ্য পরিকল্পনায় রোগচিকিৎসা এবং রোগপ্রতিরোধের মধ্যে অবশ্যই একটা সামঞ্জস্য থাকতে হবে। এর ফলে স্বাস্থ্যব্যবস্থার একটি বুনিয়াদি কাঠামো গড়ে উঠবে, এবং হাসপাতালে ভরতি রোগী আর বাড়িতে অসুস্থ রোগীর যত্নের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য গড়ে তুলবে।

"এই বুনিয়াদি কাঠামো বহু জনস্বাস্থ্যসমস্যাকে একেবারে গোড়াতে ধরেই সমাধান করতে পারে, এবং পরিকল্পনার ক্ষেত্রে হাসপাতালের থেকে তাকেই বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

"তৃতীয় বিশ্বের গরিব দেশগুলোতে হাসপাতাল তৈরির ঝোঁক বিশেষভাবে দেখা যায়। কিন্তু যে কৃমির আক্রমণ লক্ষ-লক্ষ লোককে দুর্বল করে রাখছে, হাসপাতাল কি তা হটিয়ে দিতে পারবে? হাসপাতাল পারে না শিশুর জীবনের বিভীষিকা কোয়াশিওরকর আটকাতে ; এমনকি সূর্যস্নাত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে রিকেট প্রতিরোধ করতেও হাসপাতাল অপারগ।"

জনস্বাস্থ্যব্যবস্থার প্রধান দিক হল রোগপ্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্যসচেতনতাবৃদ্ধি।

সাধারণত মানুষের মধ্যে যেসব রোগ বেশি দেখা যায় তার পঞ্চাশ ভাগই পূর্বপ্রতিরোধের দ্বারা নির্মূল করা যায়। এই প্রতিরোধের মধ্যে পড়ে :

এক : দূষিত জলের পরিবর্তে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ ; **দুই** : মানুষের বর্জ্যপদার্থ এবং অন্যান্য আবর্জনা যত্রতত্র না ছড়িয়ে ফেলে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে নষ্ট করা, এবং তারপর সেগুলো অন্যান্য কাজে লাগানো ; কিছুতেই যেন সেগুলো মানুষের বাসস্থান, যাতায়াতের রাস্তা, বিদ্যালয়, কারখানা ইত্যাদির আশপাশে জমা না হতে পারে ; **তিন** : খাদ্যদ্রব্য সরবরাহে পরিচ্ছন্নতা রক্ষা ; **চার** : মানুষের এবং পালিত পশুপাখিরও বসতি আর কর্মস্থলে যথেষ্ট আলোবাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করা ; পারক, গাছপালা, খেলাধূলা আর ব্যায়ামের উপযুক্ত স্থান গড়ে তোলা ; কলকারখানার দ্বারা পরিবেশদূষণ যাতে না হতে পারে, সেদিকে নজর দেওয়া ; **পাঁচ** : অতিরিক্ত ঘিনজি জনবসতি যাতে গড়ে উঠতে না পারে, সেদিকে খেয়াল রাখা।

গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্যকেন্দ্র আর শহরের হাসপাতালকে কেন্দ্র করে রোগপ্রতিরোধের জন্য ভ্রাম্যমাণ দল এই কাজগুলির তত্ত্বাবধান করবে। আকস্মিক কোনো রোগের প্রাদুর্ভাব হলে তার নির্ণয়, রোগের সংক্রামকতার উৎস এবং প্রসারণ সম্পর্কে সমীক্ষা, রোগনিরাময়ের উপায় সম্বন্ধে ব্যাপক প্রচার, এবং বাড়ি-বাড়ি ঘুরে চিকিৎসা করার কাজও এই ভ্রাম্যমাণ টীমের আওতায় পড়বে।

ভ্রাম্যমাণ দলের কাজের একটি বড়ো লক্ষ্য হবে রোগপ্রতিরোধ আর রোগনিরাময়ের এই কাজকর্মের সঙ্গে সাধারণ মানুষের ব্যাপক অংশকে যুক্ত করা। ব্রকিটন বলছেন, "স্বাস্থ্য কখনোই জনসাধারণের ওপর চাপানো যায় না, যৌথভাবে কাজ করতে-করতে তারা এটি অর্জন করে। যেমন, এর দ্বারা (১) জনসাধারণের নিজস্ব উদ্যোগ বৃদ্ধি পায়, (২) জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রসার আর উপলব্ধি গড়ে তোলার পক্ষে এটি একটি উৎকৃষ্ট উপায়, (৩) স্বাস্থ্যবিভাগের কর্মীদের মধ্যেও জনসাধারণ সম্পর্কে সহানুভূতি আর বোঝাপড়ার ভাব জাগিয়ে তোলে।" (ওয়ার্ল্ড হেলথ)

স্বাস্থ্যসচেতনতাকে বলতে হয় জনস্বাস্থ্যব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তর। মূলত এটির উপর নির্ভর করেই আদর্শ ব্যবস্থার বিকাশ হয়। ইনডিয়ান কাউন্সিল অব ট্রেডিক্যাল রিসার্চ-এর অধ্যক্ষ ড. রামলিঙ্গস্বামীর মতে, "সম্ভবত সমগ্র স্বাস্থ্যক্ষেত্রে, জনসাধারণের মধ্যে দ্রুত রোগ চিনতে পারা, তার প্রতিরোধ করা এবং স্বাস্থ্যের উন্নতির বিষয়ে একটি চিন্তা এবং তার সুষ্ঠু প্রয়োগধারা গড়ে তোলার পক্ষে একটি মাধ্যম হিসাবে স্বাস্থ্যশিক্ষার আগে আর-কিছুরই স্থান হয় না।" (সোশ্যাল চেনজ, ১৯৮৪, পৃ ৩০৩)

এর বাইরে আর-একটি কথাই বলা যায়। তা হল : স্বাস্থ্যসচেতন মানুষ ব্যবস্থার ত্রুটি দেখলে তার প্রতিকারের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানাতে পারেন, অন্যদিকে অ-সচেতন মানুষ সেইসব গাফিলতি মুখ বুজে সহ্য করেন, আর নিজেদের মৃত্যুমুখে ঠেলে দেন।

অবাস্তব কল্পনা নয়

রোগপ্রতিরোধ আর স্বাস্থ্যসচেতনতা সম্পর্কে এইসব ভাবনা যে বাস্তবে রূপ পেতে পারে, এবং ফলপ্রসূ হতে পারে, সে কথা বোঝার জন্য পৃথিবীর ভিন্নতর সমাজব্যবস্থার দুটি দেশের উদাহরণ মনে হয় প্রাসঙ্গিক হবে।

ইউরোপে আধুনিক সভ্যতার অগ্রদূত ব্রিটেনের জাতীয় স্বাস্থ্য প্রকল্প গড়ে ওঠে ১৯৪৮ সালে। কিন্তু তারও অনেক আগে, ব্রকিংটনের 'ওয়ার্ল্ড হেলথ' বইয়ের সূত্রে জানা যায়, গত শতাব্দীতে, ব্রিটেনের স্বাস্থ্যব্যবস্থা যখন বর্তমানের অনুন্নত দেশগুলোর থেকে একটু ভালো ছিল, তখনও সেখানে হাসপাতাল তৈরি হত না। (কিছু-কিছু দানধ্যানের দরুন অবশ্য হত।) চাদউইকের কঠোর শাসনে সেখানে তখন পয়ঃপ্রণালী তৈরি হত, এবং জনস্বাস্থ্যবিভাগ গঠন করা হত। অর্থাৎ, স্বাস্থ্য-চিকিৎসা-বিভাগ জোর দিত পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা এবং রোগ-প্রতিরোধের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যকে শক্তিশালী করার দিকে।

মুক্তির ঠিক আগে (১৯৪৯ সাল) চীনের স্বাস্থ্য-চিত্র ভারতবর্ষের থেকেও খারাপ ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু মুক্তির পরেই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হল—যদিও তখনও সেদেশের অর্থনীতি যুদ্ধকালীন বিপর্যস্ত অবস্থা মোটেই কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

১৯৫২ সালে গড়ে উঠল 'দেশপ্রেমিক স্বাস্থ্যগঠন ভাবধারা'। পুরোনো নানা বদ অভ্যাস ত্যাগ করে নতুন অভ্যাস গড়ে তোলার চেষ্টা শুরু হল যাতে স্বাস্থ্যগঠন একটি সম্মানিত অভ্যাস, এবং সেটা না করাই নিন্দনীয়—এই ধারণা সকলের মধ্যে গড়ে ওঠে। জাতীয় স্তরে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কমিটি গড়ে ওঠে। জেলা, মহকুমা থেকে শুরু করে একেবারে নীচু স্তরে—প্রোডাকশন ব্রিগেডে, অফিস-কাছারিতে, প্রতিবেশী (পাড়া) কমিটিতে—শাখা-কমিটি গড়ে ওঠে। 'প্রতিরোধ প্রথম'—এই স্লোগান নিয়ে চারটি পোকা (মাছি, মশা, ছারপোকা, ইঁদুর) ধ্বংস করা, পানীয় জল আর বর্জ্যপদার্থকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা, এবং পাঁচটি পরিবর্তনকে (কুয়ো, পায়খানা, জীবজন্তুর বাসস্থান, উনুন এবং সাধারণ পরিবেশ) কার্যকর করা শুরু হয়। এইভাবে 'স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া' ক্রমশ একটি অভ্যাসে পরিণত হতে থাকে। প্রতিটি চীনা জল ফুটিয়ে খাওয়া, রাস্তায় থুথু বা ময়লা না ফেলা, টয়লেট ব্যবহার করার অভ্যাস আয়ত্ত করল। (স্পোর্টস অ্যানড পাবলিক হেলথ, চায়না হ্যানডবুক সিরিজ)

জনস্বাস্থ্য—পশ্চিমবঙ্গে

ভারতবর্ষ স্বাধীন হল ১৯৪৭ সালে।

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে কিছু জোর উদ্যোগে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর দমন করা হয়েছিল। মশা-মাছি দূর করার জন্য ডি ডি টি স্প্রে ; ডিপথিরিয়া, টিটেনাস, কলেরা, টাইফয়েড, বসন্ত নির্মূল করার জন্য প্রতিষেধক টীকা চালু হয়েছিল। স্মলপকস (বসন্ত) আর হয় না, অন্যান্য রোগের প্রকোপ কিছুটা কমেছে, কিন্তু রোগ নির্মূল হয় নি।

ম্যালেরিয়া আবার ফিরে এসেছে ভয়াবহভাবে, অপ্রতিহতরূপে। পূর্বের প্রতিষেধকে আর কাজ হচ্ছে না। এখন পশ্চিমবঙ্গের প্রতি ঘরে অন্তত একটি করে ম্যালেরিয়া রোগী পাওয়া যাবে। সরকারি সংবাদসূত্র অনুযায়ী, ১৯৮৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে ম্যালেরিয়া-রোগীর সংখ্যা ছিল ৭৭,৮৬৪ জন, আক্রমণে বিপর্যস্ত স্বাস্থ্য-মন্ত্রক ম্যালেরিয়ার চিকিৎসাকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য রেডিয়ো, পোসটকার্ড ইত্যাদির মাধ্যমে জোর প্রচার চালাচ্ছেন।

যে দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে

কিন্তু সংক্রামক রোগ নির্মূল করে, অভ্যাসগুলো পালটে স্বাস্থ্যকে যাতে উন্নত করা যায়, এর জন্য যে আমূল নিষ্ঠাশীল ব্যবস্থা আমরা মুক্তির পরের চীনে প্রত্যক্ষ করি, সে ধরনের কোনো মানসিকতা পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতে কাজ করে নি, করে না। যে মানসিকতা সদাবাধীন দেশেও কাজ করেছে, আর আজও করে চলেছে, তা হলে দোরগোড়ায়-এসে-দাঁড়ানো ভয়াবহ সমস্যাকে নীতিহীন গোঁজামিল দিয়ে কোনোমতে সামলানো। নেতা থেকে শুরু করে এই ভাবধারা ক্রমশ ব্যাপক দেশবাসীর মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে। সকলেই প্রচণ্ড আত্মকেন্দ্রিক, এবং অদূরদর্শীও বটে। নিজের সাময়িক স্বার্থ সাধনের জন্য অন্য সকলের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে কেউ দ্বিধা করে না। জনস্বার্থের বোধটিই সম্ভবত হারিয়ে গেছে এদেশের জনমানস থেকে। আজ তা এতই নীচে নেমে গেছে যে কোনো ব্যক্তি, কোনো সংস্থা, এমনকি সরকারেরও প্রচার প্রায় নিষ্ফল প্রতিপন্ন হয়।

মূল যে বিষয়গুলোর ওপর জনস্বাস্থ্য নির্ভর করে, এক-এক করে পশ্চিমবঙ্গে সেগুলির অবস্থা পর্যালোচনা করলে বাস্তব চিত্রটি স্পষ্ট হবে, কর্তব্যনির্ধারণও সম্ভব হবে।

এই রাজ্যে সমস্ত মানুষের চিকিৎসার জন্য, ১৯৮১ সালের হিসাব অনুযায়ী, হাসপাতালের সংখ্যা ৩৯৮, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আর গ্রামীণ হাসপাতাল ৩২১, উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র ৭৪২—মোট ১,০৬৩। ক্লিনিক আছে ১৫৮টি ; যেখান থেকে ওষুধ দেওয়া হয় (স্বাস্থ্যকর্মী অর্থাৎ হেলথ অ্যাসিসটানট বা মালটিপারপাস হেলথ-ওয়ারকাররা ওষুধ দেন), এমন ডিসপেনসারি আছে ৪১৮টি। এইসব মিলে দাঁড়ায় ২,৮৩৭। (সূত্র : হেলথ অন দ্য মারচ, ১৯৮১)।

জনসংখ্যার হিসাবে ধরলে, ১৯৮১-র জনগণনা অনুযায়ী ৫১,৩৪৭ জন মানুষ-পিছু একটি করে সরকারি চিকিৎসালয়। একটি হাসপাতাল আর একটি ডিসপেন-

সারি একই ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং, যথাসময়ে উপযুক্ত এবং পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা পাবার সৌভাগ্য, বলাই বাহুল্য, সকল মানুষের হয় না। তবে, এই-সমস্ত চিকিৎসাকেন্দ্রে বেশির ভাগ মানুষ বিনামূল্যেই চিকিৎসা পান। হাসপাতালগুলিতে কিছু পেয়িং বেড আর কেবিন আছে।

বিনামূল্যে চিকিৎসাটা কেমন হয় একটু দেখা যেতে পারে। শহরের বড়ো সাধারণ হাসপাতালে প্রায় প্রতিটি বিভাগেই বহির্বিভাগ বা আউটডোর থাকে। ইনডোর বা অন্তর্বিভাগও থাকে। হাসপাতালের আউটডোর সাধারণ রোগীর, তবে বড়ো-বড়ো বিশিষ্ট চিকিৎসক এখানে যুক্ত থাকেন বলে তাঁদের কাছে রোগপরীক্ষার জন্য ভিড় হবেই। এ'রা দু-ধরনের রোগী দেখে থাকেন। প্রথম গুরুত্বপূর্ণ হল 'ক্যাচ পেশেনট'—আগে যাঁরা তাঁদের অন্তত একবারও প্রাইভেট ক্লিনিকে দেখিয়েছেন তাঁরা। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়েন তাঁরা, জুনিয়র ডাকতাররা যাঁদের দেখে অবস্থা সংকটাপন্ন বলে মনে করেন।

প্রথম শ্রেণীদের দেখতেই মূল্যবান বেলাটুকু প্রায় কেটে যায়। বাকি রোগীরা—শহরের কাছাকাছি জায়গা থেকে যাঁরা আসেন—সারা দিনটা হাতে নিয়েই আসেন—আউটডোরে লাইন দিয়ে বসে থাকেন সারা সকল। ফেরিওয়ালার থেকে বাসি পাঁউরুটি, বিসকুট, তেলেভাজা কিনে খান। তারপর দুপুরবেলা আউটডোর ডিসপেনসারি থেকে কিছু ট্যাবলেট আর মিকসচার নিয়ে বাড়ি ফেরেন। দুদিনের ওষুধ। এ'দের প্রাইভেট ডাকতার দেখানোর ক্ষমতা নেই, বাজার থেকে ওষুধ কেনার সামর্থ্য নেই।

গ্রামীণ হাসপাতালে দীর্ঘ দিন ওষুধ না পেয়ে বা ওই ওষুধে কাজ না হওয়াতে মেহনতি চাষি কাজ কামাই করে কত সময় চলে আসেন কলকাতা, বর্ধমান ইত্যাদি শহরের বড়ো হাসপাতালে। সারা দিন লাইন দিয়ে কুড়ি পয়সার দুটি ট্যাবলেট নিয়ে বাড়ি ফেরেন টিকিট করে ট্রেনে চেপে। হাসপাতালে অবশ্য রক্ত-প্রস্রাব পরীক্ষা হয়। সেখানেও এক লাইন দেওয়ার দুর্ভোগ, আর সেখান থেকে যে রিপোর্ট বেরোয় ডাকতারবাবুই তাতে আস্থা রাখতে পারেন না।

সকাল ৯-৩০ থেকে ১২টার মধ্যে ২০০-২৫০ জন রোগী দেখতে হলে দু-তিন জনের পক্ষে একটি রোগীর পিছনে দু-তিন মিনিটও দেওয়া যায় না। পুরনো টিকিটের টেবিলে বহু সময়ই Rpt all (রিপীট অল) লিখে চলে আসতে হয়।

গ্রামাঞ্চলেও একই অবস্থা। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে থাকেন দুজন ডাকতার। দুজনেই উপস্থিত থাকলেও ভিড় সামলাতে হিমশিম অবস্থা। আর একজন ছুটি নিলে কী হতে পারে, সহজেই অনুমান করা যায়। উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে একজনই ডাকতার। তিনি ছুটি নিলে, অসুখ-বিসুখে পড়লে, বা নিজের কাজের প্রয়োজনে কামাই করলে আউটডোর বন্ধ হয়ে যায়।

শহর-মফসসলের হাসপাতালে এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ইনডোরও আছে। ১৯৮১-র সরকারি হিসাব অনুসারে, শহর গ্রাম মিলিয়ে মোট শয্যাসংখ্যা ৫৮,৪৪৮।

গ্রামাঞ্চলে আলোবাতাসের অভাব নেই—অভাব আছে ওষুধ আর ডাকতার-নারসের। আর শহরের হাসপাতালে রোগী একটি রোগ নিয়ে এসে, তার থেকে সেরে অথবা না-সেরে, আরেকটি ইনফেকশন নিয়ে বাড়ি ফেরে। নরকের আর-এক নাম বোধহয় হাসপাতাল। কি পরিবেশ, কি ব্যবহার, কি পূর্ণ চিকিৎসা-যত্ন—বিনামূল্যের চিকিৎসাব্যবস্থায় এই তিনটি অগ্নিমূল্য। দুর্লভ।

ওষুধপত্র

যে অনুপাতে আউটডোরে রোগী আসে বা ভরতি হয়, সেই অনুপাতে ওষুধ কোনো চিকিৎসাকেন্দ্রে কোনো সময়েই থাকে না। এটা আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য।

এক্ষেত্রেও শহর-গ্রামে তফাত আছে। গ্রামের হাসপাতালে বছরে চার বার ওষুধ আসে। প্রতিবারের ওষুধের যে পরিমাণ, তাতে দেড় মাস ভালোভাবে চলতে পারে। এর পরে সাধারণ ওষুধ সালফাডায়াজিন, সালফাগোয়ানাইডিন, এনটারোকুইনল, প্যারাসিটামল (জ্বর, সর্দিকাশি, পেটখারাপের ওষুধ)-এ টান পড়ে। ডোজ কমিয়ে দিতে হয়। মুর্শিদাবাদ, রানাঘাট, বর্ধমান—সর্বত্র প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এই একই রিপোর্ট। রানাঘাটের একটি সরকারি আউটডোরে এই-ই মোট ওষুধ। যেখানে প্রতিদিন গড়ে ১০০ জন রোগী হয় সেখানে তিন মাসে ১০০ টেট্রাসাইক্লিন ক্যাপসুল দেওয়া হল। গুনে-গুনে মাত্র বিশেষ-বিশেষ রোগীকে দিয়েও কুলকিনারা করা যায় না। সেখানে মোট যা রোগী আসে, পূর্ণমাত্রায় কাউকে দিতে গেলে ১৫ দিন থেকে তিন সপ্তাহ চলবে। মিকসচারে সব কটি উপাদানের বদলে বড়ো জোর দুটি উপাদান থাকে। লালরঙ হলেই হল। ডোজ কমিয়ে দেওয়া হয় সান্ত্বনা পুরস্কারের মতো। ডাকতার-কমপাউনডার-হেলথ অ্যাসিসট্যানট নিশ্চিত জানেন যে, এতে রোগটি ধামাচাপা পড়বে, সারবে না ; উপরন্তু, শরীরে স্থিত রোগজীবাণুদের প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

শহরের বড়ো-বড়ো হাসপাতালগুলোতেও যে-কোনো সময় অতিপ্রয়োজনীয় জীবনদায়ী ওষুধেরও সরবরাহ থাকে না।

ওষুধের মান সাধারণত নীচু। কখনো-কখনো ভালো কোমপানির ওষুধ পাওয়া যায়—সেটা ভাগ্যের ব্যাপার। এই ব্যাপারটা কর্তৃপক্ষ জানেন। বোঝা যায়, বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ খুবই কম, নয়তো অন্য কোনো ব্যাপার আছে।

রোগী-ভরতির ক্ষেত্রে চেনাশোনা থাকলে তবে সুযোগ পাওয়া যায়। নতুবা মুমূর্ষু রোগীকেও এ-হাসপাতাল থেকে ও-হাসপাতালে নিয়ে ছোটাছুটি করতে হয়। ইনডোর উপচে পড়ে রোগীতে, মেঝেতে বিছানা করেও কুলোনো যায় না। ডাকতাররা লিখে দেন—রিগ্রেট, নো বেড ভেক্যানট। গ্রাম-থেকে-আসা মুমূর্ষু রোগী হাসপাতালের চত্বরে চাদর পেতে শুয়ে থাকে 'বেড'-এর আশায়।

চিকিৎসক, নারস, চিকিৎসাকেন্দ্র

১৯৮১-র সরকারি গণনা অনুযায়ী, এই হিসেব পাওয়া যাচ্ছে :

অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক ২৩,৩০৫, দাঁতের ডাকতার (ডেনটিসট) ৬৮৫, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ১৪,০০৪, আয়ুর্বেদিক ১,৭২৩, সাধারণ নারস ৮,৭৫৫, পাবলিক হেলথ নারস ১৬৮, অকজিলিয়ারি নারস আর মিডওয়াইফ ৮৫৯৭ (হেলথ অন দ্য মারচ, ১৯৮১)। লোকসংখ্যা অনুযায়ী, প্রতি ২,৪২৮ জনে একজন ডাকতার, প্রতি ৩,১৪৫ জনে একজন নারস। (আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক আছেন খুব কম জায়গায়ই। আর সব হোমিও-চিকিৎসকের যথাযথ যোগ্যতা নেই।)

শহরে আর গ্রামে এই অনুপাতের তফাত আছে। পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার পাঁচভাগের একভাগ লোক বাস করে কলকাতা আর তার আশপাশে। কিন্তু জনস্বাস্থ্যব্যবস্থার সবটুকু নির্যাস ঢেলে দেওয়া হয়েছে এই কলকাতায়। এখানে একাধিক সরকারি হাসপাতাল ছাড়াও আছে বহু ক্লিনিক, ডিসপেনসারি, প্রাইভেট হাসপাতাল, নারসিং হোম আর প্রাইভেট ক্লিনিক। মফসসল শহরগুলোতে একটি করে সরকারি হাসপাতাল ছাড়া আছে কিছু প্রাইভেট নারসিং হোম আর ক্লিনিক। তবে সেসব মানুষের প্রয়োজনে নয়, মূলত ব্যবসায়িক তাগিদে গড়ে উঠেছে।

জনসংখ্যার যে বাকি চারভাগ বাস করে গ্রামাঞ্চলে, সেখানে এক লক্ষ লোকের জন্য আছে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, দুটি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র।

এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো, প্রথমত, না কর্তৃত্বে, না ব্যবস্থাপনায়—কোনো দিক থেকেই প্রাথমিক স্তরেও পূর্ণ চিকিৎসার উপযুক্ত নয়। দ্বিতীয়ত, গ্রামাঞ্চলের জনবসতি শহরের মতো ঘন নয়, আর রাস্তাঘাট বেশির ভাগই অত্যন্ত খারাপ। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অ্যামবুলেনস যদিও-বা থাকে, তাও হয় যান্ত্রিক গোলমালে খারাপ, নয় তেলের অভাবে অচল। দূরের রোগীর পক্ষে তাই সাইকেল ভ্যান আর গোরুর গাড়িই ভরসা। তবে বর্ষাকালে অধিকাংশ রাস্তাই মানুষের যাতায়াতের মতো থাকে না। ফলে চিকিৎসাকেন্দ্রের সুযোগসুবিধাও শহর থেকে অনেক কম, অনেক কষ্টে সেসব পেতে হয়।

কলকাতা আর অন্যান্য মফসসল শহরে যে প্রাইভেট চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে, সরকারি আয়োজনের নিকৃষ্টতা আর অপ্রতুলতার জন্যই তাদের চাহিদা আর মুনাফার পরিমাণ দিন-দিন বাড়ছে। ডাকতাররাও বেশির ভাগই সরকারি আওতার বাইরে। নিজেদের স্বাধীনতা আর উচ্চাশা বজায় রেখে তাঁরা প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে যান। নারসিং হোম আর প্রাইভেট প্র্যাকটিস আজ এক লাভজনক ব্যাবসা যার উপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণই নেই। নারসরাও অনেকে প্রাইভেট সংস্থায় যুক্ত থাকেন।

অথচ এই উন্নতিকামী দেশে জনস্বাস্থ্যব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য যথেষ্ট লোকবলের প্রয়ো-

জন ছিল। উপযুক্ত পরিবেশ, উপযুক্ত ব্যবস্থা সৃষ্টি করে সমস্ত চিকিৎসক আর নার্সকে কাজে লাগানো যেত।

এই প্রসঙ্গে আমরা আরো একবার ব্রিটেন আর চীনের ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারি।

ব্রিটেন

ব্রিটেনে স্বাস্থ্য-চিকিৎসাব্যবস্থা জাতীয়করণ। ডাকতাররা হাসপাতালে যুক্ত হতেও পারেন, আবার তা না হয়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিসও করতে পারেন। কিন্তু ওদেশের প্রাইভেট প্র্যাকটিশনাররা এদেশের মতো রোগীদের হাতে মাথা কাটেন না। প্রাইভেট প্র্যাকটিস মানে নিজের ইচ্ছা-মতো চিকিৎসা করা। ডাকতার যে এলাকায় প্র্যাকটিস করেন সেখানকার শতকরা ৯৮ ভাগ লোক তাঁর কাছে নাম রেজিস্ট্রি করিয়ে রাখেন। মাসে যত রোগী দেখেন ডাকতার, একটি কমিটি তার হিসাব রাখে, এবং সেই অনুযায়ী সরকারের কাছ থেকে তিনি বেতন পান। চিকিৎসার জন্যে লোকে প্রথমে এই জেনারেল প্র্যাকটিশনারের কাছেই যান, এবং তিনি শতকরা ৯০ ভাগ রোগেরই চিকিৎসা সফলভাবে করে থাকেন। প্রয়োজন হলে হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে পাঠান। ক্রমশ, একজন মাত্র চিকিৎসকের পরিবর্তে রোগনির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, যথা—একসরে, প্যাথলজি পরীক্ষা ইত্যাদি সমন্বিত স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রচলন প্রাথমিক স্তরেই রোগনির্ণয় আর চিকিৎসার ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করেছে।

ব্রিটেনে প্র্যাকটিস করছেন এমন এক ভারতীয় চিকিৎসকের মতে, এই ব্যবস্থায় সেখানকার চিকিৎসকেরাও ভালোভাবেই কাজ করতে পারেন। যে-কোনো ধরনের চিকিৎসা প্রয়োগ করার স্বাধীনতাও তাঁদের থাকে, অথচ দায়িত্ব-কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না। তাঁর মতে, ব্রিটেনের সাধারণ নাগরিকের স্বাস্থ্য বেশ ভালো, শুধু তারা অত্যধিক মদ্যপান করে। অর্থাৎ, চিকিৎসার এই ব্যবস্থা জনসাধারণের পক্ষে ফলপ্রসূ হয়েছে, যদিও দেশের কঠিন অর্থনৈতিক সংকটের দরুন ওষুধ ইত্যাদির খাতে খরচে কিছুটা টান দিয়েছে সরকার। রোগপ্রতিরোধের ব্যবস্থা সেদেশে কেমন, এ বিষয়ে কিছু পরে আলোচ্য।

চীন

চীনে জনস্বাস্থ্যব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য হল বিস্তৃত অঞ্চলে যথেষ্ট সংখ্যায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা যাতে সমস্ত মানুষকে চিকিৎসার আওতায় আনা যায়। সেই লক্ষ্য অনুসারেই কাঠামোটি সাজানো হয়েছে, এবং যত জন প্রয়োজন, পরিকল্পিতভাবে তত জনই চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করা হয়। চীনে প্রাইভেটে প্র্যাকটিসের নিয়ম নেই—ডাকতার নার্স সকলেই সরকারি চিকিৎসাকেন্দ্রে নিযুক্ত—সরকারই তাঁদের বেতন দেন।

চীনে চিকিৎসাব্যবস্থার কাঠামোটি এইরকম :,

প্রতি কাউন্টিতে অন্তত একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র আর মহামারী-প্রতিরোধ কেন্দ্র, একটি প্রসূতি-ও শিশু-চিকিৎসাকেন্দ্র এবং একটি ঔষধপরীক্ষাকেন্দ্র। প্রতি কমিউনে একটি হাসপাতাল, প্রতি প্রোডাকশন ব্রিগেডে একটি করে সমবায়িক চিকিৎসাকেন্দ্র। শেষের এই কেন্দ্রে সাধারণত বেয়ারফুট চিকিৎসকরা কাজ করেন। তাঁরা স্থানীয় মানুষ, সাধারণত চাষবাস বা অন্যান্য পেশায় থেকেও বিশেষশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে চিকিৎসা আর স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রাথমিক কাজগুলো করেন। তিন-স্তরের এই কাঠামোয় সমবায়িক কেন্দ্রই হল প্রাথমিক স্তর। শহরে আছে বড়ো-বড়ো হাসপাতাল, বিশেষ চিকিৎসার হাস-পাতাল, শ্রমিকদের হাসপাতাল, গবেষণাকেন্দ্র ইত্যাদি। কিন্তু প্রাথমিক স্তর থেকেই চিকিৎসা, রোগপ্রতিরোধ, স্বাস্থ্যশিক্ষা এবং গবেষণা—সব বিষয়েই ব্যাপক কাজ করা হয় নির্দিষ্ট ন্যূনতম জনসংখ্যার অনুপাতে। চীনে ছয় লক্ষের মতো প্রোডাকশন ব্রিগেডের প্রত্যেকটিতে সম-বায়িক চিকিৎসাকেন্দ্র আছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, এই ব্যবস্থায় চীনের জনস্বাস্থ্য মুক্তিপূর্ব চীনের তুলনায় অনেক ভালো হয়েছে, সাধারণ মানুষের কর্মক্ষমতা অনেক বেড়েছে। কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, যৌনরোগ, কালাজ্বর, অন্যান্য অনেক রোগ আগে চীনের বিস্তৃত অঞ্চল ছেয়ে থাকত। এখন সেসব নির্মূল হয়ে গেছে। যক্ষ্মার প্রকোপও অত্যন্ত কম। পিকিং-এর দুটি যক্ষ্মা হাসপাতালের একটি বন্ধ হয়ে গেছে, অন্যটিতে অল্প কিছু রোগী দেখা যায়। (সূত্র : চায়না—ফ্যাকটস অ্যানড ফিগারস, নভেম্বর, ১৯৮২)।

রোগ গভীর, রোগ ব্যাপক

সুস্থ বাঙালির চেয়ে এখন সম্ভবত অসুস্থ বাঙালির সংখ্যাই বেশি হবে। খুব মোটা দাগের হিসেবে রোগ-গুলোকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি : এক—প্রোটিনের রোগ ; দুই—অপুষ্টি-বা অভাব-জনিত রোগ ; তিন—খারাপ পরিবেশের দরুন রোগ।

প্রথম ধরনের রোগের মধ্যে পড়ে হার্টের অসুখ ; মস্তিষ্কের, কিডনির, অ্যালারজি-জনিত রোগ। গাঁটে ব্যথা, উচ্চ রক্তচাপ, ক্যানসার, ডায়াবেটিস ইত্যাদিও সাধা-রণত বেশি বয়সের রোগ। তবে উন্নত দেশে যে-সমস্ত রোগ বেশি বয়সে দেখা যায় এদেশে সেসব চল্লিশ-অনূর্ধ্বদের মধ্যেও যথেষ্ট দেখা দিয়ে থাকে। দীর্ঘদিনের শারীরিক অযত্ন, মানসিক ক্লেশ, পরিবেশের চাপ তাঁদের এই দিকে ঠেলে দেয়।

জনসাধারণের ব্যাপক অংশ দারিদ্রের কবলে থাকার ফলে অপুষ্টিজনিত রোগের সংখ্যা খুব বেশি। বিভিন্ন ভিটামিনের অভাব, প্রোটিনের অভাব প্রভৃতি কিছু রোগ (যেমন অন্ধত্ব, বারোমাসের পেটের অসুখ, অজীর্ণ, হাত-পা ফোলা অথবা শরীর শুকিয়ে যাওয়া [মারাসমাস]) ইত্যাদি সৃষ্টি করে। অপুষ্টিজনিত রক্তাল্পতা আরও অনেক রোগকে ডেকে আনে শরীরে।

অপরিচ্ছন্নতা, অজ্ঞতা, আশপাশের দূষিত জল, কলকারখানার অব্যবস্থাকর এবং বিশেষ ক্ষতিকর পরি-বেশও গ্রামে শহরে বিশেষ কিছু রোগের রোগী তৈরি করেই চলেছে। কলকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে যেমন, তেমনি বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, রানাঘাটের গ্রামীণ হাস-পাতালেও সর্দিকাশি, পেটের অসুখ, খিঁচুনি জ্বর, চুলকানি, টিবি, গাঁটে বাত এবং অন্যান্য সংক্রামক রোগের রোগীই আসে প্রধানত। হুককৃমি-জনিত রক্তাল্পতা একটি বিশেষ সমস্যা। এ ছাড়া মেয়েদের বিশেষভাবে থাকে রক্তাল্পতা, শ্বেতস্রাব, জরায়ু নেমে আসা, মাসিকের বিভিন্ন ধরনের উপসর্গ ইত্যাদি। আউটডোরে টিবির সংখ্যা প্রতিদিন গড়ে কমপক্ষে ৭০ জন, তার মধ্যে মহিলা বেশি। শিশুবিভাগেও টিবি রোগীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশি হওয়ায় বড়ো হাসপাতালের শিশুবিভাগেও টিবি আউটডোর খুলতে হয়েছে। কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে শিশুদের বহির্বিভাগসহ রোজ প্রায় শ-তিনেক শিশু দেখাতে আসে। কর্মরত হাউস স্টাফের মতে, পেটখারাপ, সর্দিজ্বর, খিঁচুনি, প্রোটিন-ঘাটতি, অপুষ্টি নিয়ে আসে প্রায় ৮০ ভাগ শিশু। ভরতিও হয়। সেপটি-সিমিয়ায় ভরতি হয় রোজ প্রায় একজন করে। রোগী-মৃত্যুর হার গড়ে চারজন করে প্রতিদিন। এনকেফেলাই-টিস, মেনিনজাইটিস রোগীও প্রতিদিন ভরতি হয়, তারা প্রায় বাঁচেই না। গ্রামের আউটডোরগুলোতে কৃমি, চুল-কানি, ভিটামিনের অভাবে রোগ ৮০ থেকে ১০০ ভাগ রোগীরই আছে।

পশ্চিমবঙ্গে সংক্রামক রোগের মধ্যে বেশি হয় প্রধানত আন্ত্রিক রোগ, জনডিস, কুষ্ঠ, অন্যান্য চর্মরোগ এবং যৌনরোগ। সম্প্রতি চোখের প্রদাহ বা কনজাংটিভাইটিস কলকাতা এবং শহরতলিতে ছড়িয়ে পড়েছে। জনডিস এবং আন্ত্রিক রোগ সাময়িক রোগ, তবে মানুষ মারার ক্ষমতা এদের কিছুমাত্র কম নয়। ১৯৮৪ সালে গোটা পশ্চিমবঙ্গে আন্ত্রিক মহামারীর আকারে এসে প্রায় হাজার প্রাণ নিয়ে চলে গেল। সরকারি ব্যবস্থার অপ্র-তুলতা, মানুষের চূড়ান্ত অজ্ঞতা, পরিবেশের সীমাহীন দূষণের ফলে অবস্থাকে আয়ত্তে আনতে হিমশিম খেতে হয়েছে। ১৯৮৫ সালে জনডিসও এল মহামারীর রূপে বিশেষ করে কলকাতা শহরে। এমনিতেই জনডিসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে, আর এই রোগের মধ্যে যেটি হেপাটাইটিস-বি, তার জীবাণু রক্ত থেকে যায়। ম্যালেরিয়ার কথা আগেই বলা হয়েছে—১৯৮০ সাল থেকে তা ক্রমশ বৃদ্ধির পথে। কলকাতা পুরসভার রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৯৮৫ সালে এ পর্যন্ত কলকাতায় ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে ১৭,৮০০ জন।

সারা পশ্চিমবঙ্গে এখন মোট ৫ লক্ষ কুষ্ঠরোগী আছে। উত্তর বাঙলায় এই রোগের প্রাদুর্ভাব যথেষ্ট বেশি। দক্ষিণ বাঙলায়ও বাঁকুড়া, পুরুলিয়া থেকে শুরু করে কলকাতার ঘিনাজ বসতিতে ভয়াবহ সংখ্যায় ছড়িয়ে আছে কুষ্ঠাক্রান্ত রোগী।

চর্মরোগের সম্ভবত কোনো সংখ্যা পাওয়া যায় না। অর্থাৎ অসংখ্য গ্রামে তো বটেই, খোস-পাঁচড়া, দাদ, চুল-কানি, একজিমা, শহরের বসতিগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে।

আউটডোরে নিত্যরোগীদের মধ্যে যৌনসংক্রামিত রোগীর সংখ্যা নেহাত কম নয়। বড়ো হাসপাতালগুলোতে

এর জন্য আলাদা আউটডোর এবং কিছু শয্যাও নির্দিষ্ট আছে। মেডিক্যাল কলেজে ভিড় আউটডোরে দিনে গড়ে ২০ জন নতুন রোগী দেখাতে আসে। ১৯৮১ সালের গণনা অনুযায়ী, আউটডোরে উপস্থিত রোগীর সংখ্যা পুরুষ ১১১২১, স্ত্রীলোক ৩৪২২২ ; বালক ২২২৫, বালিকা ১৯১৬। এদের মধ্যে সিফিলিস আর গনোরিয়াই বেশি। মার থেকে সংক্রামিত হয়ে হামাগুড়ি-দেওয়া শিশুও আক্রান্ত হয়।

এ ছাড়া আছে কৃমি, আমাশয় যাতে, বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গের শতকরা ৯০ ভাগ লোকই আক্রান্ত। তাদের জীবনীশক্তি ক্রমশ কমে আসছে। এই রোগে আক্রান্ত হয়ে শিশুদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি আটকে যাচ্ছে। এই অসুখগুলো সংক্রামকও বটে, এবং খারাপ পরিবেশেরও ফল। আরও আছে পাকস্থলী বা অন্ত্রে ঘা (পেপটিক আলসার) হাঁপানি, স্পনডিলাইটিস, গাঁটে বাত, নার্ভের অসুখ—পশ্চিমবঙ্গের ক্রমবর্ধমান কলকারখানা, ঘিনজি বস্তি, দূষিত আবহাওয়া, অনিশ্চিত জীবনের গ্লানির কারণে এই দীর্ঘস্থায়ী রোগগুলো আজ ক্রমবর্ধমান। পশ্চিমবঙ্গের শিশুস্বাস্থ্য আরোই অনুজ্জ্বল। কৃমি, আমাশয়, ম্যালেরিয়া, টিবি ইত্যাদি রোগ ছাড়াও শুধু অপুষ্টিতে, প্রোটিন ভিটামিন ইত্যাদির অভাবে বালোই পঙ্গু হয়ে পড়ছে হাজার হাজার শিশু। চক্ষুবিশেষজ্ঞ ডাঃ আই. এস. রায়ের মতে ভারতে প্রতি বছর প্রায় ১৫০০০ শিশু ভিটামিন-এর অভাবে অন্ধ হয়ে যায়। কাঠি-কাঠি হাত পা, পেটটা বড়ো, খসখসে চামড়া, লালচে চুল আর ভোঁতাবুদ্ধি শিশুকুল আজ পশ্চিমবঙ্গের 'সম্পদ'।

কিন্তু রোগের এই বর্ণনা একান্তই মোটা দাগের ওপর-ওপর আঁকা একটা চিত্র। এর আর-একটু বিস্তারিত বর্ণনা, আরও বিশ্লেষণ আমাদের আতঙ্কিত করে তোলে। কিন্তু প্রশ্নটি এই যে স্বাধীনতার ৩৮ বছর পরেও একটি তুলনামূলকভাবে সচেতন প্রদেশের স্বাস্থ্য-চিত্র (সরকারি তথ্য অনুযায়ী) যদি এত করুণ, এতই ভয়াবহ হয়, তাহলে স্বাস্থ্যদপ্তরের আমলারা কী করে জোর গলায় প্রচার করে চলেছেন 'হেলথ অন দি মার্চ'? রোগ এবং রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যার দিকে তাকালে যেকথা প্রথম মনে আসে তা হল, রোগের নিরাময় হবে কী করে? চিকিৎসা করে? রোগীর আউটপুট প্রতিদিন যা, তাদের চিকিৎসা করে সুস্থ এবং নীরোগ করার ক্ষমতা পশ্চিমবঙ্গের তাবৎ সরকারি, বেসরকারি সংস্থা-সমূহের মিলিতভাবেও আদৌ নেই। আর আগেই প্রমাণিত হয়ে গেছে, শুধু চিকিৎসা করে রোগনিরাময় করা যায় না। এর একমাত্র প্রতিকার হল রোগপ্রতিরোধ।

রোগপ্রতিরোধ ও স্বাস্থ্যশিক্ষা

'রোগপ্রতিরোধব্যবস্থা' কথাটি আজকাল আর কিছু নতুন কথা নয়। বিশ্বের প্রতিটি দেশই এখন ওয়ার্ল্ড হেলথ অরগানাইজেশনের ডাকে সাড়া দিয়ে রোগপ্রতিরোধে যথেষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সুতরাং সব দেশেই যেমন রোগপ্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্যশিক্ষা হয়, পশ্চিমবঙ্গেও হয়।

আসুন আমরা পশ্চিমবঙ্গের রোগপ্রতিরোধব্যবস্থার গভীরে প্রবেশ করি।

শহরে রোগপ্রতিরোধের দায়িত্ব করপোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটির বিভিন্ন টীমের ওপরে। হাসপাতালের প্রিভেনটিভ অ্যানড সোস্যাল মেডিসিন বিভাগের ভ্রাম্যমান দল যায় কোনো-কোনো জায়গায়। হাসপাতালে বসেও টীকা দেওয়া হয়। সেখানে সপ্তাহে নির্দিষ্ট দিনে ট্রিপল অ্যানটিজেন (টিটেনাস, ডিফথিরিয়া ও হুপিং কফ), ডাবল অ্যানটিজেন স্কুলের বাচ্চাদের জন্য, বয়স্কদের জন্য টিটেনাস টকসয়েড ; শিশুদের জন্য মুখে পোলিও ভ্যাকসিন খাওয়ানো হয়। এ ছাড়া আছে পাঁচ-দফা কর্মসূচী—(১) ভিটামিন এ-যুক্ত তেল (প্রতি চামচে ২ লক্ষ ইউনিট) (২) লিকুইড আয়রন, (৩) বয়স্কদের জন্য ফলিফার ট্যাবলেট, (৪) শিশুদের জন্য ফলিফার ট্যাবলেট। যে-সমস্ত কৌতূহলী ব্যক্তি রোগপ্রতিরোধ বা স্বাস্থ্য সম্পর্কে কিছু জানতে চান তাঁরা এই বিভাগে যোগাযোগ করেন। এ ছাড়া এই বিভাগের নিজস্ব কোনো প্রচারব্যবস্থা নেই। করপোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটির ক্লিনিকেও প্রতিষেধক টীকা দেওয়া হয়। করপোরেশন-চালিত সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যশিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

গ্রামে রোগপ্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্যশিক্ষার যাবতীয় দায়িত্ব পাবলিক হেলথ নারসের। একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একজন, অর্থাৎ ৬০০০৯ থেকে ১ লক্ষ মানুষ-পিছু একজন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, গ্রামে স্বাস্থ্যচিকিৎসার কাজ প্রথম শুরু হয় ভোর কমিটির সুপারিশে ১৯৪৬ সাল থেকে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকে বলা হয় কমপ্রিহেনসিভ হেলথ সেনটার। এখানে রোগচিকিৎসা ছাড়া প্রতিরোধ, পুনর্বাসন এবং বিভিন্ন পদক্ষেপে জনসাধারণকে উদ্যোগী করে তোলার দায়িত্ব পাবলিক হেলথ নারসের। পি. এইচ. এন-এর কাজের তালিকা এইরকম—প্রসূতি, পরিবারপরিকল্পনা ক্যাম্প, স্বাস্থ্যপরীক্ষা, অভিভাবক-শিক্ষক-সংঘ গড়ে তোলা, বাড়ি-বাড়ি ঘুরে পুরনো রোগীদের সম্বন্ধে খোঁজ নেওয়া, শিশুপ্রদর্শনী, মহামারী ইত্যাদির সময় স্বাস্থ্যশিক্ষা, প্রতিরোধ সম্পর্কে প্রচার করা, টীকা দেওয়া, ভ্যাসেকটমি, লাইগেশন ক্যাম্প, দাইদের ট্রেনিং দেওয়া।

এঁদের সাহায্য করেন হেলথ ওয়ারকার, ভ্যাকসিনেটর, এ. এন. এম. ম্যালেরিয়া, লেপ্রসি হেলথ ওয়ারকার ইত্যাদি। প্রতি ৮০০০ জনসংখ্যা পিছু এঁরা কাজ করেন। ১৯৭৩ সালে কর্তার সিং কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী এই সমস্ত ধরনের প্যারামেডিক্যাল স্বাস্থ্য-কর্মীদের একাকার করে একজন মালটিপারপাস হেলথ ওয়ারকার ব্যবস্থা চালু করা হয়। সম্ভবত ১৯৭৯ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে এই ট্রেনিং শুরু হয়েছে। শিক্ষণকাল ১৮ মাস। এঁরা ৩৫০০ জনসংখ্যাপিছু কাজ করছেন।

এঁদের একটি করে মেডিক্যাল কিট দেওয়া হয়। তাতে ৬০০ টাকা মূল্যের ওষুধ থাকার কথা। পরিবার-পরিকল্পনা এবং সাধারণ রোগের জন্য ওষুধ থাকে, যেমন ট্যাবলেট সালফাডায়াজিন (জীবাণুনাশক), অ্যানালজিন (ব্যথা, যন্ত্রণা)। ভিটামিন বি কমপ্লেক্স, সালফা-গোয়ানাইডিন (পেটখারাপ), এনটারোকুইনল (আমাশয়), বেলেডোনা (পেটের যন্ত্রণা), ফলিফার ট্যাবলেট (আয়রন-ফলিক অ্যাসিড যৌগ), অ্যানটিব্যায়োটিক মলম (জীবাণুনাশক), বোরিক পাউডার, মারকিউ-রোক্রোম লোশন, জেনশান ভায়োলেট লোশন (কাটা ঘা বা চর্মরোগে লাগাবার জন্য)। টিটেনাস টকসয়েড ইনজেকশন, ওয়াল রিহাইড্রেশন পাউডার (অতিরিক্ত পেট খারাপে শরীরে জলের পরিমাণ কমে গেলে দেওয়া হয়) —এসব এঁদের কিট-এ থাকে।

১৯৭৭ সালে রাশিয়ার আলমাআটার গ্রাসরুট লেভেলে (সর্বনিম্ন স্তরে) স্বাস্থ্যশিক্ষা আর রোগপ্রতিরোধ পৌঁছে দেওয়ার জন্য কমিউনিটি হেলথ ওয়ারকার তৈরির প্রস্তাব নেওয়া হয়। ভারতে ২০০০ সালের মধ্যে সকলের কাছে স্বাস্থ্য পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই ধরনের কর্মী তৈরির প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণী অবধি শিক্ষিত এবং ১২ সপ্তাহের পেশাগত শিক্ষার পর এঁরা গ্রামে-গ্রামে একটি মেডিক্যাল কিট নিয়ে কাজ করেন। মূলত প্রাথমিক চিকিৎসা আর রোগপ্রতিরোধ এঁদের কাজ। কমিউনিটি হেলথ ওয়ারকাররা অনেকটা চীনের বেয়ারফুট ডাকতারের মতো। তাঁরা গ্রামের এমনই সাধারণ কর্মী, চাষবাস বা অন্যান্য কাজে যুক্ত থাকে। দৈনিক দু-তিন ঘণ্টা স্বাস্থ্যসংক্রান্ত কাজ করার কথা। প্রতি ৫০০০ শিশু-পিছু গড়ে উঠেছে ইনটিগ্রেটেড চাইলড ডেভেলপমেনট স্কীম (আই সি ডি এস), প্রতি কেন্দ্রে দুজন করে শিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলা থাকেন। নিয়মিত বাচ্চাদের সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যপরীক্ষা, মায়েদের তাঁদের নিজেদের ও শিশুদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া, শিশুদের খাবার (বুলগার, ডাল আর বাটার-অয়েল) দেওয়া এঁদের কাজ।

পশ্চিমবঙ্গের জনস্বাস্থ্যবিভাগ যে রোগপ্রতিরোধ-ব্যবস্থা নিয়েছেন, অর্থাৎ রোগপ্রতিরোধব্যবস্থার সামগ্রিক যে কাঠামো, তা কার্যকর হলে পশ্চিমবঙ্গ থেকে রোগ নির্মূল হওয়ার কথা। কিন্তু সেটি হতে গেলে কাগজ-কলমে যা লেখা আছে তার সঙ্গে যা করা হচ্ছে দুটোকে মেলাতে হবে।

রোগপ্রতিরোধের বাস্তব অবস্থা

না, মিলছে না। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে রোগের যে চিত্র আমরা দেখছি শক্তিশালী প্রতিরোধব্যবস্থা কার্যকর থাকলে তা কখনই এমনটি হতে পারত না।

তাকিয়ে দেখা যাক ব্রিটেনের দিকে, চীনের দিকে।

ব্রিটেনে ষাটের দশক থেকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যরক্ষার টীম চালু হয়েছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যরক্ষাব্যবস্থায় প্রাথমিক চিকিৎসা ছাড়াও জনসাধারণের মধ্যে রোগপ্রতিরোধের কাজও হয়। এই টীমে চিকিৎসক ছাড়াও হোম নারস, হেলথ ভিজিটর, সোস্যাল ওয়ারকার, মিডওয়াইফ আর অ্যাডমিনিসট্রেটর থাকেন। এই টীম স্বাস্থ্যশিক্ষাও দেয়। হোম নারস চিকিৎসার কাজে চিকিৎসককে সহায়তা

করেন, আবার বাড়ি-বাড়ি গিয়ে পুরনো রোগীর ফলো-আপ বা রোগ সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়াও করেন। ব্রিটেনে বর্তমানে ৪৭টি শিক্ষণকেন্দ্রে এঁরা মেডিক্যাল এবং সাইকো-সোস্যাল ট্রেনিঙ পেয়ে রেজিসটার্ড হন। হেলথ ভিজিটরও রেজিসট্রিকৃত নারস। এঁরা বাড়ি-বাড়ি ঘুরে পরিচ্ছন্নতা, ভালো স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস গড়ে তোলা, শিশুযত্ন শিক্ষা দেন। এঁদের এই কাজের দ্বারা অপুষ্টি, সংক্রামক রোগের বিস্তার বন্ধ করা সম্ভব হয়। বর্তমানে যেহেতু সব প্রসূতিই কমিউনিটি হাসপাতালে প্রসব হন সেজন্য মিডওয়াইফদের কাজ মূলত প্রসূতি-কালীন ও পরবর্তী সময়ে বাড়ি গিয়ে যত্ন নেওয়া।

ব্রিটেনের জাতীয় স্বাস্থ্যপ্রকল্পে এরিয়া হেলথ অথরিটি একটি স্বনির্ভর স্বাস্থ্যবিভাগ এবং ক্ষুদ্রতম ভাগ ডিস্ট্রিক্টে বিভক্ত। একটি ডিসট্রিক্টে আনুমানিক জনসংখ্যা ২,৫০,০০০। এই জনসংখ্যা-পিছু আছে একটি সাধারণ হাসপাতাল এবং ডিসট্রিক্ট কমিউনিটি মেডিক্যাল সারভিস।

এখন দেখা যাচ্ছে, এই ধরনের প্রতিরোধব্যবস্থা, স্বাস্থ্যশিক্ষার এই ধরন নিয়েই ব্রিটেনের জনস্বাস্থ্য বেশ ভালো। চাডউইকের আমলের সেই মূল নীতি অনুসরণ করেই পরিবেশ, রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন, মানুষের স্বাস্থ্যাভ্যাস উন্নত এবং পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা হলেও খাদ্য বা ওষুধপত্রে ভেজাল দিয়ে ব্যাপক সাধারণ মানুষকে অসুস্থ করে রাখার ঘটনা সেখানে ঘটে না। ব্রিটেনে কর্মরত বিভিন্ন বিদেশী চিকিৎসক এবং প্রবাসী ভারতীয় এই মতামত দিয়ে থাকেন।

শুধু ব্রিটেন নয়, উন্নত দেশগুলি সামগ্রিকভাবেই এই স্বাস্থ্যাভ্যাস অর্জন করেছে।

আর্থিক সচ্ছলতা একটা বড়ো কারণ। কিন্তু দেখা গেছে, শুধু আর্থিক সচ্ছলতাই নয়, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি অন্যতম এবং সম্ভবত প্রধান কারণ। ?

মুক্তিপূর্ব চীন ছিল বিভিন্ন সংক্রামক আর কৃমিজাত রোগের ডিপো। এক দক্ষিণ চীনেই প্রায় এক কোটি লোক আক্রান্ত ছিল সিসটোসোমিয়াসিস কৃমিরোগে, ৪২টা গ্রাম আর প্রায় কয়েক হাজার লোক নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল।

মুক্তির পরে নতুন চীনে সিসটোসোমিয়াসিসের চিকিৎসা, প্রতিরোধ এবং গবেষণা কমিটি তৈরি হয়। ১৯৫৭ সালের মধ্যে ১৬,০০০ সর্বক্ষণের কর্মী এবং প্রচুর অপেশাদার কর্মী এই রোগ নির্মূল করার কাজে লেগে যান। ডা. যেশুয়া হর্ন তাঁর 'অ্যাওয়ে উইথ অল পেস্টস' বইতে বলেছেন "এমনকি নদীর পাড়ে-পাড়ে যে শামুক কৃমিকীটকে আশ্রয় দিত, তাদের খুঁজে বার করে নির্মূল করা হয়েছে।" ১৯৭৯ অর্থাৎ মুক্তির ৩০ বছরের মধ্যে তিনের দুই ভাগ রোগী সুস্থ হয়েছেন এবং রোগটি চীন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। , ,

উপর্যুপরি সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন এবং যুদ্ধবাজ সামন্তদের গৃহযুদ্ধের ফলে মুক্তিপূর্ব চীনে যৌনরোগের ব্যাপ্তি ছিল প্রচণ্ড। ১৯৪৯ সালে, রাজধানী পিকিং-এর শতকরা আশিজন গণিকা যৌনরোগাক্রান্ত ছিল। চীনের বৃহত্তম বন্দর-নগর সাংহাইয়ে এই সংখ্যা ছিল শতকরা ষাট ভাগ। অন্তর্মঙ্গোলিয়ার মতো সুদূর অঞ্চলেও যৌনরোগ ছিল ঘরে-ঘরে।

মুক্তির পরে-পরেই গোটা চীন থেকে যৌনরোগকে দূর করার জন্য তিনটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এর পিছনে মূল যে নীতি কাজ করেছিল তা হল, একই সঙ্গে রোগের চিকিৎসা, উৎসগুলিকে খুঁজে বার করে চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া, রোগ আর তার প্রতিরোধ সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া এবং আক্রান্তদের পুনর্বাসন।

১৯৪৯ সালে প্রচণ্ড আর্থিক সংকট থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে কোনো কার্পণ্য করা হয় নি। প্রথম পদক্ষেপেই কয়েক মাসের মধ্যে সমস্ত গণিকালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়। পিকিং-এ ১৩০০ জন এবং সাংহাই-এ ৫,৩০০ জন নারীকে এই ঘৃণিত কাজ থেকে মুক্ত করা হয়। অন্যান্য শহরেও এই পদ্ধতি চলতে থাকে। এদের চিকিৎসা করে নীরোগ করার পর লিখতে-পড়তে শেখানো হয় এবং বিভিন্ন বৃত্তিশিক্ষা দেওয়া হয়, বিভিন্ন কাজে নিয়োগও করা হয়। এদের মধ্যে অনেকেই পরে বিয়ে করে।

দ্বিতীয় পদক্ষেপে দেশব্যাপী মহামারী প্রতিরোধের ধরনে উদ্যোগ নিয়ে স্বাস্থ্যকর্মীদের যৌনরোগনির্ণয়, চিকিৎসা এবং যৌনরোগীদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে শেখানো হয়। তাঁরা দায়িত্ব নিয়ে কাজ শুরু করে দেন।

তৃতীয় পদক্ষেপে সাধারণ মানুষকে যৌনরোগ আর তার প্রতিকার-প্রতিরোধ সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়।

এইভাবে গভীর অথচ ব্যাপক কর্মসূচী নেওয়ার ফলে চীনে যৌনরোগ দ্রুত কমে যেতে থাকে। ১৯৪৯ সালে যেখানে পিকিং-এ আউটডোরে রোগীর মধ্যে সিফিলিসের সংখ্যা ছিল শতকরা ১০·১ ভাগ, সেখানে ১৯৬৩ সালে তা নেমে আসে শতকরা ০·০৫ ভাগে। এমনকি অন্তর্মঙ্গোলিয়ার মতো পশ্চাৎপদ অঞ্চলেও শতকরা ২৪·৭ ভাগ থেকে ১৯৫৭ সালের মধ্যে সিফিলিসরোগীর সংখ্যা ১·৩-এ নেমে আসে।

সংক্রামক রোগের একটি প্রতিকার হল জল ফুটিয়ে খাওয়া। চীনে এখন প্রতিটি লোক জল না ফুটিয়ে পান করে না।

তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির মতো মুক্তিপূর্ব চীনেও নারী ছিল সমাজে সর্বাপেক্ষা অবহেলিত। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তনের ফলে সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকারের সঙ্গে-সঙ্গে নারীর স্বাস্থ্যের প্রতিও বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। কৃষক-মহিলাদের মাসিকের সময় চাষের কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। কর্মরতা মায়েদের কাজের ফাঁকে শিশুকে দুধ পান করাবার অবসর দেওয়া হয়। নারীদের বিশেষ কিছু অসুখ নির্মূল করার জন্য নিয়মিত চেক-আপের ব্যবস্থা আছে। যেমন, ১৯৫৮ সাল থেকে, বড়ো-বড়ো শহর থেকে শুরু করে গ্রামগুলি পর্যন্ত নারীদের জরায়ুর ক্যানসারের জন্য স্লাইড নিয়ে পরীক্ষা শুরু হয়। বেয়ারফুট স্বাস্থ্যকর্মীরা স্লাইড নেন এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সেগুলি পরীক্ষা করেন। এইভাবে প্রোল্যাপস ইউটেরাস (জরায়ু নেমে আসা) এবং ইউরিনারি ফিশচুলা (প্রস্রাবনালী আর যোনির মধ্যে ছেদ হয়ে যায়), যা গ্রামের মেয়েদের মধ্যে বেশি দেখা যায়, তারও চিকিৎসা এবং প্রতিরোধ করা হয়। শিশুদের মধ্যে ডিপথিরিয়া আর পোলিও নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে।

গোড়া থেকে রোগ নির্মূল করার এই যে প্রয়াস—নিঃসন্দেহে পশ্চিমবঙ্গে আজ রোগ ঠেকাবার যে প্রয়াস, যে দিনগত পাপক্ষয় চলছে তার থেকে ভিন্ন।

পশ্চিমবঙ্গের জনস্বাস্থ্যব্যবস্থা একই সঙ্গে অগভীর এবং অবহেলিত। অগভীর, তার কারণ—চিকিৎসা এবং প্রতিষেধক টীকা দেওয়া ছাড়াও রোগ নির্মূল করার অন্য দিকগুলোর ওপর তেমন গুরুত্বই দেওয়া হয় নি। সেগুলি হল : (১) অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ, যাতে রোগ-পোকারা জন্মায়, (২) মানুষের সঠিক স্বাস্থ্যাভ্যাসের অভাব, যা রোগপোকাদের ডেকে আনে, (৩) দারিদ্র্য, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, যা মানুষের শরীরকে দুর্বল করে রাখে, স্বাভাবিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে দেয় না। অবহেলিত, তার কারণ—প্রতিটি ক্ষেত্রেই যতটুকু আয়োজন করা হয়েছিল, তা কোনোদিনই ভালোভাবে, খুঁটিয়ে পালিত হয় নি।

জনসংখ্যার অনুপাতে গ্রামে তো বটেই, শহরেও চিকিৎসক, নারস এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা যথেষ্ট কম, তার ফলে কোনো রোগীই যথেষ্ট মনোযোগ পান না।

রাজনারায়ণ যখন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন তাঁর পলিসি অনুযায়ী ইউনিসেফ থেকে বড়ো-বড়ো হাসপাতালে বিশাল ভ্রাম্যমাণ বাতানুকূল গাড়ি দেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে যাবতীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকত। উদ্দেশ্য : শহরতলি আর মফস্সল অঞ্চলের মানুষ যাতে দোরগোড়াতেই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ পান। দিল্লীতে সেই গাড়ি কাজ করছে, অথচ পশ্চিমবঙ্গে তা অচল। এখানে গ্রাম তো দূরের কথা, শহরতলির রাস্তাও এত সরু আর খারাপ যে অত বড়ো গাড়ি ঢুকতে পারে না। দ্বিতীয়ত, সেগুলি খারাপ হয়েও পড়ে আছে।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একজন বা দুজন পাবলিক হেলথ নারসের পক্ষে প্রায় ৬০,০০০ থেকে ১ লক্ষ মানুষের স্বাস্থ্যপরীক্ষার নিয়মিত তদারকি করা কি সম্ভব? জনৈক অভিজ্ঞ পি. এইচ. এন.-এর মতে, "দিবারাত্র পরিশ্রম করেও প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের পরিধি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পাঁচ মাইল ব্যাসার্ধের বাইরে বাড়ানো সম্ভব হত না। দূরের গ্রাম এত দুর্গম এবং এত বিস্তৃত যে মাসে/দুমাসে একবার তদারকি করা ছাড়া বেশি কিছু করা যেত না।"

কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী। এর 'দেখভাল' করার দায়িত্ব কলকাতা করপোরেশনের। করপোরেশন স্থাপিত হয় ১৯২৩ সালে। এই সংস্থার স্বাস্থ্যবিভাগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে কাজ করে আরও কয়েকটি বিভাগ। যেমন, জঞ্জাল সাফাই বিভাগ, ধোঁয়াদূষিতকরণ, শব্দদূষিতকরণ, ড্রেনেজ ইত্যাদি। চিকিৎসার জন্যও বেশ কিছু ক্লিনিক, দুটি টিবি হাসপাতাল এবং চারটি প্রসূতিসদন আছে। রোগপ্রতিরোধের জন্য করপোরেশনে কয়েকটি স্তরে বিভিন্ন অফিসার, ইনসপেকটর, ভ্যাকসি-

নেটর, ফিলডওয়ারকার, শ্রমিক আছেন। এঁদের কাজ—কোথাও কোনো সংক্রামক রোগ হলে তা অফিসারকে জানানো, রোগীকে আলাদা করা এবং হাসপাতালে ভরতি করা, টীকা দেওয়া ইত্যাদি।

বছর দশেক আগে পর্যন্ত এঁদের প্রতিষেধক টীম বছরে একবার রোগের প্রাদুর্ভাবের সময়ে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে কলেরা, টাইফয়েড ইনোকুলেশন, বসন্তের টীকা দিয়ে যেত। মাঝে-মাঝে মশামারা তেল ছিটিয়ে যেত। এখন এসব উঠে গেছে, কেননা কলেরার বিরুদ্ধে ওই টীকা কাজ করে না, স্মলপকস নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, আর ম্যালেরিয়ার মশা ওই তেলে মরে না। ম্যালেরিয়ার দরুন বাড়িতে কারো জ্বর হয়েছে কিনা, এ খোঁজ ইদানীংকালে এই প্রতিষেধক বিভাগ থেকে দু-একবার নিতে এসেছেন। কিন্তু দায়সারা এমনই কাজ যে, তাঁরা সে ব্যাপারে কখনই বুঝিয়ে বলেন না যে এই ধরনের জ্বর হলে কী করতে হবে। সেটা প্রাইভেট চিকিৎসকের দায়িত্ব।

আরো আছে। এদেশের ঘিনজি কারখানা এলাকায় জারমানির সেবামূলক সংস্থা কুষ্ঠরোগের বিষয়ে প্রচার করে, ভ্রাম্যমাণ গাড়ি নিয়ে এসে টুল পেতে বসে রোগী দেখে। কিন্তু সরকারি কোনো ক্লিনিক নেই, প্রচার বা প্রতিরোধের টীম নেই। তেমনি নেই টিবির জন্যে কোনো প্রতিষেধকব্যবস্থা বি. সি. জি. টীকা ছাড়া। তাও লাগে না, টীকা দেবার আগেই কোনো-না-কোনো টিবি রোগীর সংস্পর্শে এসে শরীরে ন্যূনতম প্রতিরোধ তৈরি হয়ে যায়। স্কুলে স্বাস্থ্যপরীক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও তা হয় না।

স্বাস্থ্য সম্পর্কে জনগণের ন্যূনতম সচেতনতা গড়ে তুলতে না পারলে কোনো স্বাস্থ্যাভ্যাস তাদের পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। অত্যন্ত ধৈর্য, যত্ন এবং একাধিক উপায়ে তাদের স্বাস্থ্যশিক্ষা দিতে হয়। স্কুলের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যশিক্ষা একান্ত প্রয়োজনীয়, কারণ এই সময়েই বিভিন্ন অভ্যাস গড়ে ওঠে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যে হারে কুসংস্কার এবং অজ্ঞতা জমে আছে মানুষের মনে, সে হারে স্বাস্থ্যশিক্ষা অগ্রাধিকার পায় নি। স্বাস্থ্যকর্মীরা চিকিৎসাতেই কাজের প্রায় সমস্ত সময়টা ব্যয় করে বসেন, শিক্ষা দেওয়ার মতো সময় কোথায়?

অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ

অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের দিক থেকে কলকাতা সারা ভারতবর্ষের শহরগুলির মধ্যে প্রথম হতে পারে। সমস্ত ধরনের দূষণ (শব্দ, ধোঁয়া, আবর্জনা, উপচেপড়া পয়ঃপ্রণালী, অপরিষ্কার পানীয় জল, ঘনবসতি, খাটাপায়খানা, গোরুর খাটাল ইত্যাদি ইত্যাদি) এখানে এত তীব্র, রোগের পাশাপাশি দারিদ্র্য এত প্রকট, জনসংখ্যার আধিক্যের পাশাপাশি বিশৃঙ্খলা এত অনিয়ন্ত্রণযোগ্য যে এখানে জনস্বাস্থ্য সম্ভবত সর্বাপেক্ষা বিপন্ন। এমনকি ভারতের অন্য অঞ্চল থেকে মানুষ এখানে এসে কয়েকদিন থাকলেই পেটের অসুখে ভোগেন, হাঁচি সর্দি শুরু হয়ে যায়। দিল্লী-বোমবাই-মাদ্রাজে যে জামাকাপড় পরে কয়েকদিন ঘোরা-ফেরা করা যায়, কলকাতায় তা একবেলাতেই কালো হয়ে যায়। লক্ষ-লক্ষ লোক যে শহরে প্রতিদিন যাতায়াত করে, যেখানে তিন-চারটি ছাড়া উপযুক্ত শৌচাগার নেই। রাস্তাঘাট কী করে পরিষ্কার থাকবে?

তাহলে স্বাধীন দেশের কর্মীরা কী করছেন? কলকাতা করপোরেশনের প্রাক্তন চীফ মেডিক্যাল অফিসার ডাকতার গৌর দাসের মতে, কলকাতা শহরে জনস্বাস্থ্য উন্নত করার জন্য প্রচুর কাজের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এর জন্য প্রধান বাধাগুলি হল—প্রথমত, যথেষ্ট অর্থ নেই, দ্বিতীয়ত, সহযোগিতার অভাব (কর্মী, জনগণ এবং সরকার সব তরফেই), তৃতীয়ত, আইনের দুর্বলতা। বিশেষ করে আইনের দুর্বলতার জন্যই কোথাও ঘনবসতি এলাকায় ক্ষতিকারক দ্রব্যের বা প্রচণ্ড ধোঁয়া উদ্গীরণকারী কারখানা কিংবা প্রচণ্ড শব্দ হয় এমন কারখানা তুলে দেওয়া যায় না। ডাকতার দাসের ৩৩ বছরের চাকরিতে এমন মাত্র একটি কারখানাই তিনি ভয় দেখিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। তাঁর মতে, স্বাস্থ্যশিক্ষার ওপর যতক্ষণ না জোর দেওয়া হচ্ছে এবং মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা যাচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত যত চেষ্টাই নেওয়া হোক না কেন, তা সম্পূর্ণ ফলপ্রসূ হবেই না।

পশ্চিমবঙ্গের অন্য শহরগুলোর অবস্থাও প্রায় একই রকমের। শিলিগুড়ি শহরে হিলকার্ট রোড নামকরা রাস্তা, বড়ো লোকের বাস এ রাস্তায়। সেই রাস্তায় ফুটপাথের নীচ দিয়ে চওড়া নর্দমা কাটা হয়েছে, কিন্তু দুদিকে জলনিকাশের কোনো বন্দোবস্ত নেই—আবর্জনা আর নোংরা জলে বারোমাস ভরতি হয়ে আছে। কী করে এটা হতে পারে? নগরপালিকার অনুমতি ছাড়া এটা কী করে সম্ভব হয়?

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগুলোতে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ আদৌ নেই। প্রথমত, ঘরের আশপাশে, রাস্তার দুপাশে ঘনসুসংবদ্ধ গাছপালার বদলে অযত্নবর্ধিত জঙ্গল প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। অগভীর ডোবা আর তার চারপাশের জঙ্গল আজ ম্যালেরিয়ার জীবাণুবহনকারী মশার বাসস্থানে পরিণত হয়েছে। যে পারথেনিয়াম গুল্মের বিষাক্ততা সম্পর্কে কত গবেষণা হচ্ছে, কাগজে কত খবর বেরোচ্ছে, সেই গাছ ছেয়ে ফেলেছে গ্রামের রাস্তা, রেললাইনের ধার। কলকাতা শহরেও তা দ্রুত ছড়িয়ে যাচ্ছে।

অধিকাংশ গ্রামেই পানীয় জলের জন্য গভীর কোনো নলকূপ নেই অথবা যদি বা থাকে, অত্যন্ত অল্প। এত লোক তার থেকে জল নেয় যে কদিন অন্তর খারাপ হয়ে যায়। গ্রামবাসীরা বাধ্য হয়ে জলসেচের শ্যালো, এমনকি কাপড় কাচার পুকুর থেকে পানীয় জল, রান্নার জল নিয়ে যায়। সেই জল বারোমাস আমাশয়, পেটখারাপ, জনডিস ইত্যাদি রোগকে জিইয়ে রাখে। গ্রামের বহু পুকুরই এত অপরিষ্কার যে সে জলে নামলে হাতে পায়ে চুলকানি হয়। গ্রামের অনেক নদীই মরেহেজে গিয়েছে। বর্ষায় তাদের জল উপচে পড়ে লোকালয় ভাসায়। পানীয় জল দূষিত হয়ে গিয়ে বর্ষার পর-পরই আন্ত্রিক রোগ ব্যাপক আকারে প্রতি বছর দেখা দেয়।

শিল্পাঞ্চলের আশপাশের গ্রামগুলো ভয়াবহ পরিবেশদূষণের শিকার হয়ে উঠেছে। তাপবিদ্যুৎ স্টেশন, বিভিন্ন রাসায়নিক কারখানা, কাগজকল, খনি অঞ্চলের আশপাশের গ্রামের নদীপুকুর, সবজিখেত, বাতাস—সমস্ত উড়ে-আসা ছাই, ধুলো, বর্জ্যপদার্থ-বয়ে-আনা জলে দূষিত। মানুষ এই পরিবেশেই বসবাস করছে আর ধীরে-ধীরে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। কোনোটা শুরুতেই মারাত্মক, কোনোটা শরীরের জীবনীশক্তি কমিয়ে আনছে আস্তে-আস্তে। দুর্গাপুর, বাঁশবেড়িয়া, হুগলী, ঝাড়গ্রাম, সোদপুর, খড়দহ, মেটিয়াবুরুজ, কল্যাণী, বৃহত্তর কলকাতা—কয়েকটি মাত্র উদাহরণ।

মলমূত্র ত্যাগের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত অধিকাংশ গ্রামাঞ্চলে নেই। লোকে চাষের মাঠে, নদীর ধারে মলত্যাগ করে নদী বা পুকুরের জলেই শৌচ করে। এই কারণেই কৃমির বংশবৃদ্ধি আর কৃমিদ্বারা আক্রান্ত হওয়াকে কখনই ওষুধ খেয়ে নির্মূল করা যাবে না।

রাস্তাঘাটের শোচনীয় অবস্থার কথা আগেই বলা হয়েছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আনতে-আনতেই রোগীর শেষ নিঃশ্বাস ফেলার অবস্থা হয়। সেইজন্য গ্রামে হাতুড়ে ডাকতার, কবিরাজই ভরসাস্থল।

অপরিচ্ছন্নতা যে শুধু বাইরে, মাঠেঘাটে—তাই নয়। ডাকতার, নারস, স্বাস্থ্যকর্মী থেকে শুরু করে রোগী, সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যবোধও এত ভয়ংকরভাবে শিথিল, অপরিণামদর্শী যে হাসপাতালের ভিতরটিকে পর্যন্ত তাঁরা পরিচ্ছন্ন করে রাখতে পারেন না। হাসপাতালের যাবতীয় বর্জ্যপদার্থ দিনের পর দিন হাসপাতালের কোণে-কোণে পড়ে থাকে। কুকুর বেড়াল হাসপাতালের পাকশালায়, রোগীর বিছানায় নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়। শুকরও দেখা যায় এই চত্বরে। সম্প্রতি মালদার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কুকুরে সদ্যঃপ্রসূত শিশুকে খেয়ে ফেলার ঘটনা প্রচণ্ড আতঙ্ক জাগিয়েছে বটে, কিন্তু প্রসবগৃহে কুকুর ঢুকে বালতিতে-পড়ে-থাকা ফুল (প্ল্যাসেনটা) খেয়ে যায় অনেক গ্রামীণ হাসপাতালে। মশা মাছি আরশোলা ইঁদুর তো হাসপাতালের স্থায়ী বাসিন্দা।

অসামাজিক মানসিকতার আরেকটি দিক হল রোগীর ওষুধ, খাবার চুরি করা। চুরি হয় না, এমন কোনো হাসপাতাল পাওয়া যাবে না। এটি বর্তমানে আমাদের জাতীয় অভ্যাস। স্বাস্থ্যকেন্দ্র যে পর্যাপ্ত ওষুধ পায় না, মালটিপারপাস হেলথ ওয়ারকারের মেডিক্যাল কিটে পুরো ওষুধ যে থাকে না, ওষুধগুলো যে নিম্নমানের—তার প্রধান কারণ চুরি। চুরি করার জন্যই ওষুধ সরিয়ে রাখা, নিম্নমানের ওষুধের অর্ডার দেওয়া, এমনকি আই. সি. ডি. এম. (অঙ্গনওয়াড়ি) কর্মীদের স্টাইপেনড কম দেওয়া—সবই এই মহৎ কারণে! এই কর্মীদের নির্দিষ্ট অভিযোগ যে, তাঁদের জ্বালানি না দিয়ে বলা হয় নিজেদের বেতন থেকে কিনে নিতে; শিশুদের খিচুড়িতে ডাল, তেল কম দিয়ে রঙ হবার জন্য বেশি করে হলুদ দিতে বলা হয়।

স্বাস্থ্যাভ্যাসের অভাব

পশ্চিমবঙ্গের মানুষের স্বাস্থ্যচর্চার অভ্যাস অতীতে কেমন ছিল সঠিক বলা যায় না। তবে দীর্ঘদিনের বিদেশী শাসনে, যুদ্ধের ডামাডোলে, দেশবিভাগের ফলে এবং প্রচণ্ড আর্থিক সংকটের দরুন এই স্বাস্থ্যচর্চার বোধটি সাধারণভাবে মানুষের জীবনে অনুপস্থিত। যে-কোনো জায়গায় আবর্জনা, কফ-থুতু ফেলা, মলমূত্র ত্যাগ করা, আড়াকা মাছিবসা খাবার খাওয়া সাধারণ বহু লোকের অভ্যাস। রাস্তার ধারে খোলা খাবার বিক্রি হয়, ক্ষতিকর রঙ দিয়ে মিষ্টান্ন, আইসক্রীম বানানো হয়—এবং শিশুরাও তা কিনে খায়। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে কোন্‌টি শরীরের পক্ষে পুষ্টিকর, এবং কোন্‌টি নয়—সে ধারণা বহু লোকেরই নেই। সুস্বাস্থ্য গড়ে তোলার জন্য শরীরচর্চা, শিশু আর তরুণদের নিয়মিত খেলাধুলার ব্যবস্থা করা, তাতে উৎসাহ দেওয়া—এটিও তুলনামূলকভাবে কম।

মেয়েদের স্বাস্থ্যচর্চা এবং খেলাধুলার আয়োজন তো এখনও একটি দুর্লভ ঘটনা। প্রগতিশীল কিছু মানুষের উৎসাহ সত্ত্বেও মেয়েদের সম্পর্কে সনাতন ধারণার বিশেষ পরিবর্তন আজও হয় নি। প্রসবের আগে-পরে সবেতন ছুটি, শিশুপালনের ব্যবস্থা, এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ভয়ে মেয়েদের কাজেই নিতে চায় না অনেকে। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারও কোনো ব্যতিক্রম নয়। নারীর স্বাস্থ্যের পক্ষে নজর আর নারীর স্বাস্থ্যশিক্ষা বলতে অ্যানটিনেটাল ক্লিনিক, (প্রসবের আগে) চেক-আপ, আয়রন ট্যাবলেট দেওয়া এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশুস্বাস্থ্য সম্পর্কে মাকে শিক্ষা দেওয়া হয়। এ ছাড়া লাইগেশন আর লুপ-পরানো ইত্যাদির দ্বারা পরিবারপরিকল্পনা নারীর স্বাস্থ্যরক্ষার একটি প্রচলিত পদ্ধতি।

শরীরচর্চা

চীনে খেলাধুলা-শরীরচর্চাকে জনস্বাস্থ্য গড়ে তোলার একটি বড়ো উপায় বলে ধরে নেওয়া হয় সেই পঞ্চাশের দশকেই। কিন্তু আমাদের দেশে খেলাধুলো করার মতো মাঠ নেই, পারক নেই, নেই কোনো সবুজের ছায়া। খোলা মাঠে কিশোরেরা খেলাধুলা-ব্যায়াম করবে—এ ভাবনায় পশ্চিমবঙ্গবাসী অভ্যস্ত নয়।

পশ্চিমবঙ্গের জনস্বাস্থ্যবিভাগ শরীরচর্চার বিষয়ে প্রায় সম্পূর্ণ উদাসীন। স্কুলের ছেলেদের সপ্তাহে একদিন শারীরিক শিক্ষার একটি ক্লাস থাকে। সম্প্রতি সেখানে পরীক্ষার আগে কয়েক দিন আসন, যোগব্যায়াম দেখিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সত্যিকারের শরীরচর্চা? তার স্থানই বা কোথায়, অবকাশই বা কোথায়?

দারিদ্র্যই বড়ো কারণ?

পশ্চিমবঙ্গবাসীর হতস্বাস্থ্যের সবচেয়ে যেটি প্রধান কারণ, তা হল—দারিদ্র্য।

যা-হোক কিছু দিয়ে পেটের কোনাটুকু ভরিয়ে তোলা নয়—যে খাদ্য শরীরকে সুস্থসবল করে তোলে, সেই বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্য জোটে না এদেশের অর্ধেকের বেশি মানুষের। পেটের ভাত জোগাড় করতেই যারা হিমশিম খায়, তাদের আবার স্বাস্থ্যচিন্তা!

একটু প্রোটিনের অভাবে, টাটকা শাকসবজির অভাবে, একটু বাদাম বা তিলজাতীয় খাদ্যের অভাবে রক্তশূন্যতা, অন্ধতা, রিকেট, বৃদ্ধির জড়তায় পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে দেশের তরুণ জীবনগুলো। টাকার অভাবে যক্ষ্মা হাসপাতাল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, রোগীরা খাদ্য আর ওষুধের দাবিতে পথে নেমে আন্দোলন করছেন। টাকার অভাবেই নাকি ওষুধপত্র থাকে না, টাকার অভাবেই নাকি যথেষ্ট ডাকতার, নারস, স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করা যায় না।

এটা সম্পূর্ণ সত্য কথা নয়। রাজ্যের বেশির ভাগ মানুষ গরিব, অতি গরিব। কিন্তু দেশটা সত্যি-সত্যি অতি গরিব নয়। সংবাদে প্রকাশ, সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, ভারতবর্ষে যত খাদ্য উৎপাদিত হয় তাতে ২৬২ কোটি মানুষের আহারের সংস্থান অনায়াসে হতে পারে। ভারতবর্ষের সম্পদ অনেক, লোকবলও অনেক। পশ্চিমবঙ্গ এই দেশেরই অঙ্গ। এত দুর্গতির কারণ, গোটা ভারতবর্ষের মতোই পশ্চিমবঙ্গের আর্থ-সামাজিক বিন্যাস। অর্থের, সামাজিক মর্যাদার এই বিন্যাসের দিকে তাকিয়েই সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য

থেকে শুরু করে শিক্ষা, বাসস্থান, পরিবহণ, এমনকি আমোদপ্রমোদ পর্যন্ত সবই বিন্যস্ত হয়ে গেছে দুটি বড়ো ভাগে—সম্পন্নদের জন্য, আর হাভাতেদের জন্য। যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে হাভাতেই বেশি, তাই এ রাজ্যের চেহারাও এত রুগ্ণ, শীর্ণ।

প্রতিবেশী বাংলাদেশের কথা এই প্রসঙ্গে কিছুটা বলা যায়। সেদেশ ওষুধের ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতার পথে অনেকটাই অগ্রসর হয়েছে। ওখানকার 'গণস্বাস্থ্য সংস্থা' সরকারি অনুমোদনক্রমে অ্যালোপ্যাথিক সমস্ত ওষুধ নিজেরাই প্রস্তুত করছেন। পশ্চিমী ওষুধ থেকে তার দামও কম। বিদেশী এবং জাতীয় বিভিন্ন পদ্ধতির সমন্বয় করে এঁরা নিজ দেশের উপযুক্ত নতুন এক চিকিৎসাপদ্ধতি গড়ে তুলছেন। শ্রীলঙ্কাতেও এ ধরনের উদ্যোগ আছে।

আমাদের চোখের সামনে দীর্ঘদিন ধরেই এই-সমস্ত উদাহরণ রয়েছে। তথাপি পশ্চিমবঙ্গের ওষুধশিল্প বিদেশনির্ভর—এই ক্ষেত্র দখল করে আছে বিদেশী কোমপানিগুলি।

একপেশে চিকিৎসা

এখন ওষুধ বলতে বোঝায় অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ। এটা এদেশে বিদেশীরা আমদানি করে। তার আগে থেকেই এদেশে কবিরাজি, ভেষজ-চিকিৎসা, ইউনানি, হাকিমি, যোগাসন ইত্যাদি প্রচলিত ছিল। গ্রামের সাধারণ মানুষও এসব জানত—ঘরে-ঘরে ভেষজগুণসম্পন্ন নানা গাছগাছড়া লাগানো থাকত। ইংরেজ শাসনে এবং তারও পরে স্বাধীন দেশেও বিদেশী প্রভাব এত বেশি প্রাধান্য পায় যে, দেশীয় এইসব চিকিৎসা কোথায় তলিয়ে গেছে। এইসব গাছগাছড়ার রোগনিরাময়ের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বা পদ্ধতি কারোরই জানা নেই—কারণ, সেসবের চর্চাই নেই।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কমিউনিটি হেলথ ওয়ারকারের মেডিক্যাল কিটে নাকি অর্থের অভাবে প্রয়োজনীয় ওষুধ থাকে না। কিন্তু এইসব ভেষজগুণসম্পন্ন উদ্ভিদকে কাজে লাগাবার কোনো উদ্যোগই নেই। ম্যাসাজ, ফিজিওথেরাপি, আকুপাংচার ইত্যাদির ব্যবহার অত্যন্ত সীমিত। ম্যাগনেটোথেরাপি, হাইড্রোথেরাপি এবং আরও কিছু আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতি এ রাজ্যে সম্ভবত পদার্পণই করে নি।

মেডিক্যাল শিক্ষাতেও বিস্তর গলদ। ছাত্রেরা ইংল্যানড-আমেরিকার অসুখ-বিসুখ যত শেখে, সেখানকার চিকিৎসাপদ্ধতি যত শেখে, দেশেরটা তত শেখে না। তার ফলে, নিঃসম্বল স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তার মতো করুণ, বিপর্যস্ত অবস্থা আর কারো হয় না। আবার, একমাত্র জীবিকার উদ্দেশ্যেই যেখানে পড়া, সেখানে মর্মবস্তুর থেকে ডিগ্রীটাই প্রধান, চাকরি বজায় রাখাটাই প্রধান। সুস্থ প্রতিযোগিতাও নেই, জনস্বার্থরক্ষার কোনো আদর্শও সামনে নেই।

সম্প্রতি রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী অম্বরীষ মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে, এখানকার মেডিক্যাল কোরস সাধারণ মানুষের চিকিৎসার প্রয়োজন মেটানোর উপযোগী নয়। এটিকে আরো সরল আর প্রয়োজনভিত্তিক করা দরকার। এক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত প্রয়োজনভিত্তিক শিক্ষা, তারপর অভিজ্ঞতা অর্জন, আবার শিক্ষা, আবার অভিজ্ঞতা অর্জন—এইভাবে ধাপে-ধাপে শিক্ষার অগ্রগতি ঘটানো অথবা উচ্চতর জ্ঞানের স্তরে ওঠার পদ্ধতিটি একটি সম্ভাব্য শিক্ষাপদ্ধতি হতে পারে। এই পদ্ধতি শুধু ডাকতারি ছাত্রদেরই নয়, কমিউনিটি হেলথ ওয়ারকার এবং মালটিপারপাস হেলথ ওয়ারকারদের ক্ষেত্রেও গ্রহণ করলে জনস্বাস্থ্যব্যবস্থার অগ্রগতি ঘটানো সম্ভব বলে মনে হয়। গ্রামাঞ্চলে ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকার ফলে সমন্বিত চিকিৎসার ক্ষেত্রেও এঁরা ভালো কাজ করতে পারেন। সম্প্রতি অবশ্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকে স্বীকৃতি দিয়ে হাসপাতালে পোসটিং দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সেখানে কি তাঁরা ওষুধ প্রয়োগ আর গবেষণা করার উপযুক্ত সুযোগ পাচ্ছেন?

এখন যে গুরুতর প্রশ্নটি সবশেষে উঠে আসছে, তা হল এই :

পশ্চিমবঙ্গে একটি জনস্বাস্থ্যব্যবস্থা আছে, জনসাধারণ তার জন্য কর দেন, স্বাস্থ্য খাতে এ বছর (১৯৮৫-৮৬) ব্যয়বরাদ্দ ২০২ কোটি টাকা, তবুও জনস্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছে কেন? এবং, ব্যবস্থাগুলিও কোনো সময়েই পূর্ণমাত্রায় কার্যকর থাকছে না কেন? এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও মনে করেন, "এই অবস্থার মধ্যেও

স্বাস্থ্যদপ্তর তৎপর হলে বেশ কিছু কাজ করা যায়।" ('বর্তমান', ৮-৮-১৯৮৫)।

আসলে, এর কারণ হল, সমস্ত স্তরে ব্যাপক জনস্বার্থ সম্বন্ধে ঔদাসীন্য। তবে, ব্যাপক জনস্বার্থ সম্বন্ধে ঔদাসীন্য থাকলেও সমাজের অতিক্ষুদ্র একটি অংশ কিন্তু এরই ফাঁক দিয়ে সুযোগ-সুবিধার নির্যাসটুকু ভোগ করে যাচ্ছে।

সমগ্র চিত্রটি অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। সাধারণ মানুষ যদি চান তবে তাঁরাই এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারেন। তাঁদের সচেতনতাই আসল কথা।

পাঠকের দৃষ্টিতে

বর্তমান সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গের জনস্বাস্থ্যসেবা সম্বন্ধে একটি রচনা প্রকাশ করা হল। যাঁরা এই রাজ্যে জনস্বাস্থ্যসেবার কাজে কর্মী হিসাবে নানা স্তরে কর্মনিরত, আর যাঁরা এই সেবা গ্রহণ করেন, তাঁদের কাছ থেকে আমরা মতামত আহ্বান করছি। শব্দসংখ্যার সীমা ৬০০। রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৮৫। সাধ্যমতো রচনামূল্য দেওয়া হয়।

পোকামাকড়ের ঘরবসতি

সেলিনা হোসেন

জুলেখার ঘটনার জের কমে এলেই মালেক সেনট মারটিন পালিয়ে আসে। আরো আগেই আসত, কিন্তু বসির আলিকে হাজার প্রশ্নের সামনে রেখে আসতে মন চায় নি। ও চেয়েছে ওই ব্যর্থ লোকটির দুঃখ এবং অবমাননার সংগী হতে। মানুষের হাজারো প্রশ্নের উত্তরে বসির আলি বোবার মতো তাকিয়ে থেকেছে। শুধু এইটুকু মেনে নিতে অনেকের বাধে। তারা আরো কিছু শুনতে চায়—কিছুটা রসালো, কিছুটা মুখরোচক। কিন্তু বাড়তি কথা কে বলবে? বসির আলি বোবা, মালেক নিরুপায়। সাত দিনের মাথায় ও সেনট মারটিনে আসে। নিজের ভাগ্যের ওপর প্রসন্ন হয় যে জিঞ্জিরায় সালেকের সংগে দেখা হয় নি। মুখে-মুখে জুলেখার খবর ছড়িয়েছে, অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। ও কেয়াঝোপের কাছাকাছি ওসমানের ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। ভাগ্যিস ওসমানের বউ গেছে বাপের বাড়ি। ওসমান বিগলিত হাসে।

—মালেক ভাই, আপনের যতদিন খুশি থাকান।

মালেক ওকে চাল-ডাল কেনার টাকা দেয়। ওসমান অনেক দিন পরে মালেকের টাকায় একটা বড়ো ইলিশ কিনে আনে। ওর চকচকে দৃষ্টিতে খুশির বন্যা। বঁটিতে কচকচিয়ে মাছ কাটে, গুনগুনিয়ে গান গায়। মালেক ঘোরাঘুরির জন্যে বেরিয়ে পড়ে। দ্বীপের দক্ষিণপাড়ায় বসতি কম, ওসমানের ঘর একদম বিচ্ছিন্ন। ওর পানের বরোজ আছে। পান বেচে সংসার চালায়। চার ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার। বড়ো ছেলেটা গনি মিয়ার ধানখেতে কাজ করে, মৌসুম শেষ হলে ট্রলারে সাগরে যায়। দ্বীপের মাঝখানে, বিশেষ করে পশ্চিম দিকে কিছু জমি বের করেছে গনি মিয়া। সেখানে আমন আর ইরি লাগায়। বছরের খোরাক হয় তার। মালেক হাঁটতে-হাঁটতে অনেক দূরে আসে। চৌধুরীসাহেবের কথা মনে হয়। তিনি সুন্দর কথা বলতেন। সব কাজের কথা। সপ্তের লোকদের বলেছিলেন, দ্বীপের ভিত হল শিলা। উপরেও শিলা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। এগুলো দ্বীপের লোমকূপের মতো, শরীরের সংগে মিশে আছে। এগুলো সরিয়ে খেতের জন্যে জমি বের না করে, মাঝে-মাঝে নারকেলগাছ লাগিয়ে দিলে দ্বীপের গঠন-কাঠামো ঠিক থাকবে। নারকেলগাছ মালেকের খুব প্রিয়। দ্বীপ জুড়ে এ গাছের সবুজ শাখা আকাশসমান উঁচু হয়ে উঠলে কী যে চমৎকার হবে! সেই সবুজের মাথায় জোনাকির কুচি-

কুঁচি আলো মালেককে স্বপ্নের দেশে নিয়ে যায়। কল্পনায় কোনো কিছু পরিষ্কার এসে গেলে ওর ভারি আনন্দ—নিজের ওপর আস্থা বেড়ে যায়। পরক্ষণে মনে হয়, পাথর সরিয়ে যে চাষের জমি হয়েছে—এটা কি তাহলে সেই দ্বীপের শরীরে ক্ষত? এই ঘা আস্তে-আস্তে বাড়লে কি দ্বীপের মৃত্যু অনিবার্য? ওর মন খারাপ হয়ে যায়। সবাই তো নিজের কথা ভাবে, এইসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না। আস্তে-আস্তে এই ক্ষত বাড়তে-বাড়তে বিশাল হয়ে একদিন হয়তো সাংঘাতিক বিপর্যয় হবে। ও নোনাবনের কাছে এসে থামে। এগুলো সুন্দর-বনে নোনাগাছের মতো, তবে আকারে ছোটো। ও নোনাবন ছাড়িয়ে অগভীর পানির কাছে এসে দাঁড়ায়। লতাগুল্ম আর শ্যাওলায় ভরে আছে জায়গাটা। পানিতে পা ডোবালে মমতায় আঁকড়ে ধরে। লাল, নীল, সবুজ, বাদামি—নানা রঙের অ্যালজী জন্মায়। তাকিয়ে থাকলে চোখ জুড়িয়ে যায়। দ্বীপের যেসব জায়গায় মানুষ হাত দিয়েছে, সেখানে পরিবেশ নষ্ট হয়েছে। কোনো পরি-কল্পনা নেই বলে যেমন-তেমন এর ব্যবহার। যার যেমন খুশি, যার যত ক্ষমতা। চৌধুরীসাহেব সেই যে গেলেন, আর এলেন না। যিনি এত ভাবেন তাঁর কেন কিছু করার ক্ষমতা থাকে না? তিনি কেন ভালো-ভালো কথা-গুলো কাজে লাগান না? মালেকের মতো একটা সাধারণ মানুষের বুকে স্বপ্নের বীজ বুনে যন্ত্রণা বাড়ান কেবল।

আসলে, ও তো জানে, এই দ্বীপকে ভালোবেসে ও কিছু করতে পারবে না; কিছু করার নেই। ও আস্তে-আস্তে বুড়ো হবে, বছরের পর বছর পানের বরজ থাকবে, তরমুজে হবে, গুচ্ছিপেঁয়াজ বেড়ে উঠবে। প্রবালফুলে ভালো করে না ফুটতেই কেটে নিয়ে যাবে লোকেরা। কমে যাবে পাখি, জীবজন্তু। সব কি নিঃশেষ হবে? হয়তো না। আবার তো নতুন জন্ম আছে। বীজ আছে। যতই কাটুক—কেয়াঝোপের বিস্তার আছে। শুধু মানুষ বেড়ে গেলে বদলে যায় পরিবেশ। যেমন ওর দেখা দ্বীপের পুবদিকের সাগর আর আগের মতো নেই। ওই জায়গায় সাগর ছিল শান্ত, প্রচুর জলজ উদ্ভিদ জন্মত সেখানে। আস্তে-আস্তে গুল্ম কমে যাচ্ছে, সাগরের জীবজন্তু, পোকামাকড় কমে যাচ্ছে। নৌকো ট্রলার চলাচল করে এখন এদিকটায়। ফলে সারাক্ষণ পানি হয় আলোড়িত। ট্রলারের তেলে পানির রঙ যায় বদলে। সবটা মিলিয়ে কেমন দূষিত মনে হয় মালেকের কাছে। ও এখন আর এদিকটায় আসে না। ওর প্রিয় জায়গা-গুলো কি এমন করে হারিয়ে যাবে? ও বালির ওপর পা ছড়িয়ে বসে আঁকিবুঁকি কাটে। ড. চৌধুরী বলে-ছিলেন, এই দ্বীপ আমাদের দেশের এক অমূল্য সম্পদ। বাতাসে ভেসে আসে কতগুলো কথা—যেগুলো ও ড. চৌধুরীর ভারি কণ্ঠে শুনেছে, কিন্তু বোঝে নি। যে কথার অর্থ বুঝতে ওর মতো একজনের কয়েক পুরুষ কেটে যাবে। সেই কথাগুলো ছড়িয়ে আছে সাগরের ঢেউয়ে, শিলায়, কবুইলা পাহাড়ে, নোনাবনে, কেয়া-ঝোপে। ড. চৌধুরী বলেছিলেন, "ভূ-বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, মৃত্তিকা, উদ্ভিদ, জীববিজ্ঞান, আবহাওয়া আর জলবায়ু, সমুদ্র আর পরিবেশ—বিজ্ঞানের প্রতিটি বিষয়বস্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গবেষণা করার মতো এমন উপযুক্ত স্থান পৃথিবীতে খুব বেশি আছে বলে আমার জানা নেই।" এত যার মূল্য, তার কদর হয় না কেন? আসলে সরকার বোঝে না। সরকারই যদি না বোঝে, ও কোন্ ছার? কত কিছুই তো এখানে বুঝতে একপুরুষ কেটে যায়। ওর সমিতি নিয়ে ও মানুষের ঘরে-ঘরে যাবে। বোঝাবে মাটির কদর, মানুষের কদর। পরক্ষণে ওর হাসি পায়—বুকফাটা হাসি। আশেপাশের যে মানুষগুলোর হৃদয় কেটে ওর পথ করে এগুতে হচ্ছে, তারা কি সহজে ছেড়ে দেবে? বেশি হাসলে ওর চোখে জল আসে। ও হাতের উলটো পিঠে চোখ মোছে। তখন শুনতে পায় ওসমান ওকে ডাকছে, দৌড়তে-দৌড়তে আসছে। ও চুপ-চাপ বসেই থাকে। ধরে নেয় যে ওসমানের ইলিশমাছ রান্না হয়েছে, তাই ওকে ডাকছে। কাছে এসে বালির ওপর ধপ করে সে বসে পড়ে।

—আঁই আপনারে গোডা দুনিয়ারে খুঁজির।

—ক্যান, কী হইয়ে?

—সালেক খুন কইরগে!

—খুন?

—হ, মিডা পানির লাই মারামারি! সালেক এ বালটি লইয়ে, আরো এক বালটি লইতে চাইল। গতরের জোর আর কী! এখন তো আবার মাতবরের জামাই।

—মারিল কারে?

—হামিদ মিয়ারে। হামিদ আছিল লাইনে তার পিছে। হামিদ মিয়া কইল, তুই এক বালটি লইয়ো, আর

ন পাইবা। বাস, কইজ্যা শুরু হই গ্যাল গই। এক সময় সালেক বালটি দি হামিদ মিয়ার মাথায় বাড়ি দিল। বড়ো বাড়িত তার মাথা ফাডিয়ারে দুই ফাঁক হই গ্যাল গই। রক্ত, রক্ত! মাগো, আঁর মাথা ক্যান করেরে। মানষের চিল্লামিল্লি, ছুড়াছুড়ি, সালেকেরে মারিয়ারে কিছু ন রাখে। পুলিশ আসি সালেকেরে বান্ধি লই গিয়ে।

ওসমানের কথা কিছু শোনে না মালেক। কেবলই মনে হয়, সালেক তো আরো একটা খুন করেছে। জুলে-খার আত্মহত্যার জন্যেও তো ও দায়ী। শুধু দুই খুনের পদ্ধতি ভিন্ন। একটা সরাসরি, অন্যটা ঘুরপ্যাঁচের।

—ন যাইবেন, মালেক ভাই?

মালেক মাথা নাড়ে।

—না? যাইবেন না?

ওসমানের বিস্ময় কাটে না। আপন ভায়ের এত বড়ো একটা খবরে মালেক একটুও বিচলিত হয় না দেখে ওসমানের বাকরোধ হয়ে যায়।

—যারা খুন করে হিতারা কি মানুষ, ওসমান মিয়া? ভাই হোক আর বাপ হোক, আঁর কাছে খুনীর মাপ নাই।

মালেকের কথায় ওসমান বেশ কিছুটা স্বস্তি পায়। ওর সামনে নিজের বিরূপ প্রতিক্রিয়া এতক্ষণ ব্যক্ত করতে পারছিল না। কিছুটা খুশির স্বরে বলে, আপনের কথাই ঠিক, মালেক ভাই। সালেক বাড়িলরে বেশি। গনি মিয়ার জামাই হইয়ে রোয়াব দেখায় কেবল। জিঞ্জিরার কেউ ওরে ন দেখিবার পারে। ও আপনের আপন ভাই, তা বিশ্বাস ন হইতে চায়। মাগো, আতো তফাত। ওসমান মিয়া অকপটে নিজের কথা বলে যায়। একঝলক ঠান্ডা বাতাস যেন এতক্ষণে ওর ফুসফুস জুড়িয়ে দিল।

—দিনের বেলাত মাইনষের সামনে অগ্যা খুন করনের পরও সালেকের কিছু ন হইব, ওসমান মিয়া।

—ক্যা, পুলিশ তো বান্ধি লই গিয়ে?

—বান্ধি লই গেলে কী হইব? গনি মিয়ার টেয়া ন আছে? টেয়া দি ব্যাক খুন হজম করি ফালাইব।

—ঠিক কইয়াচ? ওসমানের উত্তেজনা বাড়ে। বালুর ওপর পা আছড়ায়।

—হামিদ মিয়ার বিচার গনি মিয়ার টেয়ার তলে চাপা পড়ি যাইব।

—হ, ঠিক।

মালেক ওসমানের ঘাড়ে হাত রাখে।

—চ, ওসমান মিয়া, সালেকের লাই গনি মিয়া যত টেয়া খরচ করিব, ইয়ুন দি এই জিঞ্জিরাত দশউয়া টিউব-ওয়েল বসান যায়। মিডা পানির সুবিধা হয়। কিন্তু গনি মিয়া ন করিব।

—ক্যা ন করে, মালেকভাই?

—মানষের লাই ভালোবাসা নাই। ব্যাগুনে যে নিজর-নিজর হিসাব করের। ভাবি চ, এই সেনট মারটিনত মিডা পানির কত অভাব?

—ঠিকই। এক-কলস মিডা পানির লাই কত যে কষ্ট করন লাগের। কইজ্যা, মারামারি তো লাগিই রইয়ে।

সাগরে সন্ধ্যা নামে। বিশাল জলরাশি মালেকের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তবু দুবলার চরে পানি নেই, কাদামাখা পানি খেয়ে ডায়রিয়া হয়। সেনট মারটিনে পানির জন্যে মানুষ খুন হয়ে যায়। সালেকের মতো দাপটঅলা লোকেরা নিজ দখলে সব পানি নিয়ে যেতে চায়। কী আশ্চর্য নিয়ম!

—চলেন ওসমান মিয়া, হামিদ মিয়ার বাড়িত যাই।

—চলেন। বউ ছিবার যে কী হইব!

—হামিদ মিয়ার তো পোয়া-ছা নাই?

—না।

—লাশ পুলিশ লই গিয়ে না?

—হ।

আর কথা নেই। দুজনে অন্ধকারে পথ চলে। আকাশে জ্যোৎস্না। আলো-আঁধারিতে নোনাবন ছবির মতো মনোরম। মুহূর্তে সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায় মালেকের। এই আত্মহত্যা, খুন, ঝগড়া, মারামারি—সব-কিছুর বাইরে এই বয়োবাওয়া দিনগুলো বড়ো সুন্দর। এখনো জ্যোৎস্নায় ভরে থাকে প্রান্তর, কেয়াফুলের গন্ধ মিশে থাকে বাতাসে, নোনা পানির ঢেউ এসে গাড়িয়ে পড়ে পায়ে। মানুষ এসব আপন করে নিতে পারে না, ক্ষুদ্র গন্ডিতে আটকে থেকে খুন করে, নিজের উদর ভরে। এই গন্ডিটা ভেঙে ফেলতে হবে। মানুষকে জ্যোৎস্নার কাছাকাছি, ফুলের সুবাসের কাছাকাছি নিয়ে যেতে হবে। মানুষের হৃদয়টাকে দিগন্তের মতো বিস্তৃত করে দিতে হবে। ও ওসমানের হাত চেপে ধরে।

—ওসমান মিয়া। তুই আঁর লগে যাইবা না?

—যাইয়াম।

—আই যা কইয়াম হুনিবা না?

—হুইনাম।

—তাইলে ওসমান মিয়া, আঁই তোঁয়ারার নান হাজার মানষের লাই জান দিয়াম।

ও ওসমানের হাত ছাড়ে না। ওসমান মিয়া কোনো কিছু না বুঝেই মালেকের হাত আঁকড়ে ধরে।

দুই প্রতিপক্ষ এখন সামনাসামনি। সুজা তোরাব আলীর সামনে মাথা সোজা রাখে, চোখ নামায় না। ও জানে, এক পা পিছোলেই তোরাব আলী ওর ঘাড় মটকে ধরবে। যুদ্ধে যখন নেমেছে, যুদ্ধ সমানে-সমানেই করবে। প্রতিদিন যাওয়া-আসা হয়, কিন্তু তোরাব আলী এখনো কিছু বলে নি। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, বোঝাতে চায় যে আমি সব জানি। সুজা অপেক্ষা করে। কদিন ধরে দেশি নৌকা দিয়ে মাছ ধরে আনে, শুটকি হয় বদরমোকামে, সুজা মাছ নামিয়ে দিয়ে আসে। বাদল এখনো কক্সবাজার থেকে ফেরে নি। ও ফিরলে একটা হেস্তনেস্ত করবে তোরাব আলী, কথা এবং আচরণেই তা প্রকাশ পায়। এক বাদলের কথাতেই কি তা প্রমাণ হবে? সুজা বুঝতে পারে না। একদিন সন্ধ্যায় বদরমোকাম থেকে চলে যায় টেকনাফ। মনসুর আলীর মন দশেক বার্মা-থেকে-আনা চোরাই সুপারি পেঁাছে দিতে হবে নদীর মাঝখানে রাখা সাম্পানে। চুক্তি আগেই করা হয়েছিল। টাকা ভালোই পাওয়া যাবে, তবে ঝামেলা অনেক। জল-পুলিশের চোখে পড়লে রক্ষা নেই। আগে এসব কাজে সাহস করে নি। এখন ভয় করে না, বেপরোয়া হয়ে ওঠাই জীবনের ধর্ম বলে মনে হয়। সঙ্গে রজব আছে, ওর উৎসাহ আরো প্রবল। নিঃশব্দে নৌকা এনে বাজারের কাছে নির্দিষ্ট জায়গায় থামে। তৈরি হয়ে ছিল মনসুর আলীর লোক। চটপট মাল উঠে যায় নৌকায়। কোথাও কোনো কালক্ষেপণ নেই। আধঘন্টার মধ্যে ওরা আবার নদীতে ভাসে। সাম্পানের কাছে পেঁাছতে ঘন্টা তিনেক সময় লাগবে। সুজা দাঁড় বায়, রজব হাল ধরে আছে। নাসির সুপারির বস্তার ওপর পা উঠিয়ে আধা-শোওয়া অবস্থায় কাত হয়ে আছে। মাত্র দু বস্তা পাটাতনে, বাকিগুলো পাটাতনের নীচে। স্রোতের বিপরীতে যেতে হচ্ছে বলে নৌকো বাইতে কষ্ট হয় ওদের, সময়ও লাগে বেশি। মনসুর আলীর বিশ্বাসী লোক নাসির। চুটিয়ে গল্প করছে ওদের সঙ্গে। এই ধরনের কাজ প্রচুর করেছে, কখনো ধরা পড়ে নি। পুলিশের সামনে অনেকবার পড়েছে, পালাতেও পেরেছে। একবার নদীতে লাফ দিয়ে পড়েছিল। কতক্ষণ সাঁতার কেটেছিল মনে নেই। জ্ঞান হবার পর দেখেছিল, নদীর কিনারে পড়ে আছে। সারাদিন অপেক্ষা করার পর এক মালবাহী নৌকো ওকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। সম্ভব-অসম্ভব নানা ধরনের গল্প সুন্দর বর্ণনায় বলে যায় নাসির। সব ওদের বিশ্বাস হয় না, কিন্তু শুনতে ভালো লাগে। স্নায়ুর ওপর চাপ পড়ে না, নৌকা বাওয়ার ক্লান্তি জুড়িয়ে যায়। নদী ভয়ানক শান্ত। সুজার মনের মধ্যে হাজার চিন্তা তোলপাড় করে, ও বারবার একপাশে ঠেলে দেয়। নাসির বস্তার ওপর মাথা রেখে চিত হয়ে শুয়ে আছে। এখন আর কথা নেই। নৌকার ওপর পাশ থেকে রজব ডাকে :

—সুজাভাই?

—কী?

—বাদইল্যা ক'ত্তে ফিরিব?

—ন জানি তো।

—কতবার কই কক্সবাজার যাই, কিন্তু তু'ই যাইত না দিলা।

—যাইয়ারে কী হইব?

—বাদইল্যারে জিগ্যাইতাম।

—কাম নাই। আঁরা তিনজনে ঠিক থাইলেই হয়। মাথা ঠিক রাইবি রজব।

—ক'ত্তে যে মাথার কী হয়! রজব দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

—বাদইল্যা যে এত সহজে...

—তোর মা ক্যা আছে রে?

—ভালাই তো।

হঠাৎ করে সুজার অন্য প্রসঙ্গে রজব থতমত খেয়ে যায়। পরক্ষণে বুঝে ফেলে যে নাসিরের সামনে এই প্রসঙ্গ আলোচনা করতে চায় না। একটু পরেই নাসিরের নাকডাকার শব্দ আসে। চোরা সুপারি পার করার দায়িত্ব নিয়েও ও পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে গেছে। সুজার মাথার ভেতর কিছু থাকলে ওর ঘুম আসে না। সেইসব দিনগুলো খুব কষ্টে কাটে ওর। আসলে নাসিরের গল্পের কথাই ঠিক, এইসব ব্যাপারে ও অভ্যস্ত, হয়ে গেছে। রজব আবার ডাকে :

—সুজাভাই?

—চুপ।

—ক্যা?

তখন তাঁর আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যায় রজবের। জল-পুলিশ ট্রলার থেকে সারচলাইট মারছে। ট্রলারটা তখনো বেশ দূরে।

—সুজাভাই?

—চুপচাপ নৌকা বাই যা। চাই কী হয়।

ততক্ষণে নাসির জেগে গেছে। ঘন-ঘন আলো পড়ছে নৌকায়।

—অ মা, পুলিশ!

—কী করিবা তু'ই?

—কাছে যদি আইয়ে ফাল মাইরগাম নদীত।

—মরিবা না?

—যা আছত কয়ালত।

—তু'ই নৌকাত বই য। আঁই বুদ্ধি বাইর করির।

—কী?

—যদি পুলিশ জিগ্যায় মাল কার তইলে কইয়াম তোরাব আলীর।

—হাছা, সুজা মিয়া?

—একদম হাছা। এ ছাড়া বাঁচনের পথ নাই। নৌকা তোরাব আলীর, পুলিশের লগে হিতে বুঝিব। কইয়াম আঁরারে মাল পেঁাছাইতে কইয়ে, আঁরা পেঁাছাইর। আর কিছু ন জানি। কেউ অগ্যা কথা ন কইবা। ব্যাক আঁই কইয়াম।

সুজার দৃঢ় কণ্ঠে নাসির আশ্বস্ত হলেও ওর হাঁটু কাঁপে ঠকঠক করে।

—অ্যাতো ডরাইল্যা তু'ই?

—পুলিশরে ডর লাগে। যদি পিডায়। পিডুনি সইতে ন পারি যে?

ততক্ষণে জল-পুলিশের ট্রলার পাশে এসে থামে।

—ওই, কডে যার নৌকা?

—কক্সবাজার।

—কী মাল?

—সুয়ারি।

লাফিয়ে একজন নৌকায় নামে। সরাসরি পাটাতন উলটিয়ে দেখে।

—বজজি। কার মাল?

—তোরাব আলীর।

—ও, থানাত চলো।

নাসিরের কাঁপুনি থামে না, ভয়ে অস্থির। সুজা নৌকা ঘোরায়। সামনে রাত্রির অন্ধকারের মতো অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, তার বুকে কাঁপুনি নেই। এখন এমনই শক্ত হয়ে গেছে। যে কোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে তৈরি করতে পারে। ঘাবড়ায় না, সাহস হারায় না, অবলীলায় বুদ্ধির জাল বোনা হয়ে যায়। ওর নিশ্চিত ধারণায় নৌকার জন্যে তোরাব আলী পুলিশের সঙ্গে আপোস করবে, বড়ো বিপদ এড়ানোর জন্যে ওদেরকেও ছাড়াবে। ওরা তো কর্মচারী, হুকুমের দাস। শুধু চোরাচালানিতে তোরাব আলীকে পাঁচে জড়ানোর উপায় ও জানে। আনোয়ারা, গহিরায় কয়েক বারই যেতে হয়েছে ওকে। অল্পে ছেড়ে দেবে না তোরাব আলীকে। পুলিশ একজন জিজ্ঞেস করে, এই ব্যাবসা কদিনের?

—আঁই এই পইলা হুজুর। হুজুর মা-বাপ, আঁই আর কিছু ন জানি।

সুজার অনুনয়ের স্বর রজবকে বিস্মিত করে। পাকা খেলোয়াড় একদম। ভাটি পেয়ে নৌকো তরতরিয়ে বয়ে যায়। পুলিশ নাসিরকে খোঁচা দেয়।

—সিগারেট দে?

নাসির প্যাকেটসহ দিয়ে দেয়। ও এখন নৌকার ওপর রাজার ভঙ্গিতে নেই, জড়োসড়ো হয়ে গুটিয়ে বসেছে। কথা একদম বন্ধ। ট্রলার ভটভটিয়ে চলে গেছে আগে, তাই আশেপাশে তার কোনো শব্দ নেই। শুধু নদীর শরীর কলকলায়।

[ক্রমশ

তালীক মানুষ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

এক বোন অপর বোনের অবিকল প্রতিবিম্ব যেন। শফি ভাবছিল, কে রোজি আর কে রুকু, সেটা আয়মনি চিনতে পারে কী ভাবে? দুজনের পরনে একই রঙের তাঁতের শাড়ি, এবং তারা জামাও পরেছে একই রঙের। স্নান করে ওদের মুখের রঙে চেকনাই ফুটেছে বলেও নয়, দুই বোনের গায়ের রঙ ফরসা। সাইদা বেগমের মতো ফ্যাকাসে ফরশা নয়, একটু লালচে। চাষীবাড়ির মেয়েদের গায়ে কখনও জামা দ্যাখে নি শফি। তা ছাড়া চাষীবাড়ির মেয়েদের গলার স্বরের সেই রুক্ষতাটাও রোজি-রুকুর গলার স্বরে নেই। শফির সন্দেহ জাগছিল এতক্ষণে, এরা নিশ্চয় মিয়াবাড়ির মেয়ে।

কিন্তু মিয়াবাড়ির শাড়িপরা মেয়েরা দীঘির ঘাটে স্নান করতে বা জল আনতে যাবে, এটাও ভাবা যায় না। শফি ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিল।

এদিকে রুকু অনর্গল কথা বলছিল। সে জানতে চাইছিল কিছু। আয়মনি ভাত খেয়ে রোজিকে নিয়ে এ বারান্দায় এলে শফির আড়ষ্টতা কেটে গেল। আর সেই সময় রুকু আয়মনিকে বলল, তোমাদের পিরসায়েবের ছেলে বোবা, আয়মনি খালা। রুকু হাসতে লাগল। একটা কথারও জবাব দেয় না। খালি হাঁ করে তাকিয়ে থাকে যে!

আয়মনি বারান্দার মেঝেয় পা ছড়িয়ে বসে পানের বাটা থেকে পান সাজতে থাকল। তার ঠোঁটের কোনায় চাপা হাসি। রোজি রুকুর পাশে বসে বলল, পিরসায়েবের ছেলে আমাদের ওপর রেগে কাঁই হয়ে আছে।

আয়মনি বলল, ক্যানে?

তখন ঘাটে সেই ছড়াটা বলেছিলাম। 'ফরাজিদের নমাজ পড়া/ঢেঁকির মতন...'

রুকু রোজির মুখ চেপে ধরে বলল, বড্ড বেহায়া তুই! আবার কেন রাগাচ্ছিস ওকে?

আয়মনি সন্দিগ্ধদৃষ্টে তাকালে শফি এতক্ষণে একটু হাসল। আস্তে বলল, এবার কিন্তু তোমাদেরই ঢেঁকির মতন মাথা নাড়তে হবে। আমার পাল্লায় পড়েছ, দেখবে কী হয়?

রুকু দ্রুত বলল, কী হবে বলো তো?

রোজি বলল, আমি বলছি শোন্ না। আর কেউ বেরুতে পারব না বাড়ি থেকে। সবচেয়ে বিপদ হবে আয়মনি খালার।

আয়মনি পান গালে ঢুকিয়ে বলল, আমার কিছু হবে না। তোমরা নিজেদেরটা সামলে চলো। এই যে হুট করতেই দুজনে বেরিয়ে পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরে বেড়াও, বড়োবাড়ির মেয়ে সব—বিয়ে দিলে অ্যাদ্দিন ছেলেপুলের মা হয়ে যেতে! সে কপট ভর্ৎসনার ভঙ্গিতে চোখ পাকিয়ে ফের বলল, তোমাদের পায়ে বেড়ি পরাতে বলছি দরি-বুবুকে। থামো একটু!

রুকু ঠোঁট বাঁকা করে বলল, ইশ! অত সোজা! আমি ফরাজি হবোই না!

রোজি বলল, শুনলি না? সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাড়ি আসবেন পিরসায়েব। সব মেয়েকে তওবা করাবেন।

তার মানে? রুকু হকচকিয়ে গেল। সে শফির দিকে ঘুরল। এই ছেলেটা, বলো না তওবা জিনিসটা কী?

ব্যাপারটা আয়মনি বুঝিয়ে দিল। সে তার শ্বশুরে-গাঁয়ে একবার মেয়েদের তওবা-অনুষ্ঠান দেখেছিল। পর্দার আড়ালে মেয়েরা মৌলবিসায়েবের পাগড়ির ডগাটা ধরে রেখেছিল। মৌলবিসায়েব একবার করে একটা কথা আওড়াচ্ছিলেন আর মেয়েরাও চাপা গলায় সেটা আওড়ে যাচ্ছিল। তবে সে মৌলবিসায়েব হানাফি মজহাবের। ফরাজি মজহাবে কী হয়, আয়মনির জানা নেই। আয়মনি গল্পটা খুব রসিয়ে বর্ণনা করে শফিকে বলল, তোমাদের মজহাবে কী হয় বলো না ভাই?

শফি বলল, একইরকম।

রোজি বলল, পিরসায়েব মেয়েদের মুখ চিনে রাখেন না?

শফি অবাক হয়ে বলল, না তো।

বা রে! মেয়েদের তওবা করিয়ে জনে-জনে ডেকে মুখ চিনে রাখবেন, তবে তো রোজ কেয়ামতের পর হাশরের ময়দানে পিরসায়েব ওদের মুরিদ বলে চিনতে পারবেন! তখন আল্লাকে আর নবিসায়েবকে বলবেন, এদের দোজখে নিয়ে যাবেন না যেন। এরা আমার মুরিদ।

শফি হাসল।...বাজে কথা। আব্বা শুনলে খেপে যাবেন।

কেন? তোমার আব্বাও তো পিরসায়েব।

রুকু রোজির কথার ওপর বলল, খয়রাজোলের পিরের থান ভেঙেছেন। পির কখনও পিরের থান ভাঙে?

রোজি অবিশ্বাসে মুখ বাঁকা করে বলল, বাজে কথা! হাত ঝলসে যাবে না থানে হাত দিলে?

শফি বলল, আব্বার হাত ঝলসায় নি।

আয়মনি কৌতুক করে বলল, মসজিদের জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে এসো না হাতখানা।

রোজি কথায় কান না করে বলল, এই তো হার্টতলার কাছে খোঁড়াপিরের থান আছে। একবার হাত দিয়ে দেখুক না কেউ। কাজিসায়েবের কী হয়েছিল মনে নেই? থান থেকে লুকিয়ে পয়সা তুলতে গিয়েছিল, বাস! একটা হাত নেতিয়ে গেল।

শফি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি থানে হাত দেব, চলো। দেখবে, আমার কিছু হবে না।

রোজি তার স্পর্ধা দেখে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। রুকু একটু হেসে বলল, তোমার কেন হবে? তুমি যে পিরসায়েবের ছেলে।

শফির গর্ববোধটা ফুলে উঠল। রুকুকে তার ভালো লাগছিল। এসেই বলেছে, তুমি কি রাগ করেছিলে—তখনই শফির তাকে ভালো লাগার শুরু। তার মনে মাঝেমাঝে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল সেই কথাটা। এখন আবার প্রতিধ্বনিত হতে থাকল। রুকুকে দীঘির ঘাটে তেজী মেয়ে মনে হয়েছিল। অথচ সে আসলে শান্ত, বুদ্ধিমতীও। শফি বসে পড়ল আবার।

কিন্তু নিজের স্মৃতি ও ধারণার সঙ্গে এই অভিজ্ঞতাটা সে মেলাতে পারছিল না। অনাত্মীয় মেয়েদের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সুযোগ তার কখনও হয় নি। সবখানে মৌলানা বদিউজ্জামানের ছেলেহিসেবে সে যেন একটা পর্দার অন্যপাশে থেকেছে। মৌলাহাটে ব্যাপারটা যেন অন্যরকম। এখানকার মেয়েরা বাইরে চলাফেরা করে, সেটা নতুন কিছু নয় তার কাছে। কিন্তু তার সঙ্গে মুখোমুখি মেয়েরা বসে কথা বলবে, তর্ক করবে, এটা বড্ড বেশি নতুন।

রোজি গুম হয়ে বসে ছিল। একটু পরে হঠাৎ উঠে চলে গেল। রুকু তাকে ভর্ৎসনার ভঙ্গীতে ডাকছিল। কিন্তু রোজি ফিরল না দেখে সে মুখটা একটু করুণ করে বলল, চলি আয়মনিখালা। তারপর শফির দিকে ঘুরে একটু হেসে বলল, চলি। রাতে আমাদের বাড়ি খেতে যাবে, তখন দেখা হবে।

আয়মনি বলল, জেয়াফৎ নাকি রে রুকু?

রুকু মাথাটা সামান্য দুলিয়ে চলে গেল। শফির মনে হল একটা আশ্চর্য আর সুন্দর স্বপ্ন দেখছিল এতক্ষণ। হঠাৎ সেটা ভেঙে গেল যেন। বাড়িটা একেবারে শূন্য আর আগের মতো রুক্ষ হয়ে পড়ল।

আয়মনি বলল, 'যামা' বোন তো! দুঘাঁড় আগে পরে জন্মো। আগে রোজি, তারপর রুকু। তাই একলা-একলা কেউ থাকতে পারে না। ওই যে রোজি বেরিয়ে গেল—তুমি ভাবছ, সে চলে গেছে? কক্ষনো না। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে কোথায়। রুকু যাবে, তবে তার সোয়াস্তি। কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে না।

শফি আনমনে বলল, ওরা কি মিয়াবাড়ির মেয়ে?

তুমি ঠিকই ধরেছ। আয়মনি হাসতে লাগল। তবে দো-আঁশলাও বলতে পারো।

দোআঁশলা মানে?

আয়মনি চাপাস্বরে বলল, ওদের বাপ ছিল মিয়া-সায়েব। মা আমার মতো চাষীবাড়ির মেয়ে। নানগাঁ-কনকপুরে বাড়ি। সেখানে ইস্কুল আছে। সেই ইস্কুলে পড়তে গিয়েছিল চৌধুরির ছেলে। পড়াটড়া ফেলে দরিবুবুকে নিয়ে চলে এসেছিল। সে অনেক খিটকেলের কথা। আমার তখন বয়স কম। সবকথা মনেও নাইকো। তাছাড়া তোমাকে বলিই বা কী করে?

শফি একটু চুপ করে থেকে বলল, ওরা বুঝি বড়লোক?

তা বলতে পারো। মৌলাহাটের মিয়া বলতে ওই দুঘর। চৌধুরিসায়েবরা আর কাজিসায়েবরা। কাজিরা ফতুর হয়ে গেছে। চৌধুরিরাও যেত। দরিবুবু চাষীর মেয়ে। মাটি চেনে কিনা। মাটির মর্ম বোঝে। দুহাতে আগলে রেখেছে।

রোজি-রুকুর আব্বা বেঁচে নেই?

না। আয়মনি পানের পিক ফেলে এসে বলল, ওরা এ তল্লাটের সেরা বড়লোক ছিল। বাপজির কাছে শুনেছি, মৌলাহাটের যে বানুকের আছে—মানে রেশমের কুঠি, তা জানো তো? সেই বানুকের মালিক ছিল ওরা। জোলা-দের দাদন দিত। আবার তাঁতও বসিয়েছিল। একশো তাঁত—সহজ কথা নয়কো। তুমি একবার ভেবে দ্যাখো ভাই, দিনরাত একশো তাঁতের একশো মাকু চলছে খটাখট্...খটাখট্...খটাখট্।

আয়মনি তাঁতের মাকু চালানোর ভঙ্গী করল। তবে সে সেইসব মাকুর শব্দও শোনে নি নিজের কানে। তখন তার জন্মও হয় নি। চৌধুরিদের রেশমের কারবার কীভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তখন মাঠের জমিজমাই ভরসা। রোজি-রুকুর বাবা তোফাজ্জেল হোসেন চৌধুরি ছিলেন খরচে আর শৌখিন মানুষ। বাউরিপাড়ায় গোপনে গিয়ে তাড়ি-মদ গিলতেন। দরিয়াবানু ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে আসত প্রকাশ্য রাস্তা দিয়ে। দুই বোনের জন্মের পর কে জানে কেন একটু শায়েস্তা হয়েছিলেন তোফা চৌধুরি। মসজিদের কাছে আবু ওস্তাজি নামে একটা ভবঘুরে লোক এসে মন্তর খুলেছিল। তার কাছেই দুই মেয়েকে পড়তে দিয়েছিলেন। তারপর হঠাৎ ওস্তাজি রাতারাতি কোথায় উধাও হয়ে যায়। আয়মনির মতে, আসলে ওস্তাজি লোকটা ছিল এক সাধক পুরুষ। কোন ছলে মৌলাহাটে চরতে এসেছিল আর কী!

আয়মনি মৌলাহাটের গল্প বলছিল। আর শফি ভাবছিল, মৌলাহাটে যদি তাদের থাকা হয়, তার ভালো লাগবে। কিন্তু আব্বাকে সে ভালোই জানে। যেখানে-সেখানে উনি ডেরা পাততে চাইবেন কি? সেকেন্ডায় যাব বলে সংসার নিয়ে রওনা দিয়েছেন। যতক্ষণ না সেখানে পেঁছান, ততক্ষণ তাঁর শান্তি থাকবে না।

গল্প করতে-করতে আয়মনি মাঝেমাঝে উঠে যাচ্ছিল। মুগিগুলোকে বিকেলের দানা খাইয়ে আসছিল। উঠোনে শুকোতে দেওয়া কাপড় তুলে আনছিল। শফি বুঝতে পারছিল, খুব কাজের মেয়ে এই আয়মনি। একবার শফিকে বসিয়ে রেখে বেরিয়ে গেল। তারপর ফিরে এল কচি বটের ডাল নিয়ে। ছাগলটাকে খেতে দিল। আদর করল। ছাগলটা কবে বিয়োবে, সেই হিসেব সে করে রেখেছে। তাই শুনে শফি তার মায়ের প্রিয় ছাগল কুলসুম আর গাইগোরু মুন্নির কথা তুলল।

আয়মনি দীঘির ঘাটে মুন্নি ও কুলসুমকে লক্ষ করে-ছিল। বলল, বাপজি যখন গেছে, তখন কোনো চিন্তা নাইকো। এতক্ষণ ওরাও খেয়েদেয়ে পেট ঢোল করেছে। মৌলাহাটে এসে পড়েছে। আর ওদের খাওয়ার অভাব হবে না। ক্যান জানো তো?

শফি জানে না।

আয়মনি চোখে ঝিলিক তুলে বলল, দীঘি! দীঘির চড়ায় ঘাসের অভাব নাইকো। আর ওই নদী। নদীর

দুধারেও কত ঘাস। বাছারা খাবে-দাবে। চিন্তা কোরো না।

শফি হাসল।...আমরা তো সেকেন্ডা যাব।

আয়মনি ভুরু কুঁচকে বলল, সেকেন্ডা? সেখানে ক্যানে গো?

আমি জানি না কিছু। আব্বা জানেন।

যাওয়াচ্ছে! আয়মনি বলল। তোমাদের আব্বাকে গাঁওলা আটকে দিয়েছে। রোজি বলে গেল না? ওমরের বাড়িটা খালি পড়ে আছে। সেই বাড়িতে তোমরা থাকবে। তারপর জায়গা-জমি দিয়ে ঘর বানিয়ে দেবে।...

তখন মৌলাহাটের মসজিদের ভেতর সেইসব কথা-বার্তাই হচ্ছিল। মৌলানা বদিউজ্জামানের মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব শোনার জন্য দম বন্ধ করে বসে ছিল লোকেরা। আর মৌলানা বলেছিলেন, আশরের (বৈকা-লিক) নমাজ পড়ে নিই। তারপর বলছি।

নমাজ পড়া শেষ হলেও জবাব দেন নি বদিউজ্জামান। কেউ-কেউ কেঁদে ফেলেছিল হুজুরের ভাবগতিক দেখে। এমন প্রশান্ত, দিব্য অথচ এমন উদাসীন, কঠিন মুখ তারা কখনও দ্যাখে নি। মৌলাহাটে অনেক মৌলবি-মৌলানা এসেছেন। তাঁদের হাতে দফায়-দফায় তওবা করে তারা মুরিদ (শিষ্য) হয়েছে। কিন্তু পাকাপাকিভাবে চির-জীবন মুরিদ হয়ে থাকার মতো গুরু তারা পায় নি। সব গুরুর আগমন ঘটে শীতের ধান ওঠার পর। গাড়ি ভরতি ধান আর পয়সাকড়ি নিয়ে তাঁরা চলে যান। শিষ্যরা টের পায়, যেন ধানের জন্যই ওইসব গুরুর আগমন। দৈবাৎ বেমরশুমে যে কেউ না এসেছেন, এমন নয়। কিন্তু তিনিও অভাবী গুরু। পয়সাকড়ি নিতেই আসা। তাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয় নি কোনও দিব্যছটা ওখানে ঝিলিক তুলেছে। অথচ বদুপিরের মুখে যেন ঝলমল করছে দূর আসমান থেকে প্রতিফলিত আলোক-রশ্মি। ঈষৎ গম্ভীর ওই মুখে যখনই মৃদু হাসি দেখা যাচ্ছে, তখনই বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে—কী এক মোজেজার (দিব্যশক্তির) নিদর্শন মনে হয়।

আশরের নমাজের পর হুজুর বলেছিলেন, মগরে-বের (সন্ধ্যা) নমাজের পর যা বলার বলবেন। তারপর মসজিদ থেকে প্রাঙ্গণে বেরিয়ে এসেছিলেন। হাতে ময়ূরমুখো কাঠের ছড়িটি ধরা। খয়রাজালের অসি-মুদ্দিনকে মৃদুস্বরে কিছু বলেছিলেন। অসিমুদ্দিন সেই বার্তাটি ঘোষণার জন্য প্রাঙ্গণের ইন্দারার ধারে একটুকরো পাথরে উঠে দাঁড়িয়েছিল।...মৌলাহাটের মোমিন-মোছলমান ভাইসকল! হুজুরকে এবার আপনারা একলা থাকতে দিন। আর হুজুর বলছেন কী, একবার সেই পিরের সাঁকোয় যাবেন—ওনার ইচ্ছে হয়েছে। মেহেরবানি করে কেউ যেন ওনাকে বিরক্ত করবেন না। আপনারা মগরেবের সময় আবার মসজিদে আসুন।

তারপর মৌলানা বদিউজ্জামানকে একা বাদশাহি সড়ক ধরে হেঁটে যেতে দেখা গিয়েছিল। চৈত্রের ঊষর মাঠে শেষ বিকেলের রোদে কালো হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল কয়েকটা প্রাচীন স্তম্ভ। স্তম্ভগুলো পাথরে তৈরি। নদী একটু তফাতে সরে গেছে। পাথরের স্তম্ভগুলো বালির চড়ায় কিছুটা ডুবে রয়েছে। সড়কও তফাতে সরে গেছে। বদিউজ্জামান সড়ক থেকে নেমে স্তম্ভ-গুলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। গ্রাম থেকে অনেকেই অবাক চোখে তাকিয়ে ব্যাপারটা দেখছিল। তারা আশা করছিল অলৌকিক কিছু ঘটতে চলেছে, তাই দেখে তাদের জীবন ধন্য হবে এবং বংশপরম্পরা সেই কাহিনী চালু হয়ে যাবে। অসিমুদ্দিনও মসজিদের প্রাঙ্গণের পাঁচিলে ভর করে নিষ্পলক তাকিয়ে ছিল।

আসলে বদিউজ্জামান নির্জনে একবার ভেবে দেখতে চেয়েছিলেন, কী করবেন। মৌলাহাটে থাকবেন, নাকি সেকেন্ডা চলে যাবেন। প্রথম-প্রথম এমন উদ্দাম খাতির সবাই করে থাকে। তারপর থিতিয়ে আসে সব উচ্ছ্বাস। তার চেয়ে বড়ো কথা, মৌলাহাটের হালচাল তিনি কিছুটা জানতেনও। এখানকার মেয়েরা নাকি বড্ডবেশি স্বাধীনচেতা। ফৈজু মৌলবি তাঁকে মৌলাহাটের কথা বলেছিলেন একবার। তিনি নাকি একবেলা থেকেই চলে গিয়েছিলেন ব্যাপার-স্যাপার দেখে। ফৈজুদ্দিন হানাফি মজহাবের মৌলবি। তাঁর বেলা যদি এই হয়, বদিউজ্জা-মানের ভাগ্যে কী ঘটতে পারে? ফৈজুদ্দিন বলেছিলেন, মেয়েগুলান বড়ই বেহায়া ভাইসাব! বে-আবরু হয়ে গোসল করে। মৌলবি-মৌলানাদের নিয়ে ছড়া বাঁধে। এমন ঠাঁই ভূ-ভারতে নেই।

বালির চড়ায় পাথরের স্তম্ভগুলোর কাছে গিয়ে বদিউজ্জামান থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। একটা স্তম্ভের গোড়ায় ঝুঁকে একটি মেয়ে কিছু করছিল। সে তাঁকে দেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তার ভিজে চুল, পরনের

শাড়িও ভিজে। নদীতে স্নান করে এসে পিরের সাঁকোয় মানত করছিল। বদিউজ্জামান ব্যাপারটা দেখামাত্র খাপ্পা হয়েছিলেন। গম্ভীর স্বরে বলেছিলেন, কে তুমি? এখানে এসব কী করছ?

মেয়েটি নির্বিকার ভঙ্গীতে বলেছিল, মানত দিচ্ছি।

তুমি কোথায় থাকো? কী নাম?

ক্যানে? নামে আপনার কী দরকার?

তুমি মুসলমান, না হিন্দু?

মেয়েটি বেজায় তেজী। বলেছিল, যাই হই, তাতে আপনার কী?

বদিউজ্জামান তার স্পর্ধায় অবাক। দেখলেন, সে স্তম্ভের গোড়ায় একটা পিদিম জেবলে দিল। কয়েকটা ক্ষুদে মাটির ঘোড়া রাখল। তারপর মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল। তার প্রণামের ভঙ্গী দেখে বদিউজ্জামানের মনে হল, মেয়েটি নিশ্চয় হিন্দু। তাই আর তার সঙ্গে কথা বললেন না। অন্যদিকে ঘুরে দাঁড়ালেন।

প্রণাম শেষ করে মেয়েটি আবার নদীর দিকে গেল। নদীতে তত জল নেই। বালির চড়ার মধ্যে একহাঁটু জল বয়ে যাচ্ছে। সেই জলে সে পা ছড়িয়ে বসে আপন মনে জল নিয়ে খেলতে থাকল। মেয়েটির বয়স কুড়ি-বাইশের মধ্যে। তার সিঁথিতে সিঁদুর নেই দেখে মৌলানা বদিউজ্জামান তাকে অবিবাহিতা ভাবলেন। একটু পরে সে তাঁর পাশ দিয়ে চলে গেলে তিনি লক্ষ করলেন, মৌলাহাটের দিকেই চলেছে। মৌলাহাটে কি কিছু আছে?

সে বাদশাহি সড়কে পৌঁছুলে বদিউজ্জামান সেই স্তম্ভটার কাছে গেলেন। চটিজুতোর ডগা দিয়ে জ্বলন্ত পিদিমটা উলটে দিলেন। মাটির ঘোড়াগুলোকে যথেচ্ছ লাথি মারলেন। তারপর স্তম্ভের গায়ে সিঁদুরের ছোপ চোখে পড়ল। সেখানে জুতো ঘষে তবে তাঁর রাগ পড়ল। স্তম্ভটা ভেঙে ফেলার কথা ভাবতে-ভাবতে গ্রামের দিকে পা বাড়ালেন বদিউজ্জামান।

তখন তিনি মৌলাহাটে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্তে স্থির। মসজিদের কাছাকাছি পৌঁছুলে অসিমুদ্দিন এবং আরও কয়েকজন এগিয়ে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা করল। বদিউজ্জামান মৃদুস্বরে মৌলাহাটের একজনকে জিগ্যেস করলেন, ওই সাঁকোর থামে হিন্দুরা পুজো করে নাকি?

জি, মোছলমানেরাও মানত-টানত করে।

একটু আগে একজন জেনানাকে দেখলাম পুজো করছে। এ গাঁয়ে হিন্দু আছে নাকি?

জি হুজুর, কয়েকঘর বাউরি আছে। বাদবাকি সব মোছলমান।

অন্য একজন একটু হেসে বলল, একটু আগে ভিজে-কাপড়ে গেল তো? হুজুর, ও হল আবদুলের বউ।

স্তম্ভিত বদিউজ্জামান বললেন, কী?

জি হুজুর। খুব হারামজাদি মেয়ে। বড়ো-ছোটো মানে না। এমন ওর তেজ।

আবদুল কোথায়? ডাকো তাকে।

অপর একজন বলল, আবদুল হুজুর চলাফেরা করতে পারে না। কুষ্ঠরোগী।

কাজিবাড়ির বড় কাজিসায়েব সন্ধ্যার নমাজে আসছিলেন। তাঁকে দেখে এগিয়ে গেলেন। বদিউজ্জামান। মৌলাহাটের প্রধান মুরুব্বি বলতে তিনিই। পিরের সাঁকোর ব্যাপারটা তাঁর কাছেই তুলবেন মৌলানা।

সে রাতে রোজি-রুকুদের বাড়ি শফি যখন খেতে এসেছে, সাইদা বেগম বললেন, কোথায় ছিলি রে তুই? কতবার কতজনকে খবর পাঠালাম।

জবাব রুকু দিল।...ও তো আয়মনি খালার বাড়িতে ছিল। আমরা আবার গিয়ে ডেকে নিয়ে এলাম।

আয়মনি? সে কে?

কাসেমের বেটি। জানেন আম্মা? আয়মনি খালা স্বামীর বাড়ি—

রোজির চিমটি খেয়ে চুপ করে গেল রুকু। রোজি ফিসফিস করে বলল, এসেছে। আম্মার কাছে গল্প করছে।

দরিয়াবানু ওরফে দরিবিবি ডাকছিলেন মেয়েদের। দুজনে চলে গেলে সাইদা ছেলের পাশে বসলেন। মাথায় হাত বুলিয়ে জিগ্যেস করলেন, দুপুরে খেলি কোথায়?

আয়মনিখালার বাড়িতে।

হাসলেন সাইদা।...খালা পাতিয়ে ফেলেছিস এরি মধ্যে?

শফি আস্তে বলল, আব্বা কী ঠিক করলেন জানেন আম্মা?

মুখ নামিয়ে আঙুল খুঁটতে-খুঁটতে সাইদা বললেন, সেকেন্ডা যাওয়া হবে না। দরি-আপা বলছিল, মসজিদে

মগরেরের নমাজের সময় কথা হয়েছে। একটা খালি বাড়ি আছে নাকি।

দুইবোন তক্তাপোশে খাওয়ার জন্য দস্তরখান নিয়ে এল। বিছিয়ে দিয়ে চলে গেলে সাইদা চাপা স্বরে বললেন, নুরুর বাড়ি আসার কথা ছিল। খয়রাজোলে গেলে দেখবে আমরা চলে এসেছি। ও যদি সেকেন্ডা চলে যায়, হয়রান হবে!

শফি বলল, বড় ভাই আসবে নাকি?

আসবে। তুই জানিস না?

আমাকে বলেছ? বলো কোনো কথা?

সাইদা ছেলেকে একটু টেনে আদর দিতে-দিতে বললেন, ওখানে নাকি মৌলবি এলেন দেওবন্দ শরিফ থেকে। ওনার হাতে খত ভেজেছিল নুরু। দেওবন্দ কি এখানে? রেলগাড়ি, স্টিমার, তারপর ঘোড়ার গাড়ি। দশটা দিনের রাস্তা। তবে এবার নুরু এলে আর ওকে যেতে দেব না। তোর আব্বা যা করেন, করবেন।

আয়মনি এল। মুখ টিপে হেসে বলল, বিবিজি, সালাম! আপনার ছেলে বড় লক্ষি। কতকথা হল সারা-বেলা। মনে হয় যেন কতকালের মায়ের পেটের ভাই। তো বলে কী, আম্মোও রোজি-রুকুর মতো তোমাকে খালা (মাসি) বলব। বেশ, তাই বলো—মন যদি চায়।

সাইদা আয়মনিকে দেখছিলেন। একটু পরে বললেন, খোকা-খুকু কটা গো মেয়ে?

জি? খোকাখুকু? আয়মনি মুখে আঁচল চাপা দিল হাসির চোটে।

রোজি-রুকু খাপ্পা বোঝাই করে পোলাওয়ের থালা, কোর্মার বাটি এনে রাখল। রুকুর কানে কথাটা গিয়েছিল। বলল, আয়মনিখালার খোকা-খুকু কিচ্ছু নেই জানেন আম্মা? কেন নেই ওকে জিগ্যেস করুন না।

সাইদা জিগ্যেস করলেন, কেন গো মেয়ে?

আয়মনির মুখটা লাল হয়ে উঠেছিল। মুখে হাসি এনে বলল, সেসব দুঃখের কথা একদিন বলব বিবিজি। ছেলের সামনে ওসব কথা থাক। রোজি-রুকু, বস্ত বেশরম বাপু তোমরা!

দুই বোন ওকে ভেংচি কেটে চলে গেল। শফি উজ্জ্বল মুখে বলল, খালা! আমরা সত্যি তোমাদের গাঁয়ে থেকে গেলাম, জানো?

থাকবে বৈকি। তুমি এত ভালো ছেলে? তোমাকে কি যেতে দিতাম ভাবছ?

সাইদা একটু হেসে বললেন, কে ভালো ছেলে? শফি? চেনো না তো। দেখবে।

শফি ঘাড় গোঁজ করে খেতে থাকল। সাইদা আয়মনিকে তার দুষ্টুমির কথা বলতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে মসজিদ থেকে খবর এল, মৌলানা বদিউজ্জামান আজ রাতে মসজিদেই থাকবেন।...

[ক্রমশ

গ্রন্থসমালোচনা

এক অসাধারণ 'ননকনফরমিস্ট'

The Political Ideas of Benoy Kumar Sarkar by Bholanath Bandyopadhyay. K. P. Bagchi & Co. Calcutta. Rs. 80.

এই শতাব্দীতে বাঙালি মনীষার এক উজ্জ্বল উদাহরণ বিনয়কুমার সরকার। তাঁর জন্ম ১৮৮৭ সালে, মৃত্যু ১৯৪৯-এ। ৬২ বছরের এই অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়ু জীবনে তিনি অবিভক্ত বাঙলার চিন্তার জগতে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন আজকের খুব কম পাঠকই সে খবর জানেন বলে মনে হয়। শুধু সাধারণ পাঠকই নয়, সংস্কৃতিসেবী বলে বিনয় সরকার নিজের যে পরিচয় দিতে চাইতেন, সেই সাংস্কৃতিক মহলেও তাঁকে নিয়ে তেমন আলাপ-আলোচনা হয় বলেও শুনি নি। পশ্চিমবঙ্গের বইপত্তর ঢাকায় আমাদের কাছে অল্পই আসে। যা আসে, তার বেশির ভাগই গল্প-উপন্যাস, হালকা রচনা, পত্রপত্রিকাও যা দেখি তা বিনোদনমূলক। বাংলাদেশে বিনয় সরকারের পরিচয় নেই বললেই চলে, তাঁর চর্চা তো দূরের কথা। বিনয় সরকারের জন্মের একশ বছর পূর্ণ হতে আর বেশি দেরি নেই। এখন থেকে তাঁর অনুরাগীরা, বিশেষভাবে তাঁর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এখনো যাঁরা বেঁচে আছেন, তারা তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের কথা ভাবছেন কিনা জানি না।

এই সময়ে ড. ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বইটি খুবই সময়োপযোগী হয়েছে। এতদিনে বিনয় সরকারের ওপর একটি যথার্থ বিশ্লেষণাত্মক বিস্তারিত আলোচনা চোখে পড়ল। অন্তত তার বহুমুখী ভাবনাচিন্তার একটি বিশেষ দিকের বিশদ আলোচনা হল। একটি দিকের বলছি এই জন্য যে রাজনীতি সম্পর্কে প্রচুর আলোচনা আর লেখালেখি করলেও, এই বিষয়টি বিনয় সরকারের প্রধান আগ্রহ অথবা উৎসাহের বস্তু ছিল কিনা, সে সম্পর্কে মতান্তর অস্বাভাবিক নয়। বস্তুত অধ্যাপক সরকার রাজনীতি অর্থনীতি সমাজতত্ত্ব শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি প্রভৃতি এত বিভিন্ন বিষয়ে মাথা ঘামিয়েছেন, এত লিখেছেন এবং প্রায় সব ক্ষেত্রেই এমন পাণ্ডিত্য এবং মননশীলতার পরিচয় রেখে গেছেন যে চিন্তাবিদ হিসেবে তাঁর আসল ক্ষেত্র কোন্‌টি, তাঁকে কোন্ বিশেষ গোষ্ঠীতে ফেলা যায়, সে সম্পর্কে হলফ করে কিছু বলা যায় না। আমাদের মতো যাদের একদা তাঁর কাছে পড়বার আর তাঁর সান্নিধ্য লাভ করার সৌভাগ্য হয়েছিল তাদের অনেকেই হয়তো তাঁর সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদানের স্বাক্ষর খুঁজে পান। হয়তো এও মনে করেন যে তাঁর অন্যান্য বিষয়ের আলোচনার ভিত্তিও তাঁর সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কিত চিন্তাভাবনার উৎসেই নিহিত। ড. বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বইটি পড়ে আমার এ ধারণা আরও বদ্ধমূল হল। তিনি বিনয় সরকারের রাজনৈতিক চিন্তাধারার মূল্যায়ন করতে গিয়ে তার যে বিশ্লেষণ করেছেন সেখানে অধ্যাপক সরকারের সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভাবনাচিন্তাই শেষ পর্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

লেখক দুঃখ করেছেন যে অধ্যাপক সরকারের সমসাময়িক অথবা পরবর্তী গবেষক, লেখক, পণ্ডিত, তাঁর অনুরাগী ছাত্রছাত্রী কেউই তাঁর প্রতিভার সম্যক মূল্যায়নের চেষ্টা করেন নি। তাঁর সম্পর্কে যেসব আলোচনা হয়েছে তার বেশির ভাগই (দু-একটি বাদ দিলে) ভাবালুতায় পর্যবসিত। এর কারণ অবশ্য অধ্যাপক সরকারের ব্যক্তিত্বের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে। যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁদের অনেকেই তাঁর প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এমনভাবে অভিভূত হয়েছিলেন যে তাঁদের পক্ষে এই ক্ষুরধার ভিন্নমতাবলম্বী চিন্তাবিদ সম্পর্কে বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তিনির্ভর আলোচনা করা সম্ভব ছিল না। তাঁরা গুরুদক্ষিণা পরিশোধেই ব্যাপৃত ছিলেন, তাদের সরকার-চর্চা বীরপূজায় সীমাবদ্ধ। বিনয় সরকারের স্বাধীন নিরপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক মতামত যাঁদের পছন্দ হয় নি (এবং তাঁদের সংখ্যাও কম ছিল না) তাঁরা তাঁর সম্পর্কে উৎসাহী হবেন না, এ তো একান্তই স্বাভাবিক। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় এদিক থেকে সৌভাগ্যবান। তিনি বিনয় সরকারের মৃত্যুর দু বছর পূর্বে জন্মেছেন। সহানুভূতিশীলতা সত্ত্বেও তার আলোচনা ব্যক্তিনিরপেক্ষ।

বিনয় সরকার কোনো রাজনৈতিক তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছিলেন কি? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে বইটি লিখেছেন ড. ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বইটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত (১) ভিৎ গঠনের প্রস্তুতিপূর্ব, (২) ভিত্তি, (৩) রাজনৈতিক তত্ত্ব সম্পর্কে ভাবনা, (৪) ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে ভাবনা, এবং (৫) উপসংহার।

প্রথম দুটি অধ্যায়ে বিনয় সরকারের মানস-গঠনের একটি সুবিন্যস্ত ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায়। কিভাবে তাঁর চিন্তাধারা বিবর্তিত হতে-হতে তার বিশেষ রূপটি পরিগ্রহ করল, লেখক তা নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মৌলিক কনসেপটগুলি সম্পর্কে বিনয় সরকারের চিন্তাভাবনার আলোচনা আছে তৃতীয় অধ্যায়টিতে। এটাই বইটির প্রধান তথা কেন্দ্রীয় 'থিম'। নেশন বা জাতি, রাষ্ট্র, সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র—এইসব বিষয়ে বিনয় সরকারের বক্তব্য তথা চিন্তার বিশদ বিশ্লেষণ করেছেন লেখক। রাষ্ট্রবিজ্ঞান অথবা রাজনৈতিক তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনার বৈশিষ্ট্য আর মৌলিকতাও এই আলোচনা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে অধ্যাপক সরকার যা ভাবতেন বা বলতেন তার ভিত্তিও এইসব দার্শনিক এবং সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে। শেষ অধ্যায়টিতে লেখক বিনয় সরকারের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার মূল্যায়নের চেষ্টা করেছেন।

যে কোনো চিন্তাবিদের ধ্যানধারণা তাঁর সমাজ এবং কালের প্রয়োজনেই গড়ে উঠে। বিনয় সরকারও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম নন। তাঁর সব চিন্তাভাবনা আর কর্মের লক্ষ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা। তিনি যদিও কখনো সক্রিয় রাজনীতিতে শরিক হন নি, তবু কিভাবে কোন্ পথে চললে দেশ তাড়াতাড়ি স্বাধীন হতে পারে এবং সমাজ ও জাতির উন্নয়ন সম্ভব হবে, তার মূলসূত্রগুলো তুলে ধরাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। সেই উন্নয়নের একটা রূপরেখা প্রণয়নের প্রয়াসও লক্ষ করা যায় তাঁর লেখায়—আধুনিকতা আর শিল্পায়ন ছিল যার প্রধান কথা।

স্বভাবতই আদর্শবাদের চেয়ে বাস্তবতার উপরেই তিনি বেশি জোর দিয়েছেন। তাঁর কাছে রাষ্ট্রগঠনই প্রধান লক্ষ্য, নেশন নয় :

'Nation has existed only in the minds of the patriots and romantists, but state is a real historical phenomenon' (পৃ ৪৮).

রাষ্ট্র গঠিত হলেই জাতিগঠন সহজ হবে :

'The problem of nation-making is nothing but the problem of establishing a sovereign will in territorial terms'. (পৃ ৪৮)

এবং রাষ্ট্রগঠনের জন্য ঐক্যও অপরিহার্য নয়।

He (Benoy Sarkar) declared that 'Indian Unity was a myth'. (পৃ ৪৮)

একজাতি একরাষ্ট্র কিংবা এক-ভাষা/সংস্কৃতি একরাষ্ট্র তাঁর অন্বিষ্ট ছিল না :

'His proposal was to create several independent and autonomous states for several provinces of India. It was also possible to have several nation-states in India.' (পৃ ৪৮)।

এইসব বক্তব্যের পেছনে তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত সুস্পষ্ট। স্বাধীনতা শেষ পর্যন্ত ভারত-বিভক্তির মধ্য দিয়েই এসেছিল। কিন্তু সেই বিভক্তির মূল নায়ক জিন্নাহ্ 'ভারত এক নয়' প্রমাণ করতে পারলেও, বুঝতে পারেন নি যে 'ভারত (অর্থাৎ ভারত ও পাকিস্তান) দুইও নয়'। পরবর্তী কালে বাংলাদেশের অভ্যুদয় প্রমাণ করেছে তাঁর মতবাদ কতখানি ভ্রান্ত ছিল। বর্তমান ভারতে ঐক্যের যে সমস্যা তার রাজনীতিবিদ চিন্তাবিদদের ভাবিয়ে তুলেছে, বিনয়কুমার সরকার পঞ্চাশ বছর আগে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বেই, তা দেখতে পেয়েছিলেন। 'ইউরোপ যদি ইউরোপীয় ঐক্যের ভাবনা বিসর্জন দিতে পারে, তা হলে ভারতই বা তা পারবে না কেন'। (পৃ ১০৯) এই সূত্র ধরে ড. বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন,

'Sarkar opined that instead of running after the utopia of Indian unity, be it federal or not, Indians should think in terms of establishing several self-supporting independent soverign nation-states in different regions of India. (পৃ ১০৯)।

পরাধীন দেশ কী করে স্বাধীন হয়? নিজের বাহুবলে? আত্মশক্তিতে? স্বাধীন দেশের অস্তিত্বই বা কিভাবে বজায় থাকে? বিনয় সরকারের অভিমত,

'The state is the product of inter play of various national and international forces......it is only through foreign intrigue and diplomatic assistance that subject states, whether united in language, race, religion etc. or not, can throw off the yoke of hated aliens. Unity or no unity, a nation can be born, should it suit the 'conjuncture of circumstances.' (পৃ ৭৩)

ব্যাপারটা শুনতে আমাদের যতই খারাপ লাগুক না কেন, এ কথা না মেনে উপায় কি যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া-আফ্রিকার পরাধীন দেশগুলি একের পর এক স্বাধীনতার মুখ দেখল বেশির ভাগই এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে, সশস্ত্র সংগ্রাম, বিদ্রোহ বা বিপ্লবের জন্যে নয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনও স্মরণ করা যায়, এই সূত্রে। একই সঙ্গে রাষ্ট্রের অস্তিত্বের অপরিহার্য শর্ত হিসেবে অস্ত্রের শক্তি সম্পর্কে বিনয় সরকারের উক্তি :

'The might of the sword is the only guarantee of the existence of the nation-state.'

আজ আর প্রশ্নাতীত মনে হয় না। রাষ্ট্রগঠনে এবং রাষ্ট্রের টিকে থাকার ব্যাপারে তিনি যে বিশ্বশক্তিপুঞ্জের প্রভাবের কথা বলেছেন তার সঙ্গে এই পরবর্তী উক্তির সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া মুশকিল। সামরিক শক্তির ব্যবহার ছাড়াও বেশ কিছু দেশ স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা পেয়েছে, বেঁচেও আছে। সিংগাপুর তার প্রমাণ। বর্তমান বিশ্বের বেশির ভাগ রাষ্ট্রই, বিশেষ ভাবে ছোটো ছোটো রাষ্ট্রগুলি, টিকে আছে বিনয় সরকার যাকে বলেছেন 'ওয়ার্ল্ড-ফোরসেস' তারই সুদক্ষ ব্যবহারের উপর, সামরিক শক্তির উপর নির্ভর ক'রে নয়। জাপান এবং সুইজারল্যান-

ডের মতো দেশও আর অস্তিত্বের জন্য কামান-বন্দুকের ভরসা ক'রে নেই।

রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কেও বিনয় সরকারের ভাবনা সাধারণ ধারণা থেকে বেশ কিছুটা ভিন্ন। বর্তমান বিশ্বের বাস্তব রাজনৈতিক অবস্থাটা যে রাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ স্বাধীন সার্বভৌম সত্তার সপক্ষে যায় না, তিনি তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব যে কতটা আপেক্ষিক, তার ভেতরের আর বাইরের সীমাবদ্ধতা কতখানি, সে সম্পর্কে বিনয় সরকারের উক্তি,

'without the moral and material support of at least a few other states, no state can preserve its freedom and autonomy in a world marked by intense struggle for existence.' (পৃ ৫৫)।

এবং শুধু বৈদেশিক রাষ্ট্রই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব খর্ব করে না

'interventions by international organisations and agencies is very much a reality today.' (পৃ ৫৬)।

সদস্য-রাষ্ট্রগুলি স্বেচ্ছায় এই আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধান মেনে নিচ্ছে, বলা যায় মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে।

স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র সম্পর্কেও বিনয় সরকারের চিন্তার যে বিশ্লেষণ করেছেন ড. বন্দ্যোপাধ্যায় তা থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে অধ্যাপক সরকার এসব বিষয়েও অন্যমত পোষণ করতেন। এসব বিষয়ে প্রচলিত ধারণা অবশ্য ইউরোপ আমেরিকা থেকে ধার করা। শুধু ভারতেই নয় প্রাচ্যের কোনো দেশেই এই ব্যবস্থাগুলির, এমন কি মতবাদের ক্ষেত্রেও, এসবের কোনো ঐতিহ্য অথবা অস্তিত্ব ছিল না। বিনয় সরকারের উপর শুক্রাচার্যের যে নীতিসারের গভীর প্রভাব পড়েছিল, মানুষের আচার আচরণ চরিত্র সম্পর্কে তা থেকে অধ্যাপক সরকার তাঁর মতবাদ অথবা মানসগঠনের একটা দার্শনিক ভিত্তি খুঁজে পেলেও, নেশন, রাষ্ট্র, গণতন্ত্র, সার্বভৌমত্ব, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি কনসেপটগুলো সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনা একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব।

সমাজতন্ত্র স্বাধীনতার সর্বশেষ রূপ, অথবা গণতন্ত্রের আরও উঁচু ধাপ, কিংবা স্বাভাবিক পরিণতি, এবং কেবল সমাজতন্ত্রেই ব্যক্তির স্বাধীনতা সত্যিকারভাবে অর্থবহ হয়ে ওঠে, গণতন্ত্রের চেয়ে সমাজতন্ত্রই শ্রেয়, বিনয় সরকারের এসব অভিমত আজও বিতর্কিত। ধন এবং বিত্তের শক্তি গণতন্ত্রকে কিভাবে নস্যাৎ করে তা যেমন জোর দিয়ে বলেছেন তিনি, দলের অথবা পার্টির শক্তি সমাজতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্রকে কিভাবে রুদ্ধ করে সে সম্পর্কে তিনি তেমন সোচ্চার নন। তিনি অবশ্য গণতন্ত্রের মধ্যে যেমন স্বৈরাচার দেখেছেন, তেমনি স্বৈরতন্ত্রের মধ্যেও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সন্ধান পেয়েছেন। আজ আমাদের ভাবতে অবাক লাগে যে বিনয় সরকার নাৎসি জরমানির মধ্যে গণতান্ত্রিক কৃতিত্ব এবং ইটালির ফাসিবাদে জনগণের শক্তি দেখতে পেয়েছিলেন। সোভিয়েত একনায়কত্ব সম্পর্কে বলেছিলেন,

'It is the height of absurdity to deny the existence of democracy in this dictatorship of the proletariat' (পৃ ৭৯)।

অন্যদিকে রাষ্ট্র, সার্বভৌমত্ব, আইন এবং এগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি তাঁর কাছে ছিল স্বভাবতই স্বৈরতান্ত্রিক।

বিনয় সরকার তাঁর সমস্ত ভাবনা-চিন্তাকে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড় করিয়েছিলেন বলে এই শতাব্দীতে রাষ্ট্রের যে বিশ্বজনীন রূপটি তাঁর কাছে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিল তার নাম তিনি দিয়েছিলেন গণ-স্বৈরতন্ত্র (ডেমো-ডেসপটোক্রেসি)। এই নামকরণের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত বৈপরীত্য সে তো মানুষের চরিত্রের মধ্যে যে স্বভাবজ বিপরীতধর্মিতা নিহিত, তারই প্রতিফলন। তাঁর ভাষায়,

'there is no natural and necessary harmony ,in man. Man is a bundle of diverse and discordant attitude and interests. Rational and irrational elements operate at the same time in the same mental framework. This is as true of an individual as of a group mind. (পৃ ৭৬-৭৭)

এই বিশ্বাস থেকেই জন্ম নিয়েছে বিনয় সরকারের চিন্তাধারার অন্যতম স্তম্ভ : প্লুরালিজম। কোনো গণতন্ত্রী রাষ্ট্রেই খাঁটি গণতন্ত্র নেই, যেমন কোনো স্বৈরতন্ত্রী দেশও পুরোপুরি স্বৈরাচারী নয়। সব মানুষই যেমন ভালোমন্দে মেশানো, রাষ্ট্রসত্তার বেলায়ও একই ব্যাপার দেখা যায়। বর্তমান বিশ্বের এই রাজনৈতিক বাস্তবতার উপর ভিত্তি করেই বিনয় সরকার তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্ব গঠন করতে চেয়েছিলেন।

রাষ্ট্রীয় আচরণের বেলায় জোর যার মুলুক তার অথবা সময় বুঝে শক্তি প্রয়োগ করার ম্যাকিয়াভেলীয় নীতি বিনয় সরকারের কাছে কঠিন অপ্রিয় সত্য বলে মনে হয়েছিল। ন্যায়নীতি, বিবেক, মানবতা, শান্তি, যুক্তি—রাষ্ট্রনীতির বিচারে এইসব আদর্শের মূল্য সম্পর্কে তিনি সন্দিহান ছিলেন। তাঁর মতে,

'The world of politics is a brutal world in which inter-human, inter-group, inter-class or inter-state relations are marked by envy, malice, chicanery, wrangling, backbiting, rivalry, conspiracy intrigue and intense struggle for position, influence and power' (পৃ ১২৯)।

এই চরম প্রতিকূল ক্রূর বিবদমান নীতিহীন বিষময় পৃথিবীতে মানুষ আশা আর ভরসার আলো কোথায় দেখবে? এই দুঃসহ অবস্থার কি কোনো পরিবর্তন হবে না? হলেই বা তা কিভাবে হবে? বিনয় সরকারের বিশ্বাস ছিল, এই দুঃসহ অবস্থার মধ্যেই প্রগতির বীজ নিহিত আছে। তিনি লিখেছেন,

'In politics and public life generally, the most creative element is hatred, or competition···for these bring into operation···creative disequilibrium' (পৃ ১২৯)।

ফলে যুদ্ধকে প্রগতির অপরিহার্য শর্ত বলে মনে হয়েছে তাঁর। যুদ্ধ তাঁর কাছে শান্তির মতো স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রেই নয়, মানুষের মুক্তির মৌলিক তত্ত্ব হিসেবে বিনয় সরকারের বাণী এই সৃষ্টিশীল ভারসাম্যহীনতা। স্থিতাবস্থাকে তিনি জড় অথবা মৃত্যুর সমান বিবেচনা করেছেন। প্রতিকূল প্রকৃতি এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করেই মানুষ বেঁচে থাকবে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে প্রগতির পথে অগ্রসর হবে। সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে বিনয় সরকারের মূল দর্শন এখানেই নিহিত। তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিও এইখানে।

বিনয় সরকারকে কখনো মনে হয় বিপ্লবী, কখনো বা চরম প্রতিক্রিয়াশীল। তিনি একই সঙ্গে মার্কসের অনুরাগী, সোভিয়েত তন্ত্রের সমর্থক, আবার মার্কসবিরোধী। এই স্ববিরোধিতাই বিনয় সরকারের চিন্তার এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। এবং এইজন্যেই ড. ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে কোনো সুবিন্যস্ত রাষ্ট্রতত্ত্ব অথবা রাজনৈতিক তত্ত্বের স্রষ্টা হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন নি। তাঁর এই মূল্যায়ন যথার্থ এবং যুক্তিসম্মত। কিন্তু যে বিষয়টি খুব স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে নি তা এই যে বিনয় সরকারের চিন্তাধারায় পরস্পরবিরোধিতার ভিত্তি তাঁর 'ননকনফরমিজম'। তিনি কোনো দলে ছিলেন না, কোনো একটি একক আদর্শেও বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন নি, যেখানেই যা কিছু ভালো দেখেছেন তাকেই সমর্থন জানিয়েছেন, শ্রমিকের স্বার্থ এবং ধনিক-বণিকের স্বার্থের সমন্বয় করতে চেয়েছেন—উদারনৈতিক মানবতাবাদীর যা প্রধান দোষ এবং গুণ।

আবুল হোসেন

সরকারি আনুকূল্যে প্রকাশিত গ্রন্থের মান

আহত ঈশ্বর (গল্পসংকলন)—পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়। মুক্তপত্র পাবলিকেশনস, ৩/২এ চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০২৫। পনেরো টাকা।

লেখকের যে সচিত্র পরিচিতি গ্রন্থের শেষ প্রচ্ছদে রয়েছে, তাতে জানা যায়, প্রায় হাজার দেড়েক গল্প তিনি লিখেছেন। এ ছাড়া বিস্ময়কর প্রতিভার আরো অনেক দিগন্তপ্রসারী দিকচিহ্ন এই পরিচিতির মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পারি। ফলে, পাঠক হিসেবে প্রত্যাশা আর আকাঙ্ক্ষার পরিধি বেশ খানিকটা বৃদ্ধি পায়।

খুবই আশার কথা যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিছুকাল ধরে গ্রন্থপ্রকাশে লেখকদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য আর্থিক অনুদান দিচ্ছেন। কী গুণমানের ভিত্তিতে এসব সাহায্য দেওয়া হয়, তা সঠিক জানা নেই। এটাও বলে রাখা ভালো, এভাবে যাঁদের বই বেরুচ্ছে, তাঁদের প্রতিভার প্রতি কোনো কটাক্ষপাত করাও আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে যেহেতু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যে-কোনো সরকারি সাহায্যের মধ্যে সাধারণ করদাতারও কিছুটা ভূমিকা থেকে যায়, সেই আপেক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বর্তমান গ্রন্থটির গুণগত মূল্যমান বিবেচনা করলে আশা করি অন্যায় কিছু হবে না।

গ্রন্থটি লেখক-কৃত একটি দীর্ঘ ভূমিকা-সমেত এক ডজন ছোটোগল্পের সংকলন। গল্পগুলি কেমন হয়েছে? গভীর দুঃখেই বলতে হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে আজকের বাঙলা ছোটোগল্প আধুনিকতার কোন্ অভ্রংলিহ শৃঙ্গে অবস্থান করছে, সে সম্পর্কে কোনো সন্ধান রাখেন না এই লেখক। ছোটোগল্পের ফরম আর কনটেনট-ভাবনার নিত্য বিবর্তনের বিষয়েও কোনো স্পষ্ট ধারণা তাঁর নেই। গল্প বলতে এখনো প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের যুগে তিনি বাস করছেন। বলবার ধরন, শব্দচয়ন এবং দৃশ্যকল্প ব্যবহারের সেকেলে ভাব তাই মাঝে-মাঝে চোখে পীড়া এনে দেয়। কখনো-কখনো স্কেচধর্মী রম্যরচনা এবং ছোটোগল্পের ভিতরেও কোনো সীমারেখা টানতে পারেন নি তিনি। 'গল্পে বিজ্ঞাপন', 'অধঃপতন', 'পকেটমার হইতে সাবধান', 'দীর্ঘশ্বাস' প্রভৃতি রচনাকে পুরনো বা আধুনিক কোনো সংজ্ঞাতেই ছোটোগল্পের আওতায় আনা যায় না। তবে সাদামাটা ফীচার হিসেবে পড়তে মন্দ লাগে না। বিষয়বৈচিত্র্যে একটা স্পষ্ট মানবিক আবেদন প্রকাশ পায়, যা লেখকের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গিকে পাঠকের কাছে এনে দেয়। 'মখলেজ' বা 'ভূপেন' গল্প-দুটি কোনো শিশুপাঠ্য সংকলনে প্রকাশিত হলে ভালো হত।

মোটামুটিভাবে 'আহত ঈশ্বর' এবং 'সে'— এই দুটি গল্প পড়ে বোঝা যায়, লেখকের মানবচরিত্র পর্যবেক্ষণের এবং তাদের মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনের আঙ্গিক উপস্থাপনের দক্ষতা রয়েছে। 'আহত ঈশ্বর' গল্পের মধ্যবয়সী নায়ক

এক বিচিত্র প্যারানইয়ার শিকার হয়ে একদিন গোপনে অনুসরণ করে চলে নিজের স্ত্রীর অন্য পুরুষের সঙ্গে দেহজ সম্পর্ক স্থাপনের সাক্ষ্যপ্রমাণের আশায়। প্রমাণ সে পেয়েও যায় হাতে-নাতে, কিন্তু ততক্ষণে তার মাথা থেকে হত্যা করার বাসনা কখন যেন উধাও হয়ে গেছে, তার ভূমিকা তখন নিছক একজন 'দর্শনকামী' যৌনবিকৃতির মনোরোগী ছাড়া আর কিছু নয়। এ পর্যন্ত গল্পটি বেশ ভালোভাবে চলছিল, কিন্তু লেখক দুম করে মেলোড্রামার মতো নায়কের পূর্ব যৌবনের এরকম একটি সমান্তরাল অবৈধ সম্পর্কের সন্তানকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে গল্পটিকে মূল লক্ষ্যে পৌঁছতে দিলেন না। তুলনায় 'সে' গল্পটিতে এক আসন্নপ্রসবা নারীর সংস্কার, মানসিক টানাপোড়েন এবং মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়ার গল্প খুব শান্তভঙ্গিতে তিনি লিখেছেন। এ সংকলনে এই একটি-মাত্র গল্পে নিটোল ছোটোগল্পের বেশ কিছু মাত্রা মোটামুটি রক্ষা পেয়েছে। এ ছাড়া 'রণী অডেন', 'মখলেজ', 'পার্বতী কবিরাজ' নিছকই বক্তব্য-সর্বস্ব সেকেলে ভঙ্গিমায় লেখা দুর্বল মানের গল্প। দেড়হাজারি গল্পলেখকের পরবর্তী সংকলনের সময় তাই সতর্ক থাকতে হবে, নিজের সৃষ্টি হলেও অক্ষম সন্তানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

আমাদের বিস্ময় অন্যত্র। আলোচ্য গ্রন্থের মতো এত নিম্ন মানের গল্প সংকলন সরকারি অনুদান পায় কোন্ মায়ামন্ত্রের প্রভাবে? কারা সেই মহামান্য বিচারক, যাঁদের কোনো ধারণা নেই এই মুহূর্তের বাঙলা সাহিত্যের আধুনিকতম ছোটোগল্পের বিপুল ঐশ্বর্য সম্পর্কে?

কামাল হোসেন

কবিতায় সুখ দুঃখ ভালোবাসা

বারো নম্বর বাড়ি—রবীন সুর। মহাদিগন্ত প্রকাশনী, বারুইপুর। দশ টাকা।

তবু বেঁচে থাকা—কানাই কুণ্ডু। মহাদিগন্ত প্রকাশনী, বারুইপুর। ছয় টাকা।

মুহূর্তের মানচিত্র—সোফিওর রহমান। বিশ্বজ্ঞান, কলকাতা-৯। সাত টাকা।

আলোচ্য তিনটি কাব্যগ্রন্থে সময়ের সঙ্গে আপন দৃষ্টিবিনিময়ের চঞ্চলতায়, অন্তর্গত সত্তার মাঝে টগর প্রাণের অন্বেষণে যে কবিতাগুলি সংকলিত হয়েছে তাতে স্বাভাবিকভাবেই জড়িয়ে আছে সুখ-দুঃখ-ভালোবাসার নানান ছবি। সংগত কারণেই অভিজ্ঞতার সন্ধিতে ক্রমোন্মুখতায় সংসক্ত কথাগুলি ছিন্নচরণের আনুকূল্য পেয়েছে। উচ্চারিত হয়েছে আপন অস্তিত্বের সংস্তব।

বাষট্টিটি কবিতার যোগফল রবীন সুরের 'বারো নম্বর বাড়ি'। নামকরণেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে চায় কবি-স্বভাব ও কবিতার চরিত্রগুলি। এই উঠতে চাওয়ার সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে আছে কবির শৈশব-কৈশোরের টুকরো ধুলোবালি-মাখা, মাকড়সার জালে ঢাকা মধ্য বয়সের বিবর্ণ ছবি। স্মৃতির উজ্জ্বলতায় নয়—ধূসরতায় চিনে নিতে চান তিনি নিজেকে, সময়কে, সময়ের সঙ্গে যুক্ত আর সবাইকে। তাই "ঘষা ঝিনুকে ছোলা কাঁচা আমের গন্ধ,/স্কুলের শেষ পিরিয়ডের ছটফটানি" (নতুন লেখা) জাগরূক থাকে টগর প্রাণের মতো মধ্য বয়সের দিনগুলিতেও—"কতোদিন বেঁচে থাকবে ন্যাপথলিন স্মৃতির সুবাসে?/ছেঁড়া নামাবলি, পার্টটাইম পুরুতের তুখোড় ঘন্টায়/ভাঙা দেবালয়ে ঝুরঝুরে টেরাকোটা, চামচিকের পদাঘাতে" (ভাটপাড়া-১৯৮২) অন্তর্ভেদী আরো ছবি আছে—"সকাল নটার সাইরেন ককিয়ে উঠতেই/উনুনের পাশে আর একটা স্টোভ জ্বলে উঠল—/সাড়ে নটার লোকাল ধরার ফটোফিনিশ ঘোড়দৌড়ের/শেষ গ্যালপে... (বাড়ির ছবি)। 'সিঁড়ি', 'পুরনো গয়না', 'এ সব শব্দ', 'ঘড়ি', 'ভাটপাড়ার গল্প' প্রভৃতি কবিতাতে আছে টলটলে স্মৃতি-চিত্র। এইসব স্মৃতি, লুপ্ত পারিবারিক বনেদিয়ানার ঐতিহ্য কবি সযত্নে রক্ষা করতে চান—"এই প্রাচীনতা ছেড়ে/কোথায় যাবো/না এটাকেই মেরামত করে নেব?" (বারো নম্বর বাড়ি)। এজন্য অন্তরে অনুভব করেন এক টুকরো সুখও। কবিতা লেখার উৎস, প্রথম কবিতা লেখা, কবিতা কি—এসব প্রসঙ্গে বেশ কটি কবিতা আছে। "কবিতা শুধু শিল্পকুশলতা নয়/আরও ওপরের জিনিস" (কবিতা)—এটা টের পেয়ে যান বলেই তিনি লিখতে পারেন —"একটি কবিতা পড়ার পর সমস্ত শরীর যেন/দূরপাল্লা মধ্যরাতের অচেনা স্টেশনের জানালায়/আধো ঘুম আধো জাগরণে/এক ভাঁড় গরম চায়ের তৃপ্তি"। দীর্ঘ কবিতা 'তথ্যচিত্রে' আছে স্মৃতি, সময়—এসবের প্রসারিত কৌলীন্য। মুদ্রণপ্রমাদে অনেক শব্দের অর্থই গেছে পালটে। দু-একটি চিত্রকল্প দীর্ঘদিন মনে রাখার মতো; যেমন—১। দোতলায় আলসে ঘেঁষে সজিনার কিশোরী শরীর (গোধূলি বারান্দায়) ২। নক্ষত্রপুঞ্জের ঠান্ডা হাত রাখে জ্বরতপ্ত রাত্রির কপালে।

কানাই কুণ্ডুর 'তবু বেঁচে থাকা'তে আছে সাঁইত্রিশটি কবিতা। প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষোভ, দুঃখ দীর্ঘ ছায়া ফেলেছে এইসব কবিতায়। প্রথম কবিতা 'বেঁচে আছি'তে কবির উচ্চারণ—'এখন আকাশে লোভ বাতাসে ছলনা/শ্মশানে সংসারের শুধু স্বার্থ সাধনা/এখন প্রতিটি নারীর দেহে দূষিত গর্ভের গল্প/প্রতিটি পুরুষ পাপী/এবং আমিও/পা-চাটা কুত্তার অভ্যাসে মায়ার শিকলে/বেঁচে আছি।' এই বেঁচে-থাকার নির্মমতার ছবি ধরা আছে 'রাত বারোটা', 'খিদে', 'নদীর কাছে', 'প্রজাপতি', 'নক্ষত্র পকেটে নিয়ে' প্রভৃতি কবিতায়। শুধু নির্মমতার ছবিই নয়, আছে বিপন্ন বিস্ময়ের কথাও—"বস্তুত এখানে বাতাস নেই কার্বন মনোক্সাইড ওড়ে/প্রতিরোধ অভ্যাস বশে কীটাণুরা মৃত্যুহীন/প্রজাতি বিস্তারে গায়ে গায়ে সেঁটে থাকে।" (ক্রমশ পাথর) এই বোধে যুক্ত হয় ভিন্ন মাত্রা—"এ ঠিক জীবন নয় বেঁচে থাকা নয়। হেঁসেল ভাঁড়ার শূন্য' হাতের মুঠোয় নেই বাতাসেও নেই/মানুষের কোন দাম নেই"। (জীবন নয়) 'পায়ের শিকলে শব্দ', 'শব্দহীন অলংকারে', 'একা', 'ভারতবর্ষ', 'ভুল', 'লাটাই' প্রভৃতি কবিতায় আছে অন্তর্লীন বেদনার ঘন ছবি। শুধু বেদনা ঘন নির্মমতার কথাই নয়, এইভাবে বেঁচে থাকার বিরুদ্ধে কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয় জেহাদ—"পুরানো পাঁচিল ভাঙো ভাঙো শব্দ/জ্যোৎস্নায় ছায়াকাঁদা-দলের শরীর/ভাঙো শীততাপ নিয়ন্ত্রিত প্রাচীন শাকই। (ভাঙো) এই ভাঙার তিনি সামিল করতে চান কবিতাকেও—'এখন কবিতার শরীর বদল চাই।' (কবিতার শরীর) আবার এই ভাঙনের শব্দকে নিজেরই মেকি মনে হয় তাঁর। সব মানুষের সহবিরতায় সেই শব্দ হারায় তার বেগ—"পথের ধুলোয় শুকোল রক্তের নদী/ঠিকানা হারালো কত বনবন্ধন/দেয়ালে লটকানো মৃত অক্ষরমালায়।" (তবু বেঁচে থাকা) অভিমানে, ক্ষোভে, দুঃখে তবুও বেঁচে থাকার পাঠ নিতে হয় কবিকে, সময়কে এবং সকলকে—"তবু বেঁচে থাকা/সময়ের নুড়ি ও পাথরে।" (ঐ)

সোফিওর রহমানের 'মুহূর্তের মানচিত্র' কাব্যগ্রন্থটিতে সংকলিত কবিতাগুলিতে আছে রুদ্ধ আবেগ, অমেয় উচ্ছ্বাস আর কিছুটা প্রথম কবিতা লেখার আনন্দঘন উল্লাস। তাই নিশ্চিত কোনো উত্তরণের কথা নেই, নেই সময়ের নিগড়ে বাঁধ কোন ঋদ্ধি। বরং গভীর এক ভালোবাসায় ছেয়ে আছে কবিতাগুলির কপোল কপাল। এই ভালোবাসা আবার জননী, প্রেমিকা ও কন্যাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। এ কবিরই স্বীকারোক্তি। ভালোবাসার কিছু ছবি—

১। "এই মুহূর্তের গভীরতায় আমার আর্তি রঙীন হ'ল/জন্মকালের চমৎকার দাপাদাপি/ধনের অনুষঙ্গে সৌরসেনের চাঁদ/চাঁদের ঘরাণায় ভালোবাসা জননীর স্নেহের মোহর।" (মুহূর্তের মানচিত্র-১)

২। "সুচেতার ভেজা ঠোঁটে ঠোঁট রেখে জন্ম নেয় নতুন পৃথিবী/একেকটি মুহূর্ত এমনি আসে প্রেমিকাকে মনে হয় শাশ্বত জননী।" (প্রিয়তমা শ্রীচরণেষু) 'মুহূর্ত' শব্দটি বারবার ঘুরেফিরে এসেছে নানা কবিতায় আর কবিতার নামকরণে। এ নির্দিষ্ট সময়কে বেছে নেওয়ার চেষ্টা। তাই অনেক ক্ষেত্রেই কবিতাগুলি একরৈখিক। সমগ্র পরিণতি, পল্লবিত বিস্তারের জন্য তাই থাকে অপেক্ষা।

তাপস বসু

বাঙালি মুসলমানের উনিশ-শতকী স্বরূপ

উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তাচেতনার ধারা (১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড)—ড. ওয়াকিল আহমদ। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পঞ্চান্ন ও পঞ্চাশ টাকা।

স্বরূপসন্ধানপ্রয়াসী বাঙালি মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের বহু জনই ঊনবিংশ শতক নিয়ে গবেষণা চালিয়েছেন বিভিন্ন দিক থেকে। এইসব প্রয়াসের ফলস্বরূপ বাঙালি মুসলমানের উনিশ-শতকী চেহারার এক-একটা বিশেষ দিককে যে চিনতে বা বুঝতে পারা গেছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ড. ওয়াকিল আহমদের আলোচ্য বর্তমান প্রয়াসের মধ্যে ধরা পড়েছে প্রায় সামগ্রিক দিকটাই। দুই খণ্ডে বিভক্ত তাঁর এই সুবৃহৎ গবেষণাকর্মে উনিশ-শতকী বাঙালি মুসলমানের ভাবনাচিন্তার জগৎটাকে তিনি জরিপ করেছেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে।

বাঙালি মুসলমান সমাজের উদ্ভবের ইতিহাসকে ওয়াকিল আহমেদ উপস্থাপিত করেছেন পূর্বসূরীদের গবেষণা, মতামত এবং আলোচনাসমূহকে ইতিহাসগ্রাহ্য তথ্যের ভিত্তিতে যাচাই করে নিয়ে। বাঙলায় ইসলামের অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে লেখক মন্তব্য করেছেন, "মুসলিম-শাসিত বাংলায় ...... সুযোগ-সুবিধা ভোগের কিছু তারতম্য ছিল, নচেৎ হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজের কলেবর বৃদ্ধি ছাড়া এ যুগে আর কিছু হয় নি। যেটুকু সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ লক্ষ করা যায়, সেটুকু স্বাভাবিক বিকাশের ফল, সুসংগঠিত আন্দোলনের দ্বারা জাতির জন্য কোনো নতুন দিগন্ত উন্মোচন হয় নি। রাজশক্তির অধিকারী হয়েও মুসলমান সমাজ মধ্যযুগের এই সীমাবদ্ধতা দ্বারা

আক্রান্ত হয়েছে, একে অতিক্রম করে নতুন বিপ্লব আনতে পারে নি। ... সামাজিক অর্থনৈতিক গতানুগতিক ব্যবস্থা ভেঙে ফেলে নতুন করে গড়ার মত বিদ্যা ও হাতিয়ার আরব-ইরান-তুরস্কের নব্য শাসকগোষ্ঠীর ছিল না। এজন্য তাঁরা সমঝোতা ও সমন্বয় চেয়েছেন, সংঘাত বা বিপ্লব চান নি। ইংরাজগণই প্রথম ব্যবহারিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন যার ফলে দীর্ঘকালের গতানুগতিক প্রবহমানতা, আড়ষ্টতা, মন্থরতা এবং নিষ্প্রাণতার আবরণ খুলে যায় এবং নবজীবনের চিন্তা-ভাবনা, কর্মকুশলতা মননশীলতার বিকাশ ঘটে। আর তাতেই নবযুগ বা আধুনিক যুগের সূচনা হয়।" (পৃ. ২০-২৬, ১ম খণ্ড)

এই আধুনিক যুগের সূচনাপর্বে বাঙলায় হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের গতি হয়ে পড়ে ভিন্নমুখী। "ব্রিটিশ সরকারের পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করে এবং ইংরাজী শিক্ষার দ্বারা চাকুরী-বাকুরীতে সুযোগ করে নিয়ে হিন্দুগণ উন্নতির দিকে, এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অমনোযোগী ও ইংরাজী শিক্ষার প্রতি বিমুখ থেকে চাকুরী ও ব্যবসায়ের সুযোগ হারিয়ে মুসলমানগণ অবনতির দিকে অগ্রসর হয়। হিন্দু-মুসলমান সমাজ, বিশেষ করে মধ্যবিত্তের এই অসম বিকাশ বাংলার সামাজিক ইতিহাসের একটি বড় রকমের দুর্ঘটনা ছিল।" (পৃ. ৩৫-৩৬, ১ম খণ্ড)

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে মুসলমান সমাজের কেবল পতনই ঘটেছে, বিকাশ বা উন্নতির কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় নি। এই সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ ঘটে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে। এই দীর্ঘ বিলম্বের ফলে বাঙলার হিন্দু মধ্যবিত্তের তুলনায় মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিসাবে ছিল খুবই ক্ষুদ্রাকার। কলেবরের এই ক্ষুদ্রতার অন্য কারণ আলোচনা করতে গিয়ে লেখক উদ্ধৃত করেছেন ড. আবু মহামেদ্ হবিবুল্লাহর উক্তি। "...মুসলমান আমলে হিন্দুরা যে সুবিধা ভোগ করেছে, রাষ্ট্রশাসনে ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে নির্দিষ্ট স্থান তাদের ছিল, ইংরাজ আগমনের ফলে তা কিয়ৎপরিমাণে আলোড়িত হলেও মূলতঃ তা ধ্বংস হয় নি। ব্যবসায় বা শাসনক্ষেত্রে তারা শাসকশ্রেণীর একান্ত প্রয়োজনীয় সহকারীরূপে চিরকালই একটা ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে এসেছে। ...মুসলমান শাসক ও তাঁদের সহযোগী শ্রেণীর যুদ্ধ ও শাসনকার্য ছাড়া অন্য জীবিকা ছিল না, সেজন্য নতুন শাসকশ্রেণীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের অর্থনৈতিক ধারাবাহিকতা গেল ধ্বংস হয়ে। ...হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গঠন যত সহজ হয়েছিল (কারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাদের মধ্যে চিরকালই একটা না একটা ছিল) মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী তত সহজে তত দ্রুত তৈরী হতে পারে নি।" (পৃ. ৭১-৭২, ১ম খণ্ড) হিন্দু-মুসলিম মধ্যবিত্তের বিকাশের এই বৈষম্যের কারণে উভয়শ্রেণীর মনোভাব তথা দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে তফাত দেখা দেয়। বাঙালি হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যকার বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রকৃত বীজ এখানে নিহিত আছে।

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশের মূলে আছে এই সমাজে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন এবং আধুনিক শিক্ষার বিস্তার। এই ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন আবদুল লতিফ আর আমীর আলী এবং তাঁদের অনুসারী কিছু নব্যশিক্ষিত ব্যক্তি। কিছু-কিছু মুসলিম জমিদারও এই নব্যশিক্ষিতদের সহায়ক শক্তির ভূমিকা নিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ময়মনসিংহের ধনবাড়ির সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, ত্রিপুরার পশ্চিমগাঁও-এ আলী নওয়াব চৌধুরী, টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারের জমিদার-পত্নী করিমুন্নেসা খানম, ত্রিপুরার হোসেনাবাদের জমিদার ফয়েজুন্নেসা চৌধুরানী ইত্যাদির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আর নব্যশিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে আবদুল লতিফ এবং সৈয়দ আমীর আলী ছাড়াও আছেন খোন্দকার ফজলে রাব্বি, ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী সোহরাওয়ার্দী, দেলওয়ার হোসেন আহমেদ, ওয়ালি, আবদুর রসুল প্রমুখ ব্যক্তিগণ। তাঁরা সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন। ড. ওয়াকিল আহমেদ আলোচ্য গ্রন্থের 'ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব' অধ্যায়ে এইভাবে বেছে-বেছে নামোল্লেখ করেন নি। যেসব জমিদার এবং নব্যশিক্ষিত ব্যক্তি বাঙলার মুসলমান সমাজের অগ্রগতির বিকাশে কোনো না কোনো ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের প্রায় সবারই পরিচয় এই গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

এইসব ব্যক্তির উদ্যোগ প্রায়ক্ষেত্রেই আত্মপ্রকাশ করেছিল সমষ্টিগত উদ্যোগের মাধ্যমে। সুতরাং অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবেই এসেছে সভাসমিতির কথা। এক্ষেত্রে আবদুল লতিফের মহামেডান লিটারেরি সোসাইটি এবং সৈয়দ আমীর আলী প্রতিষ্ঠিত সেনট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশনের কথাই অধিকাংশ লোকের জানা। কিন্তু লেখক আলোচনা করেছেন উনবিংশ শতকে প্রতিষ্ঠিত যাবতীয় সভাসমিতির পরিচয়, এবং সমাজজীবনে তাদের ভূমিকা। এমনকি মফস্সল শহরগুলিতে প্রতিষ্ঠিত সভাসমিতি কিংবা কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় সংগঠনের মফস্সলীয় শাখাপ্রশাখার ক্রিয়াকাণ্ডের কথাও আলোচনা থেকে বাদ পড়েনি। উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজের নেতৃবৃন্দ ও সভাসমিতিগুলির একত্রে ধারাবাহিক আলোচনা এর আগে আর কেউ করেছেন বলে জানা যায় না।

ঠিক এইরকমভাবেই সাহিত্যিক এবং পত্রপত্রিকা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গেও

তিনি কেবল বিশিষ্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে কারো সামান্যতম ভূমিকার কথাও যাতে বাদ না পড়ে যায় সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রেখেছেন। এর ফলে আমরা মীর মশাররফ হোসেন, আবদুল হামিদ খান ইউসুফ জয়ী, মোজাম্মেল হক, সৈয়দ এমদাদ আলী, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, রোকেয়া সাদাওয়াত হোসেন প্রমুখ যেসব প্রধান-প্রধান লেখকদের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত তাঁরা ছাড়াও ড. ওয়াকিল আহমদের আলোচনায় স্থান পেয়েছে প্রায় দেড়শত 'অপ্রধান' বা 'গৌণ' রচয়িতার সৃষ্টিকর্ম। উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজের গৌণ লেখকদের নিয়ে এই ধরনের বিস্তারিত আলোচনা এর আগে কোথাও হয় নি। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থের প্রস্তাবনায় লেখকের উক্তি প্রণিধানযোগ্য, ঃ "সমাজের নানাস্তরে নানা ছিদ্র আছে, সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থেকে তাঁরা (অপ্রধান লেখকগণ) যেসব বক্তব্য তুলে ধরেছেন, মুষ্টিমেয় প্রধান লেখকদের রচনায় সেসবের সম্পূর্ণ প্রতিফলন হওয়া সম্ভব নয়। এগুলির অধিকাংশেরই শিল্পমূল্য নেই, কিন্তু সামাজিক মূল্য যথেষ্ট আছে। সুতরাং সমাজমানসের পূর্ণ রূপটি অনুধাবন করতে হলে উভয়ের একত্র আলোচনার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।" (১ম খণ্ডের প্রস্তাবনা) সমাজজীবনের অন্যতম দর্পণ হল পত্র-পত্রিকা। উনিশ শতকের বাঙালি মুসলিম পরিচালিত প্রায় ষোলখানি পত্র-পত্রিকা আলোচিত।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে যেসব সামাজিক সমস্যার বিরুদ্ধে শিক্ষিত সচেতন বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে মুসলমান সমাজে শ্রেণীভেদপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ, তালাকপ্রথা, বাঁদীপ্রথা এবং অবরোধপ্রথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এইসব সমস্যার বিরুদ্ধে যাঁরা সোচ্চার হয়েছেন, কলম ধরেছেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তুলতেও প্রয়াসী হয়েছেন লেখক তাঁদের সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়েছেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। আবার যাঁরা ধর্মের দোহাই দিয়ে পর্দাপ্রথা, বহুবিবাহ, তালাকপ্রথা ইত্যাদির সপক্ষে ওকালতি করেছেন, এই নিরপেক্ষ বিজ্ঞানমনস্ক গবেষকের আলোচনায় তাঁদের প্রসঙ্গও বর্জিত হয় নি। মুসলমান সমাজের অবনতির কারণ সম্পর্কে তৎকালীন চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ যেসব মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং অবনতিরোধ করার যেসব উপায় নির্ধারণ করেছেন, আলোচ্য গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে সেসবের আনুপূর্বিক বিবরণ।

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যযুগীয় প্রীতির সম্পর্ক কিভাবে ধীরে-ধীরে বিষাক্ত হয়েছে—কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে বিচ্ছেদের দুস্তর ব্যবধান, তার তথ্যনির্ভর সুদীর্ঘ বিশ্লেষণের শেষে লেখক মন্তব্য করেছেন, "হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ-উৎপত্তির কাল ও পাত্র বিচার করলে দেখা যায় যে, শহরে আধুনিক শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্তের কণ্ঠ উচ্চারিত হওয়ার আগে পর্যন্ত তেমন বিরোধ ছিল না। যখন মুসলমানরা লেখাপড়া শিখে নিজেদের দাবী-দাওয়া ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে, তখনই স্বার্থের দ্বন্দ্ব বেধেছে। শ্রেণী-চরিত্রের সাধারণ ধর্ম হল এই যে, তা স্থানচ্যুত ও ক্ষমতাচ্যুত হতে চায় না। স্বার্থরক্ষা ও স্বার্থবৃদ্ধির প্রয়াস থেকেই হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ-মূলের উৎপত্তি হয় বলে আমাদের বিশ্বাস। এই কায়েমী স্বার্থ থেকে জাতিভেদ, ধর্মভেদ, সংস্কৃতিভেদ ইত্যাদি বোধ ও বুদ্ধির উদয় হয়। উপরতলার শ্রেণী নীচতলার শ্রেণীকে ব্যবহার করে। শাসক ইংরাজ ব্যবহার করেছে শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে, মধ্যবিত্ত শ্রেণী গ্রামের কৃষক-শ্রমিককে। বিরোধের গতি এপথেই অগ্রসর হয়েছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বাঙালী হিন্দু-মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা এই দ্বন্দ্বে আক্রান্ত হয়েছেন এবং পরস্পর পরস্পরকে দোষারোপ করেছেন। তাঁরা অনেকেই মিলন কামনা করেছেন, কিন্তু বিরোধের মূল কারণ ধরে অগ্রসর হননি বলে সফল হতে পারেন নি।" (পৃ. ৫০-৫১, ২য় খণ্ড)

উনবিংশ-শতকে-গড়ে-ওঠা হিন্দু-মুসলমানের ধর্মীয় আন্দোলনের মধ্যেও প্রকৃতিগত কোন মিল ছিল না। বিধবাবিবাহ, শ্রেণীভেদপ্রথা ইত্যাদি নিয়ে মুসলমান সমাজের কোনো শাস্ত্রীয় সমস্যা ছিল না। তাই মুসলমান সমাজের ধর্মীয় আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল বাইরের শক্তিগুলি থেকে ইসলামের উপর যে আঘাত এসেছে, সেগুলি প্রতিহত করা। এ ব্যাপারে খ্রীষ্টান এবং ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে তাদের বেধেছিল প্রত্যক্ষ সংঘাত। আবার নিজেদের মধ্যে শিয়া-সুন্নি, হানাফী-মোহম্মদীয় মতবাদ নিয়েও অন্তর্দ্বন্দ্ব হয়ে উঠেছিল প্রখর। এসবের বিস্তারিত ইতিহাস উপস্থাপনা করে লেখক মুসলিম ধর্মীয় নেতাদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "স্বধর্মীদের উন্মার্গগামিতা ও আত্মকলহের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তাঁরা প্রধানতঃ ধর্মশিক্ষার কথাই জোর দিয়ে বলেছেন। তাঁরা মনে করেছেন, ইসলাম অপরিবর্তনীয় ধর্মমত, কোরাণ অপৌরুষের ও হাদিস অকাট্য বাণী। কোরাণ-হাদিসের নীতিনির্দেশের সঙ্গে কোনো আপোষ চলে না। সুতরাং ধর্মসংস্কার বলতে তাঁরা সমাজের অনৈসলামিক আচার-আচরণের সংস্কার বুঝেছেন। রক্ষণশীল মনোভাব থেকে এর প্রেরণা এসেছে। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন মৌলবী-মোল্লা শ্রেণীর লোকেরাই। শিক্ষিত ব্যক্তিগণও এই আন্দোলনকে সমর্থন দিয়েছেন। এটি নব্যযুগের নব্যশিক্ষা ও নব্যচিন্তার আলোকে কোন বিপ্লবমুখী আন্দোলন ছিল না, এ ছিল

ইসলামের পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন।" (পৃ. ৯৪, ২য় খণ্ড)

উনিশ শতকের মুসলমানদের শিক্ষা-আন্দোলনের উপরও পড়েছিল এই ইসলামী পুনরুজ্জীবনবাদের প্রভাব। তাই দেখা যায়, পাঁচটি ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে আধুনিক শিক্ষাকে সুষ্ঠু করে তোলার প্রশ্নে তারা হিমশিম খাচ্ছে। প্রসঙ্গক্রমে মোহম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমেদের উক্তি স্মরণীয় : "বঙ্গীয় মুসলমানদিগের শিক্ষার পথে দারুণ অন্তরায়। হিন্দুদিগের যে স্থানে দুটা বা তিনটা ভাষা শিক্ষা করিতে হয়, বঙ্গীয় মুসলমানদিগের তথায় ৫টা ভাষা আয়ত্ত না করিয়া উপায় নাই। প্রথমতঃ বাঙ্গলা ইহাদের মাতৃভাষা হইলেও বিশুদ্ধ অর্থাৎ খাঁটি বাঙ্গলা নহে। উহা আরবী-মিশ্রিত এক প্রকার মুসলমানী বাঙ্গলা। সুতরাং মুসলমানদিগকে বাঙ্গলা ভাষা দস্তুরমতন শিক্ষা করা চাই। তারপর আরবী বেশী না হউক কোরাণ শরীফ বিশুদ্ধভাবে পাঠ করিবার উপযোগী ত হওয়া চাই। জাতীয় আচার ব্যবহার উন্নত করার জন্য, 'আদব-কায়দা' শিক্ষার জন্য, ভাল জাতীয় কাব্য ও ইতিহাসের রসাস্বাদন জন্য, অতি সুমধুর ও স্মৃতিসুখকর পারসী ভাষা শিক্ষা করিতেই হইবে। তৎপর উর্দু ভাষা, ইহা ভারতীয় মুসলমানদিগের জাতীয় ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। প্রয়োজনীয় ধর্মগ্রন্থাদি সমস্তই প্রায় এই ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে বা হইতেছে। এই ভাষা শিক্ষা না করিলে নাগরিক সম্ভ্রান্ত মুসলমানদিগের সহিত বাক্যালাপ করাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। সুতরাং উর্দু ভালরূপে শিক্ষা করা দরকার। অবশেষে রাজভাষা ইংরাজী...এই পাঁচটি ভাষা আয়ত্ত করিতে পারিলে, বঙ্গীয় মুসলমান প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন।" (লেখক-কর্তৃক উদ্ধৃত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৩)

এইভাবে ভাষাশিক্ষা শেষ করতেই মুসলিম শিক্ষার্থীর শিক্ষার বয়স অতিক্রান্ত হওয়ার উপক্রম হয়, তার উপর ওই ভাষায় বিদ্যালাভ করা হয়ে দাঁড়ায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। ফলে বাস্তব পরিস্থিতির চাপে পুনরুজ্জীবনবাদীদেরও শেষ পর্যন্ত আপোস করতে হয়েছে। এ ব্যাপারে আধুনিক শিক্ষানুরাগীদের ভূমিকা বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক মন্তব্য করেছেন, "যেহেতু তাঁদের চিন্তাধারা ছিল যুক্তিশীল, কর্মপন্থা ছিল বাস্তব প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেহেতু পুনরুজ্জীবনবাদের মোহ ও অন্ধতার আবরণ ভেদ করতে তাঁরা সক্ষম হয়েছেন।" ফারসির স্থলে ইংরাজিকে এবং উর্দুর স্থলে বাঙলাকে শিক্ষার্জন এবং জ্ঞানচর্চার মাধ্যম করার আন্দোলন হয়েছে। এ ব্যাপারে পুস্তক, পত্র-পত্রিকা সভা-সমিতি, বক্তৃতামঞ্চ, স্মারকলিপি ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার-অভিযান চালানো হয়েছে। "ফলে শতাব্দীর শেষে সমাজের মতিগতি ফিরতে শুরু করে এবং নবযুগের পদধ্বনি শোনা যায়।" (পৃ. ১১৬, ২য় খণ্ড)

শিক্ষার অতিপ্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ হিসেবেই গড়ে ওঠে ছাত্রাবাস আন্দোলন। কলকাতাসহ বাঙলার বিভিন্ন মফস্সল শহরের ঐতিহ্যমণ্ডিত ছাত্রাবাসগুলি নির্মিত হয় এই শতকেই। এ ব্যাপারে বিভিন্ন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির ভূমিকা এবং আত্মত্যাগের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস উপস্থাপিত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। প্রসঙ্গক্রমে নারীশিক্ষার আন্দোলন কিভাবে মুসলমান সমাজে নানা বাধাবিপত্তির ভিতর দিয়ে ধীরে-ধীরে বিকাশলাভ করেছিল তারও আনুপূর্বিক বর্ণনা তুলে ধরে লেখক মন্তব্য করেছেন, "উনিশ শতকের শেষপাদে নারীশিক্ষা সম্পর্কে মুসলমান সমাজের নিশ্চলতার অবস্থা থেকে সচলতার অবস্থায় উত্তরণ ঘটেছে। সমাজের গতি যে পরিবর্তনের দিকে ছিল এতে তাই প্রমাণিত হয়।" (পৃ. ১৩২, ২য় খণ্ড)

সমাজের এই গতিশীলতা সবচেয়ে তীব্ররূপ ধারণ করে ভাষা তথা সাহিত্যের প্রশ্নে। পাশ্চাত্য বিদ্যা এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে দেশবাসীর আগ্রহ বাড়াবার জন্য আবদুল লতিফ কলকাতায় স্থাপন করেছিলেন 'মহামেডান লিটারেরি সোসাইটি'। কিন্তু এই সোসাইটির আলাপ-আলোচনায়, বক্তৃতায়, ভাবের আদানপ্রদানে বাঙলাভাষার কোন স্থান ছিল না। শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান মাতৃভাষার প্রতি এই অবহেলা খুব বেশি দিন বরদাস্ত করতে রাজি হন নি। উর্দুপন্থীদের সঙ্গে চলে দীর্ঘ বাদানুবাদ। শেষ পর্যন্ত অবশ্য খুব স্বাভাবিক কারণেই মাতৃভাষাপন্থীদেরই জয় হয়। লেখক এই বিতর্কের ইতিহাস বিবৃত করার সময় আরবি-ফারসি-সংস্কৃত শব্দকেন্দ্রিক যে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল তারও বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। এমনকি সেই সময় সাহিত্যের বিষয় এবং আঙ্গিক নিয়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় যে বিতর্ক হয়েছিল, তার সঙ্গেও একালের পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন বিস্তারিতভাবেই। সাহিত্যের বিষয় এবং আঙ্গিক নিয়ে এই অতি আকর্ষণীয় আলোচনার শেষে লেখক মন্তব্য করেছেন, "আলোচ্য যুগে মুসলমান-রচিত উপন্যাস-নাটকের সংখ্যা যেমন কম, মানও তেমনি তুচ্ছ। বিষয়বস্তুতে ও আঙ্গিকে সীমাবদ্ধতা এবং নির্বাচন-প্রবণতা থাকলে মুক্ত ও সাবলীল সাহিত্য রচিত হতে পারে না। সমাজের চোখরাঙানিকে মেনে নিয়ে যাঁরা সাহিত্য চর্চা করেছেন, তাঁরা ভাব ও ভাষার 'দুর্গে' বন্দী। রাশ টেনে ধরে সাহিত্যের সব লেখাকে সমাজের সেবায় লাগিয়ে দিলে সমাজের সেবা হয়, কিন্তু সাহিত্য গতি, প্রাণ ও স্বচ্ছন্দতা হারায়। এ যুগের মুসলমানরচিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। ভাব, ভাষা, শব্দ সাহিত্যের বিতর্কে আত্মজিজ্ঞাসা ও নবজাগরণের প্রেরণা এসেছে বটে, কিন্তু তা এসেছে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ও স্বাতন্ত্র্যচিন্তার বর্ণে রঞ্জিত হয়ে।" (পৃ. ১৫২, ২য় খণ্ড)

উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমানের রাজনীতিচর্চাও ছিল মূলত এই সাম্প্রদায়িক 'ভেদবুদ্ধি ও স্বাতন্ত্র্যচিন্তার বর্ণে রঞ্জিত'। ইংরাজের দেওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে এবং সাথে নিজেদের মতাদর্শ আর ভাবাবেগের রঙ মিশিয়ে যে সাহিত্য আর ইতিহাস হিন্দুদের দ্বারা রচিত হয়েছিল তাতে এদেশীয় মুসলমান আহত বোধ করেছিল। অপরদিকে হিন্দুদের পুনর্জাগরণের যুগের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সহানুভূতির সাথে অনুধাবন করতে অপারগ হওয়ায় এবং দেশীয় ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের স্থলে আরব-ইরান-তুরস্ক-আফগানিস্তানের ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের চিন্তায় আত্মনিয়োগ করে মুসলমানেরা হিন্দুর চিত্ত থেকে দূরে সরে গেছেন। লেখকের সুচিন্তিত অভিমত হল, "স্বজাতি, স্বভাষী, স্বদেশী, সমরক্ত ও সমসংস্কৃতির মানুষ হয়েও বাংলার হিন্দু-মুসলমান এক হতে পারে নি এই বহির্মুখী ও বিপরীতমুখী রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণেই। ঔপনিবেশিক-শোষণে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও অবিকশিত অর্থনীতি, প্রশাসনিক সুয়োরাণী-দুয়োরাণী নীতি, মধ্যবিত্তের অসম-বিকাশ, শ্রেণীস্বার্থের অন্তর্নিহিত বিরোধ এবং ধর্ম-বর্ণবৈষম্যের কারণে এরূপটি হয়েছে।" (পৃ. ১৭১, ২য় খণ্ড)

'মধ্যবিত্তের অসম-বিকাশ', 'শ্রেণীস্বার্থের অন্তর্নিহিত বিরোধ' ইত্যাদি বিষয়গুলির গভীর বিশ্লেষণে প্রতিফলিত হয়েছে গবেষক-লেখক ড. ওয়াকিল আহমদের স্বচ্ছ বিজ্ঞাননির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি। লেখকের এই দৃষ্টিভঙ্গির গুণেই আলোচ্য বিশাল গ্রন্থে প্রতিফলিত বাঙালি মুসলমানের উনিশ-শতকী স্বরূপকে বুঝতে সুবিধা হয় এবং তাঁর বিশ্লেষণকে মেনেও নেওয়া যায় নির্দ্ধিধায়।

আবদুর রউফ

আলোচনা

পানজাব : কিছু প্রশ্ন

পানজাবের নির্বাচনের পর দুটি অদ্ভুত সমীকরণ প্রত্যক্ষ করা গেল, একমাত্র রাজনীতির দ্বারাই যার সমাধান করা সম্ভব।

(১) বিধানসভার ১১৭টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস (ই) পেল মোটে ৩২, অকালি দল ৭৩টি আসন পেয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করল। কংগ্রেস নেতা রাজীব গান্ধী বিজয়গর্বে আপ্লুত হলেন। বললেন, "গণতন্ত্রের জয় হয়েছে অহিংসার জয় হয়েছে, ভারতমাতার জয় হয়েছে।" তার কয়েক দিন পরেই ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, কংগ্রেস (ই)-র প্রথম সারির নেতা এস. বি. চবন বললেন, "পানজাবের সাম্প্রতিক নির্বাচনে যে আমাদের দল হেরে গেছে, ভালোই হয়েছে।" (স্টেটসম্যান, ৭-১০-৮৫) অর্থাৎ যা পরাজয়, তাই-ই জয়। সংসদীয় গণতন্ত্রের সমগ্র ইতিহাস তন্নতন্ন করে খুঁজলেও এর আর কোনো নজির পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

(২) শুধু কংগ্রেস (ই) নয়, নির্বাচনে বিপর্যস্ত হল অন্য সমস্ত সর্বভারতীয় দল (ভারতীয় জনতা—৪, সি পি আই—১ জনতা—১, সি পি এম—০)। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল এমন একটি দল যা একান্তভাবে সাম্প্রদায়িক, এবং আঞ্চলিক। প্রধানমন্ত্রী বললেন, "ভারতের ঐক্য এবং অখণ্ডতা রক্ষার সংগ্রামে আমরা জিতেছি।" দেশ জুড়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল। জাতীয় অখণ্ডতার পক্ষে একটা মস্ত বড়ো বিপদ আপাতত কাটিয়ে ওঠা গেছে। অর্থাৎ, যা সাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিক রাজনীতির জয়, তাই ঐক্যবিরোধী শক্তির পরাজয়।

কোনও আইনস্টানীয় চতুর্মাত্রিক পরিপ্রেক্ষিতে নয়, অপেক্ষিকতাবাদের কোনও কল্পবৈজ্ঞানিক জগতে নয়, আমাদের এই স্থূল অভিজ্ঞতার মর্তভূমিতে কী করে ঘটল এই অঘটন?

কংগ্রেস (ই) যে পানজাবের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল তা তারাও অস্বীকার করতে পারবে না। এমনকি, নির্বাচনের আগে, যখন অনেকে বলছিলেন, ইচ্ছে করে তারা নানা কেন্দ্রে দুর্বল প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে, তখন সে অপবাদ খণ্ডনের জন্যে কম চেষ্টা করা হয় নি। তবে কি বুঝতে হবে অপবাদটাই সত্য ছিল, প্রতিবাদ করতে হয়েছিল নেহাত মুখরক্ষার খাতিরে? অবশ্য

দেশে বিদেশে

রাজীব গান্ধী একথা বলেন নি যে তাঁর দলের হেরে যাওয়াটাই ভালো হয়েছে, জিতলে খারাপ হত। চবন যদি সে কথা বলে থাকেন, মনে হয় বেফাঁস বলেছেন। অকালি দল নির্বাচনে হেরে গেলে, এবং কংগ্রেস (ই)-কে পানজাবের শাসনভার হাতে নিতে হলে, নানারকম অসুবিধা সৃষ্টি হত, নানারকম বিপদআপদের সম্ভাবনা থেকে যেত, একথা ঠিক; তবে একজন কংগ্রেস নেতার পক্ষে অমন কথা প্রকাশ্যে বলা দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার শামিল।

রাজীব গান্ধী যা বলেছেন তার বরং একটা ব্যাখ্যা করা যায় এইভাবে যে, আমরা হেরে গেছি তাতে ক্ষতি নেই; ধর্মীয় উগ্রবাদীদের প্ররোচনা সত্ত্বেও এত বিপুলসংখ্যক লোক যে নির্বাচনে ভোট দিতে এসেছিলেন, এবং আমাদের ভোট না দিন, অন্তত লঙ্গোয়ালপন্থী অকালি, যাঁরা অখণ্ড, ঐক্যবদ্ধ ভারতের সপক্ষে, তাঁদের যে ভোট দিয়েছেন, সেটাই আমাদের বিশেষ আনন্দের কারণ।

অর্থাৎ, পানজাবের জনসাধারণের সামনে তিনটে বিকল্প ছিল, (১) ভোট না দেওয়া, অথবা উগ্রপন্থার সমর্থক যে কয়েকজন নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন একমাত্র তাঁদেরই ভোট দেওয়া; (২) অকালি দলকে ভোট দেওয়া; (৩) কংগ্রেস কিংবা অন্য কোনো সর্বভারতীয় দলকে ভোট দেওয়া। এর মধ্যে দ্বিতীয় বিকল্পটিই যে অধিকসংখ্যক নির্বাচক বেছে নিয়েছেন, তাতে কংগ্রেস (ই)-র অন্তত দুঃখ করবার কিছু নেই। এতে জাতীয় অখণ্ডতার প্রতিই শুধু নয়, গান্ধী-লঙ্গোয়াল বোঝাপড়ার প্রতিও তাদের সমর্থন প্রকাশ পেয়েছে।

পানজাব নির্বাচনে কংগ্রেস (ই)-র পরাজয় হলেও, যে-সংখ্যক মানুষ ভোট দিতে এসেছিলেন, এবং উগ্রপন্থীদের পরিত্যাগ করে তাঁরা যে-সংখ্যায় লঙ্গোয়ালপন্থী অকালি দলকে ভোট দিয়েছেন, তাকে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস (ই)-সরকারের, এবং বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর নীতি এবং পন্থার সাফল্যের সুচক বলে অবশ্যই মনে করা যেতে পারে। এই সাফল্য আরও উজ্জ্বল মনে হয়, যখন মনে পড়ে নির্বাচনের কর্মসূচি ঘোষণার পর প্রায় সব অ-কংগ্রেসি দল একবাক্যে এত শীঘ্র নির্বাচনের ডাক দেওয়ার নিন্দা করেছিল, এবং আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিল, পানজাবে শান্তি ফিরিয়ে আনার কাজ এর দ্বারা সাংঘাতিকভাবে বিঘ্নিত হবে। এমনকি শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সম্ভব হবে কিনা, সে বিষয়েও তারা ঘোর সংশয় প্রকাশ করেছিল। অন্য একটা আশঙ্কাও হয়তো তাদের ছিল—নির্বাচনে তাদের ফলাফল দেখে অন্তত

তাই মনে হয়। তবে সে আশঙ্কা তারা ব্যক্ত করে নি, করা ভালো নয়।

যাই হোক, পানজাবের নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে সমাধা হল, অকালি দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে রাজ্যে মন্ত্রিসভা গঠন করল, সেখানকার উগ্রপন্থী ধর্মীয় রাজনীতিবাদীর দল আপাতত কোণঠাসা। ইংরেজিতে যাকে বলে সো ফার সো গুড। কিন্তু এর পর? দুটো প্রশ্ন এখন সামনে। প্রথমটা পানজাব এবং শিখ রাজনীতি নিয়ে, দ্বিতীয় প্রশ্নটা বৃহত্তর পানজাব সহ গোটা দেশটা নিয়ে। তার তাৎপর্য দীর্ঘমেয়াদি।

প্রথমে পানজাব এবং শিখ রাজনীতির ভবিষ্যতের কথা। বারনালার মন্ত্রিসভায় একজন কি দুজন অ-শিখ সদস্য থাকলেন কিনা, সেটা খুব বড়ো কথা নয় (যে তিনজন হিন্দু অকালি দলের মনোনয়ন পেয়ে নির্বাচনে জিতেছেন তাঁদের কেউই খুব ওজনদার রাজনীতিক নন)। আসল কথা হল, অকালি দলের হাতেই এখন পানজাবের শাসনভার। এবং এ বিষয়ে মতভেদের কোনো অবকাশ নেই, অকালি দল সাম্প্রদায়িক ধর্ম-নির্ভর। প্রায় সব রাজনৈতিক দলই, অবশ্য নানা ভাবে এবং ভঙ্গিতে, অকালি দলের জয়কে স্বাগত জানিয়েছিল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) ঘোষণা করেছিল, "এই ফলাফল বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিসমূহের ওপর মস্ত আঘাত" এবং সেই সঙ্গে আশা ব্যক্ত করেছে, "রাজনীতিকে ধর্ম থেকে বিযুক্ত করবার যে প্রতিশ্রুতি অকালি দল দিয়েছে, তা পালন করবে" (ইনডিয়ান একসপ্রেস, ২৮-৯-৮৫)। কিন্তু যে প্রশ্ন এখনও বড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তা হল: সেরকম কোনো প্রতিশ্রুতি অকালি দল যদি দিয়েও থাকে, (কবে, কোথায় দিয়েছে এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না;) বাস্তব ক্ষেত্রে নিষ্ঠাসহকারে তারা তা পালন করতে চাইবে কিনা, এবং চাইলেও পারবে কিনা।

সন্দেহের কারণ অনেক আছে। অবশ্য শাসনভার হাতে নিয়েই বারনালা বলেছেন, শিখ, হিন্দু, মুসলিম, খ্রিশ্চান এবং তফশীলী জাতিসমূহের মধ্যে সম্ভাব এবং অ-বিরোধ ফিরিয়ে আনবার জন্যে তাঁর সরকার কার্যকর ব্যবস্থা নেবেন, এবং এমন সব নীতি অবলম্বন করবেন যার লক্ষ্য হবে পানজাবি সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং আর্থিক বিভেদ দূর করা। (স্টেটসম্যান, ২৯-৯-৮৫) 'সানডে' সাপ্তাহিকের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি আরও বলেছেন, "নির্বাচন জিতে আমরা একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছি। (১৩-১৯ অক্টোবর, ৮৫)। আবার তিনিই "টেলিগ্রাফ" পত্রিকার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ধর্ম এবং রাজনীতির মিশ্রণের প্রসঙ্গে বলেছেন, "ওটা আমাদের পুরোন স্ট্যানড্, ঐতিহাসিক স্ট্যানড্। ওটা যেরকম ছিল তাই আছে। ওর পরিবর্তনের কোনো ইচ্ছা আমাদের নেই" (২৯-৯-৮৫)। আবার, অন্যত্র প্রকাশিত একটি উক্তিতে তিনি বলেছেন, "ওই দুয়ের সংমিশ্রণে দোষের কিছু আছে, আমরা মনে করি না। রাজনীতির ওপর ধর্মের প্রভাব থাকলে সে রাজনীতি চিরকাল হবে পরিচ্ছন্ন, সৎ" ("অন দি রেকর্ড", স্টেটসম্যান, ১২-১০-৮৫)।

'ধর্ম' মানে যদি হয় নীতিজ্ঞান, কল্যাণবুদ্ধি, সদাচার,—তা হলে বারনালার বক্তব্য সকলেরই মেনে নেবার মতো। ধর্ম আর রাজনীতি মিশিয়ে ফেলতে যাঁরা আপত্তি করেন, তাঁরা সেই ধর্মের কথা চিন্তা করে আপত্তিটা করেন, 'রিলিজিয়ন' বলতে যা বোঝায়।

বারনালার অকালি দলের অচ্ছেদ্য বন্ধন সেই অর্থেই ধর্মের, অর্থাৎ রিলিজিয়নের সঙ্গেই। নির্বাচনে জিতে অকালি দলের বিধায়কেরা সন্ত হরচন্দ সিং লঙ্গোয়ালের স্মৃতির প্রতি যেমন শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, তেমনি শ্রদ্ধা জানান অন্য সেইসব দলীয় কর্মীদের প্রতিও যাঁরা দেশের অখণ্ডতার জন্যে শুধু নয়, পন্থ-এর গৌরবের জন্যেও যাঁরা আত্মবলি দিয়েছেন। বারনালা নিজেও, পরিষদীয় দলের নেতা হিসেবে নির্বাচিত হবার ঠিক আগে সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেছেন, জনসাধারণের ভোট পন্থের সমর্থনে পড়েছে। অর্থাৎ, অধিকসংখ্যক পানজাবি ভোটদাতা, যাঁরা অকালি দলকে ভোট দিয়েছেন, তাঁরা শিখ পন্থের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা তুলে দিতে চেয়েছিলেন, অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক যাঁরা কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছিলেন তাঁরা চেয়েছিলেন—কী চেয়েছিলেন? পন্থের গৌরবহানি? পানজাবে হিন্দু আধিপত্য? গান্ধী-লঙ্গোয়াল বোঝাপড়ার পর সে অভিযোগ করা অকালি দলের পক্ষেও অসম্ভব। তা হলে ধরে নিতে হয়, কংগ্রেসকে যাঁরা ভোট দিয়েছেন তাঁদের কাম্য ছিল ধর্মনিরপেক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠা। অবশ্য কোনো ভোটদাতা যদি ভ্রান্তির বশবর্তী হয়ে, নিজের শিখ-বিরোধী মনোভাব চরিতার্থ করবার জন্যে কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে থাকেন, তাঁর কথা আলাদা।)

তা হলে কি এই সিদ্ধান্তই ঠিক যে, পানজাবের নির্বাচনে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির পরাজয় হয়েছে, আর ধর্মীয় রাজনীতির জয়? এইটাকে সত্য ধরে নিয়ে যদি বর্তমান পানজাব সরকার তার নীতি, লক্ষ্য এবং কর্মপন্থা নির্ধারণ করে, সে তো হবে ঘোরতর অমঙ্গলের পথ, শুধু পানজাবের পক্ষে নয়, সারা দেশের পক্ষেও। বারনালা যতই বলুন, আমরা বিভেদ ঘোচাব, ঐক্য প্রতিষ্ঠা করব, মৈত্রী আনব, আমরা সারা পানজাবের প্রতিনিধি, ধর্মীয় রাজনীতির চাপ তিনি কত দিন, কতখানি ঠেকাতে পারবেন? অ-শিখ পানজাবিদের মর্যাদা, অধিকার ইত্যাদি

কত দিন, কতখানি রক্ষা করে চলতে পারবেন। শুধু তাই নয়, আধুনিক শিক্ষা, সভ্যতা, জীবনদর্শনের যে উন্মেষ মানুষে মানুষে প্রভেদ কমিয়ে আনছে বিশ্ব-ব্যাপী, কত দূর সহিষ্ণুতার পরিচয় কত দিন তার প্রতি দিতে পারবে পানজাবের অকালি সরকার? ধর্মীয় পুনরুত্থান, আচার-আচরণে, বাকো-বিশ্বাসে নিজের ধর্মের প্রতি আনু-গত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা, অনাদের থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বিলোপের বিরো-ধিতা—পানজাবের সাম্প্রতিক আন্দো-লনের পেছনে এইসব তাগিদ কী পরিমাণে কাজ করেছিল সঠিক বলা কঠিন, অকালি দলের মধ্যে এই মনোভাব বর্তমানে কত দূর শক্তিশালী, বলা আরও কঠিন। তবে, ধর্মীয় রাজ-নৈতিক দলের জীবনদর্শন উদার, আধু-নিক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করবে কিনা সে আশঙ্কা থেকেই যায়।

তবু আশা করব, সে আশঙ্কা মিথ্যা প্রমাণিত হবে। সুরজিৎ সিং বারনালা সংস্কৃতিবান শিক্ষিত মানুষ, আর্টিস্ট। তা ছাড়া তিনি মধ্যপন্থায় বিশ্বাসী। উগ্রপন্থার দিক থেকে চাপ তাঁর ওপরে আসবে, আসতে আরম্ভও করেছে, সে চাপ কাটিয়ে উঠতে যদি তিনি বদ্ধ-পরিকর হন, এবং বিপরীত আরেকটা চাপ—ধর্মনিরপেক্ষ, বিবেকী রাজ-নীতির একটা চাপ—যদি নিরন্তর বজায় রাখতে পারেন, অন্তে-আস্তে—পানজাব সুস্থ রাজনৈতিক জীবনের দিকে এগোতে পারবে। সে আশা ছাড়-বার সময় এখনও আসে নি।

তারপর যে প্রশ্নটা আসে সেটা সারা দেশ নিয়ে। ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক বিধান। তার অপরিহার্য শর্ত এই যে, ধর্মীয় সং-গঠনকে রাষ্ট্রশক্তি থেকে দূরে রাখতে হবে। অকালি দল অবশ্য রামকৃষ্ণ মিশনের মতো পুরোপুরি ধর্মীয় সং-গঠন নয়। কিন্তু তার আনুগত্য একটি ধর্মের প্রতি, তার লক্ষ্য একটি ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি। অবশ্যবৈগুণ্যে ভারতের একটি রাজ্যে এমন একটি দলের শাসন-ক্ষমতা লাভ অভিনন্দিত হল তাদের দ্বারা, যাঁরা ধর্ম এবং রাজনীতির সং-মিশ্রণ অকল্যাণকর মনে করেন। তার কারণ, তাদের পরাজয় ঘোরতর অকল্যাণ ডেকে আনতে পারত। অর্থাৎ ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান বলবৎ হওয়ার এত বছর পরেও, উগ্রতর ধর্মীয় রাজ-নীতির বদলে, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি-কে নয়, অপেক্ষাকৃত নরমপন্থী ধর্মীয় রাজনীতিকে যে পানজাবের ভোটদাতারা বেছে নিলেন, তাতেই আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

তা হলে এদেশে ধর্মনিরপেক্ষ রাজ-নীতির ভবিষ্যৎ কী? একটা কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় : রাজনৈতিক হিসেবনিকেশের মধ্যে ধর্ম, জাতি, বর্ণ ইত্যাদির প্রশ্ন যত দিন প্রাধান্য পাবে, রাজনীতি যত দিন এই ভেদবুদ্ধিকে প্রশ্রয় দিয়ে, পরিপোষণ করে চলবে, তত দিন রাষ্ট্রনেতার ধর্মীয় প্রভাবের অ-ও-তায় এসে পড়বার বিপদ থেকেই যাবে। পানজাবে আমাদের রাজনীতির এই দুর্বলতা খুবই স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ল। অন্তত আপাতদৃষ্টিতে সারা দেশ দেখল, ধর্মীয় রাজনীতির কাছে নতি স্বীকার করল ধর্মনিরপেক্ষ রাজ-নীতি।

অন্যত্র ঠিক এইরকম পরিস্থিতির উদ্ভব না হলেও, রাজনীতিকে ধর্মের প্রভাবের বাইরে রাখতে যে আমরা সারা দেশেই ব্যর্থ হয়েছি, তার প্রমাণ পাই প্রতি নির্বাচনেই। প্রতেকটি দলেরই রাজনৈতিক রণকৌশলে ধর্ম একটা বড়ো জায়গা দখল করে রাখে। এ নিয়ে এখন আর অনুযোগ করা, মনে হয়, বৃথা। বাস্তব রাজনীতির কাছ থেকে এ ছাড়া অন্য কিছু আশা, করাই বোধ হয় পাগলামি।

যতদিন না ধর্মীয় বিভেদের ভাব লোকের মনে প্রশমিত হচ্ছে, তত দিন রাজনীতি তার মন জুগিয়েই চলবে। এর অন্যথা করবার তার সাহস নেই। এক-মাত্র সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই এই ভেদভাবকে কমিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে! রাজনীতি এগিয়ে এসে কখনোই সে কাজে হাত দেবে বলে মনে হয় না। তবে, একবার যদি রাজনীতিকেরা বুঝতে পারেন যে সেই ধর্মীয় আপন-পর-বোধ সামাজিক, স.ং-স্কৃতিক ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে মেলামেশার ফলে কমে আসছে, তখন অবশ্য তাঁরা রাজনৈতিক হিসেবনিকেশ থেকেও ধর্মকে বাদ দিতে আরম্ভ করতে পারেন।

তার আগে নয়!

সামনে জেনিভা

নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে জেনিভাতে রুশ-মার্কিন শীর্ষ বৈঠক বসছে। জেনিভা হ্রদের তীরে, সুইজারল্যানডে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে, বিশ্ব-ধ্বংসী পারমাণবিক অস্ত্রসম্ভার যাঁদের আদেশের অপেক্ষায় সদা প্রস্তুত, সেই দুই রাষ্ট্রনেতা রেগান আর গরবাচভ মুখোমুখি হবেন। দুজনেরই ঘোষিত উদ্দেশ্য এক, সমস্ত বিনাশের আশঙ্কা থেকে বিশ্বকে কী উপায়ে উদ্ধার করা যায়, পরস্পরের সম্পর্কে তাঁদের দৃ-দেশের যে সন্দেহ, অবিশ্বাস আর ভয় থেকে মারণশক্তির প্রতিযোগিতার উৎ-পত্তি, কী করে তাকে কমিয়ে আনা যায়, কোন্ পথে এগোলে পরস্পরের ওপর সেই আস্থা এবং বিশ্বাস তাঁরা খুঁজে পান, যার ওপর নির্ভর করছে মানব-জাতির জীবন-মৃত্যু।

নিউইয়রকে জাতিসংঘের যে ৪০তম বর্ষপূর্তি স্মারক অধিবেশন সবে অনু-ষ্ঠিত হয়ে গেল, সেখান থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী বিশ্ববাসীর ঐকান্তিক আশা প্রতিধ্বনিত করলেন : প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগান এবং সোভি-য়েট রাষ্ট্রনেতা শ্রীমিখাইল গরবাচভ-এর অ.সন্ন বৈঠক থেকে শুরু হবে সর্ব-নাশের কিনারা থেকে পিছিয়ে আসার প্রক্রিয়া; এ সুযোগ তাঁরা হাতছাড়া হতে দেবেন না।

তার ঠিক আগে, বাহামা দ্বীপপুঞ্জের নাসাউ থেকে কমনওয়েলথ দেশসমূহের রাষ্ট্রনায়কেরা তাঁদের সপ্তাহব্যাপী সম্মেলনের শেষে প্রকাশিত যুক্ত বিবৃতি-তে রেগান আর গরবাচভ-এর কাছে আবেদন করলেন : আপনাদের উদ্দেশ্য সফল করুন, ভূপৃষ্ঠে অস্ত্রপ্রতি-যোগিতা থামান, অন্তরীক্ষে তা নিবারণ করুন।

অকটোবর মাসে নয়া দিল্লির ন্যাশন্যাল ডিফেন্স কলেজে এক ভাষণে রাজীব গান্ধী বলেছিলেন : "পারমাণবিক যুগে মারণশক্তির ভারসাম্যের তত্ত্বের অর্থ দাঁড়িয়েছে আতঙ্কের ভারসাম্য। পার-মাণবিক যুদ্ধের শেষ পরিণতি কী—তা নিয়ে এখনও প্রচুর বিতর্ক। আতঙ্কের ভারসাম্যের কথা বলা মানে শত্রুর সমূহ বিনাশ, নিজের সমূহ বিনাশ, এবং যতদূর সম্ভব পৃথিবীকে সমগ্র জীবজগতের উচ্ছেদ শেষ পর্যন্ত মেনে নেওয়া।

"যে প্রশ্ন আমরা নিজেদেরকেই জিজ্ঞেস করতে বাধ্য, তা হল, এর বিকল্প কিছু আছে কি?

"বিশ্বের সামনে যে বিকল্প আমরা উপস্থাপিত করেছি সেটা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের, যাকে বলা যায় পঞ্চশীল, একসঙ্গে বেঁচে থাকার, পরস্পরকে বোঝার। দিল্লিতে জে.টনরপেক্ষ দেশ-সমূহের সপ্তম সম্মেলনে, নিউ দিল্লি পান, যার ওপর নির্ভর করছে মানব-জাতির জীবন-মৃত্যু।

নিউইয়রকে জাতিসংঘের যে ৪০তম বর্ষপূর্তি স্মারক অধিবেশন সবে অনু-ষ্ঠিত হয়ে গেল, সেখান থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী বিশ্ববাসীর ঐকান্তিক আশা প্রতিধ্বনিত করলেন : প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগান এবং সোভি-য়েট রাষ্ট্রনেতা শ্রীমিখাইল গরবাচভ-এর অসন্ন বৈঠক থেকে শুরু হবে সর্ব-নাশের কিনারা থেকে পিছিয়ে আসার প্রক্রিয়া; এ সুযোগ তাঁরা হাতছাড়া হতে দেবেন না।

তার ঠিক আগে, বাহামা দ্বীপপুঞ্জের নাসাউ থেকে কমনওয়েলথ দেশসমূহের রাষ্ট্রনায়কেরা তাঁদের সপ্তাহব্যাপী সম্মেলনের শেষে প্রকাশিত যুক্ত বিবৃতি-তে রেগান আর গরবাচভ-এর কাছে আবেদন করলেন : আপনাদের উদ্দেশ্য সফল করুন, ভূপৃষ্ঠে অস্ত্রপ্রতি-যোগিতা থামান, অন্তরীক্ষে তা নিবারণ করুন।

অকটোবর মাসে নয়া দিল্লির ন্যাশন্যাল ডিফেন্স কলেজে এক ভাষণে রাজীব গান্ধী বলেছিলেন : "পারমাণবিক যুগে মারণশক্তির ভারসাম্যের তত্ত্বের অর্থ দাঁড়িয়েছে আতঙ্কের ভারসাম্য। পার-মাণবিক যুদ্ধের শেষ পরিণতি কী—তা নিয়ে এখনও প্রচুর বিতর্ক। আতঙ্কের ভারসাম্যের কথা বলা মানে শত্রুর সমূহ বিনাশ, নিজের সমূহ বিনাশ, এবং যতদূর সম্ভব পৃথিবীকে সমগ্র জীবজগতের উচ্ছেদ শেষ পর্যন্ত মেনে নেওয়া।

"যে প্রশ্ন আমরা নিজেদেরকেই জিজ্ঞেস করতে বাধ্য, তা হল, এর বিকল্প কিছু আছে কি?

"বিশ্বের সামনে যে বিকল্প আমরা উপস্থাপিত করেছি সেটা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের, যাকে বলা যায় পঞ্চশীল, একসঙ্গে বেঁচে থাকার, পরস্পরকে বোঝার। দিল্লিতে জে.টনরপেক্ষ দেশ-সমূহের সপ্তম সম্মেলনে, নিউ দিল্লি পান, যার ওপর নির্ভর করছে মানব-জাতির জীবন-মৃত্যু।

নিউইয়রকে জাতিসংঘ, নাসাউ-এ কমনওয়েলথ শীর্ষসম্মেলন, দিল্লিতে জোটনিরপেক্ষ দেশসমূহের সম্মেলন, অর্থাৎ পৃথিবীর মানুষের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর যেখানেই শোনা গেছে, সেখান থেকে ধ্বনি উঠেছে, অস্ত্রপ্রতিযোগিতা বন্ধ করো, পারমাণবিক বিভীষিকার রাজি। কী শর্তে রাজি, তা অবশ্য প্রশমন করো, সামূহিক মৃত্যুর সম্ভাবনা বিনষ্ট করো।

এখন, যাদের কি সারা বিশ্ব তকিয়ে আছে, সেই দুই দেশের কী মনোভাব এ বিষয়ে? প্রকাশ্যে তো তাঁরা ঘোষণা করেছেন, জেনিভা সম্মেলন সফল হোক, দু পক্ষের সেই একই লক্ষ্য। কিন্তু লক্ষের ঘোষণার সঙ্গে বাস্তব পদক্ষেপ সব সময়ে মেলে না। অস্ত্র-হ্রাস প্রয়োজন, সে বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই; পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন, দুপক্ষই তা স্বীকার করেন; দেশের ধনসম্পদের যে বিপুল অংশ অস্ত্রপ্রতিযোগিতায় নিয়োজিত, যতটা সম্ভব তার মুখ মৃত্যুর দিক থেকে জীবনের দিকে, জীবনকে সমৃদ্ধতর করার দিকে, ফিরিয়ে দেওয়া দরকার, তাও মানেন উভয় পক্ষই। কিন্তু এসব সুস্থ, সুন্দর উপলব্ধি ও চিন্তার কথা তাঁরা আজই নতুন ঘোষণা করছেন না। বাস্তবে বাধা কী কী ছিল? সেসব বাধা কি এতদিনে দূর হয়েছে? প্রশস্ত হয়েছে কি লক্ষ্যে পৌঁছবার পথ?

রাজীব গান্ধী সহ জোটনিরপেক্ষ দেশ সমূহের ছজন নেতা মারকিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত রাশিয়ার কাছে প্রস্তাব রেখেছেন, পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে পরীক্ষা তাঁরা নিষিদ্ধ করুন। সংবাদ-সংস্থার প্রদত্ত বিবরণে প্রকাশ, মারকিন পররাষ্ট্র দপ্তর সে প্রস্তাবের সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ দেখায় নি, তাঁদের এক মুখপাত্র বলেছেন, প্রস্তাবটা আমরা বিবেচনা করে দেখছি, কিন্তু মারকিন অস্ত্রসম্ভারের কার্যকরতা বজায় রাখ-বার জন্যে পরীক্ষা চালিয়ে যাওয়া দরকার।

একই দিনে আরেকটি সংবাদ-সংস্থা খবর দিয়েছে, সোভিয়েত রাশিয়া সমস্ত রকম পারমাণবিক পরীক্ষার ওপর স্বেচ্ছায় যে নিষেধ এখন জারি রেখেছে, নতুন বছরেও তা চালু রাখতে রাজি। কী শর্তে রাজি, তা অবশ্য

প্রকাশিত বিবরণ থেকে জানা যাচ্ছে না, তবে সম্ভবত পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা-নিষেধ চুক্তি সম্পন্ন হওয়া আগে দরকার বলে তাঁরা মনে করেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভার রাজনৈতিক কমিটিতে সোভিয়েত প্রতিনিধি জানিয়েছেন, সে চুক্তির খসড়া প্রস্তুত করবার জন্যে আল.প-আলোচনায় বসতে তাঁরা প্রস্তুত।

সে চুক্তি যথাযথ পালিত হচ্ছে কিনা, তা দেখবার জন্যে অপর পক্ষ যদি বিশেষ-বিশেষ জায়গায় পর্যবেক্ষক নিয়োগ করতে চান, তার জন্যে এবং ভূগর্ভে সে পরীক্ষার ফলে যে ভূ-কম্পনের সৃষ্টি হয়, সে বিষয়ে তথ্যের আন্তর্জাতিক আদানপ্রদানের প্রয়োজনীয় সুবিধার জন্যে ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাবও তিনি করেছেন। কিন্তু মার-কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্রের কথায় মনে হয়, তাঁদের আপত্তি অন্য জায়গায় জাতীয় নিরাপত্তার প্রয়োজনে পরমাণ-বিক অস্ত্রের পরীক্ষা বন্ধ অবিধেয়, এই ধারণাই সে আপত্তির কারণ।

এইখানেই রাজীব গান্ধী-কথিত অস্ত্রশক্তির ভারসাম্যের কথা আসে। দুঃখের বিষয়, ভারতের পক্ষে সেই ভারসাম্যের তত্ত্বের বিরোধিতা করা যত সহজ, রাশিয়া কিংবা আমেরিকার পক্ষে তাকে বর্জন করা তত সহজ নয়। সেই-জন্যেই ধাপে-ধাপে, উভয় পক্ষের ভার-সাম্য রেখেই অস্ত্রসম্ভার কমা-নোর কথা বিবেচিত হয়, সেইজন্যেই রাশিয়া পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধ করা নিয়ে চুক্তির কথা বলে।

প্রেসিডেন্ট রেগানও জাতিসঙ্ঘের সাধারণ সভায় তাঁর ভাষণে বলেছেন, "আসুন আমরা দু-পক্ষই জেনিভায় যাই এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে যে আমরা একসঙ্গে নিরস্ত্র পথ ধরে একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করি, স্থায়ী শান্তির ভিত্তি রচনা করি।" তিনি আরও বলে-ছেন, "পারমাণবিক যুদ্ধে জয়লাভ করা যায় না, সে যুদ্ধ কখনোই করা চলে না।

সেইজন্যই জেনিভাতে আমেরিকা আলোচনা করবে আক্রমণাত্মক পারমাণবিক অস্ত্রের বিপুল সম্ভারসমূহ সমূলে এমনভাবে হ্রাস করার কথা, যা হবে উভয় দেশের পক্ষে ন্যায়সংগত, এবং যা যাচাই করা যাবে।"

মারকিন যুক্তরাষ্ট্র যে পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা এই মুহূর্তে বন্ধ করার প্রস্তাব গ্রহণ করতে অক্ষম, তার একটা কারণ বোধহয়, পারমাণবিক অস্ত্রের ওপর সে রাশিয়ার চেয়ে অনেক বেশি নির্ভর করে। তার সৈন্যবাহিনীর আকার অনেক ছোটো, তার প্রথাগত অস্ত্রশাস্ত্রের সম্ভারও ক্ষুদ্রতর। গত কয়েক বছর ধরে আমেরিকা, অস্ত্রশক্তিতে রাশিয়ার সমকক্ষ হবার জন্যে এক বিরাট কর্মসূচির রূপায়ণ করে চলেছে। পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষার ওপর কোনো বাধানিষেধ এই মুহূর্তে তার গ্রহণযোগ্য না হবারই কথা।

প্রতিরক্ষা নিয়ে আমেরিকায় এই বিপুল কর্মোদ্যোগের একটি দিক এখন সারা বিশ্বে একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়। এর নাম এস-ডি-আই, স্ট্র্যাটেজিক ডিফেন্স ইনিশিয়েটিভ, চলতি কথায় স্টার ওয়ারস। এর কথা আগে একবার বলেছি। বলেছি, রাশিয়া থেকে এ নিয়ে প্রবল প্রতিবাদ তো উঠেছেই, মারকিন দেশেও এ সম্পর্কে ঘোরতর আপত্তি এবং সংশয় প্রকাশ করেছেন এমন অনেকে যাঁদের প্রতিরক্ষাবিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ বলা চলে। তবে প্রধান যে দুটো আপত্তি, তার মধ্যে একটু পরস্পরবিরোধিতা লক্ষ করা যায়। (১) বিপুল অর্থব্যয়ে যে প্রণালীটির উদ্ভাবন করা হবে, তার দ্বারা শত্রুর পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের আক্রমণের হাত থেকে দেশকে বাঁচাবার কল্পনা বাতুলতা। (২) শত্রুর পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রসমূহকে এই নতুন প্রণালীতে যদি অকেজো করে দেওয়া হয়, তা হলে শত্রুপক্ষও চুপ করে বসে থাকবে না। অস্ত্রশক্তির ভারসাম্য তাদের প্রতিকূলে বিঘ্নিত হয়েছে দেখে তারাও উন্নততর ক্ষেপণাস্ত্র উদ্ভাবন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। ফলে অস্ত্রপ্রতিযোগিতা আবার দ্বিগুণ তেজে শুরু হয়ে যাবে।

নিছক ন্যায়শাস্ত্রের বিচারে আপত্তি দুটো পরস্পরবিরোধী মনে হলেও দুটোই একসঙ্গে সত্য হতেও পারে, অর্থাৎ বাস্তবিক প্রয়োগে শেষ পর্যন্ত হয়তো দেখা গেল, স্টার ওয়ারস বিশেষ কার্যকর নয়, কিন্তু তার আগেই প্রতিপক্ষ এই নতুন প্রণালীকে অকেজো করবার জন্যে নতুন অস্ত্রের সন্ধান আরম্ভ করতে পারে।

জেনিভার শীর্ষ বৈঠকে এই স্টার ওয়ারস কোনোরকম বোঝাপড়ার পথে একটা প্রধান বাধা হয়ে উঠতে পারে বলে অনেকে মনে করছেন। রাশিয়া যে সহজে মারকিন প্রতিরক্ষার এই নতুন উদ্যোগটি মেনে নেবে তা মনে হয় না। অথচ আমেরিকাও স্টার ওয়ারস উদ্যোগ বর্জন করবার কোনোরকম ইচ্ছাই প্রকাশ করছে না। বরং প্রেসিডেন্ট রেগান জাতিসংঘে বলেছেন, "মানুষের ইতিহাসে যত অস্ত্র দেখা গেছে তার মধ্যে পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র সবচেয়ে ভয়ংকর, মারাত্মক ও বিধ্বংসী, এবং শেষ পর্যন্ত তাকে পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে ফেলতেই হবে। তা যতদিন না হয়, পারস্পরিক আতঙ্কের এই কারাগার থেকে আমেরিকা মুক্তির পথ খুঁজছে এমন গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে যাতে আমরা কালক্রমে পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের বিপদ দূর করতে পারি, যাতে শেষ পর্যন্ত সেগুলো অচল হয়ে পড়ে।"

অর্থাৎ স্টার ওয়ারস উদ্যোগ চলতেই থাকবে, যতদিন পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র থাকবে।

আর, স্টার ওয়ারস উদ্যোগের দরুন অস্ত্রপ্রতিযোগিতার বৃদ্ধি? প্রেসিডেন্ট রেগান বলেছেন :

"প্রায় আঠারো বছর আগে সোভিয়েত রাশিয়ার তখনকার প্রধানমন্ত্রী আলেকসি কোসিগিনকে ক্ষেপণাস্ত্র-ধ্বংসী প্রতিরক্ষাপ্রণালীর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। উত্তরে তিনি বলেন, "আমার মতে, যেসব প্রতিরক্ষাপ্রণালী আক্রমণ প্রতিরোধ করে, সেগুলো অস্ত্রপ্রতিযোগিতার কারণ নয়। সেগুলো মানুষের মৃত্যু নিবারণ করে...মানুষকে হত্যা করা নয়, মানুষের জীবন রক্ষা করাই সেগুলো উদ্দেশ্য।"

কাজেই, স্টার ওয়ারস বর্জন করবার মতো মনোভাব অন্তত এই মুহূর্তে প্রেসিডেন্ট রেগানের মধ্যে আদৌ দেখা যাচ্ছে না। বিশেষত যখন, আমেরিকার বিশ্বাস, রাশিয়া গত দুই দশক ধরে বিপুল উদ্যমে এইজাতীয় প্রতিরক্ষাপ্রণালী নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে।

তা সত্ত্বেও জেনিভা শীর্ষবৈঠক সম্পূর্ণ নিষ্ফল নাও হতে পারে। তার কারণ, প্রেসিডেন্ট রেগান তার এই শেষবারের মেয়াদে মারকিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ইতিহাসে একটা কীর্তি রেখে যেতে চাইতে পারেন, এবং গরবাচভের সম্পর্কে এইরকম ধারণা করবার কারণ ইতিমধ্যেই আমরা পেয়েছি যে তিনি বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন কুশলী রাষ্ট্রনায়ক। অসম্ভবের পেছনে ধাবিত না হয়ে, যে পথে গেলে অস্ত্রপ্রতিযোগিতার গুরুভার একটু হালকা করা যায় সেই পথেই যাবেন, যাতে রাশিয়ার যে বিপুলপরিমাণ সম্পদ প্রতিরক্ষাখাতে ব্যয় হয়ে থাকে, তার কিয়দংশ জনসাধারণের আশাপূরণে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির কাজে লাগাতে পারেন। সেই ধরনেরই তাঁর চিন্তাধারা।

৩১.১০.৮৫

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সিনেমা

'পরমার মুক্তিতে আমরা খুশি'

এক পুরুষের উক্তি

ছবির শিল্পপারিপাট্য বা ডিটেলের কাজ নিয়ে বোধহয় তেমন বিতর্ক নেই। সবাই বলছেন চিত্রগ্রহণ ভালো, আবহসংগীত চমৎকার, রঞ্জন নয়ননন্দনকর, অভিনয়ও যথাযথ, তবে বিষয়বস্তু খুবই বিতর্কমূলক। সম্ভবত সাম্প্রতিক কোনো বাঙলা চলচ্চিত্রই 'পরমা'র মতো এত মতান্তর ঘটায় নি। শ্রীযুক্তা অপর্ণা সেন প্রচলিত মূল্যবোধ আর নীতিবোধকে ধাক্কা দিয়েছেন, আঁদ্রে জিদ যেমন বলেছিলেন 'টু ডিসটারব দ্যাট ইজ মাই রোল'—সেখানেই তাঁর জয়। আমাদের দেশে মহিলা-কবি, মহিলা-চিত্রশিল্পী, মহিলা-ঔপন্যাসিক ইত্যাদি বলে যেমন এক ধরনের প্রশ্রয়ের ব্যাপার আছে, অপর্ণা সেনের গৌরব সেখানেই, যেখানে তিনি মহিলা বলে নয়, পরিণত কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার আর পরিচালক বলেই স্বীকৃত। এখানেও তাঁর জয়।

যত দিন যাচ্ছে, ছবিটি ততই বেশি-বেশি দর্শক টানছে। কিছু-কিছু এলোমেলো অসংযত আলোচনা শুনে যাঁরা মনে করেছিলেন রগরগে কিছু ব্যাপার ছবিটিতে দেখা যাবে, তাঁদের ঢেউ এখন প্রায় অবসিত। এখন দেখতে আসছেন ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতী, গৃহবধূ, এমন-কি বয়স্কা প্রৌঢ়ারাও। তাঁদের মুখে কোনো দৃশ্য বিষয়ে মশগুল টকঝাল আলোচনা শুনছি না, শুনছি বরং বিষয়বস্তু নিয়ে ব্যাখ্যা। পক্ষে এবং বিপক্ষে।

'পরমা'র আখ্যানভাগ আহা-মরি এমন কিছু নয়। তবু বাছাই করার মধ্যে একটা দৃষ্টিভঙ্গি আছে। সংক্ষেপে কাহিনীটির পুরো ছবিটি মেলালে মোটা দাগে এইরকম :

উত্তর কলকাতার পুরনো এক অভিজাত পরিবারের সুন্দরী মেয়ে পরমা। পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্য এখন আর নেই। অট্টালিকাও ভেঙে পড়েছে। তালপুকুরে আর ঘটি ডোবে না। তেমন পরিবারের সুন্দরী মেয়ের যেমন হয়। পড়তি ঘরের সুন্দরী মেয়েটির বি-এ পরীক্ষার আগেই বিয়ে হয়ে যায় 'উঠতি' চৌধুরী-ঘরে। মেয়েটি ছেলেবেলায় দেখেছে তার এক তরুণী বিধবা পিসি একটি ঘরে বন্দিনী। সম্ভবত কোনো প্রেম বা 'পাপে'র ফলেই তার ওই বন্দিনীদশা। পিসিমা 'শিকল খুলে দেবা'র জন্য ছোটোদের অনুনয় করত। আর পরমা তরুণী বয়সে সেতার শিখেছে। কবিতাও পড়ত। আর শ্যামকাঞ্চন বা ক্যালেনডুলা ফুল ফুটে উঠতে দেখারও তার আগ্রহ ছিল। ছাত্রীজীবনের কয়েকজন বান্ধবীও তার ছিল। তাদেরই একজন শীলা, প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষকতা ও আপন শিল্পকর্মের দাবিতে, শেষ পর্যন্ত স্বামীর সঙ্গেও সম্পর্ক ত্যাগ করেছিল।

পরমা এখন সুখী গৃহবধূ। শ্বশুরবাড়িতে এজমালি দুর্গাপুজো আছে, নানা আত্মীয়পরিজন আছে। তবে স্বামী এলগিন রোডে একটি বড়ো ফ্ল্যাটে থাকে। তাদের তিনটি সন্তান। মেয়েটিতো প্রায় ষোড়শীই। পরিবারে রয়েছেন শাশুড়ি মহোদয়া, মাতৃভক্ত এবং কেরিয়ার-আসক্ত স্বামী। তা ছাড়া একজন চাকর আর একটি ঝি বা রান্নার মেয়ে। পুরনো ফিউডাল পরিবারের ছেলে ভাস্কর চৌধুরী একজন বড়ো বিজনেস-এগজিকিউটিভও। জাপানিদের সঙ্গে কোলাবরেশন প্রজেক্টে সে শিগগিরই গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যার শেয়ারহোলডারও হবে। ফিউডাল পরিবারের ছেলের পেটিবুরজোয়া রূপটি এখন বুরজোয়া রূপান্তরের জন্য তৈরি। আর পরমা এখন মা, বউমা, স্ত্রী, গৃহিণী, কাকিমা, বউদি ইত্যাদি ইত্যাদি অভিধার বহিরঙ্গেই পরিচিতা। শুধু ওই নামাবলীর দায় মেটাতে তার অন্তর্গত পরমা একসময় হারিয়ে যেতে থাকে, বা তার কোনো পরিচয়ই আর জানা যায় না। এমনি সময় স্বামী ভাস্করের ভাইপোর বন্ধু রাহুল রায়, যে কিনা বিশ্বখ্যাত ফটোগ্রাফার, যে লেবাননে যুদ্ধের ছবি তুলে বিখ্যাত হয়েছে, তার ঘটল ওই মউচাকে প্রবেশ। তার ইচ্ছা বাঙালি আদর্শ গৃহবধূ হিসেবে পরমার কিছু ছবি তোলা। রাহুলের ক্যামেরায় ফোটো তোলার ঘোর বিরোধী হলেও পরমা, পরমার অনুমোদনের কোনো প্রয়োজন পড়ে না ভাস্করের। ভাস্করের মা-র অনুমোদনই যথেষ্ট। রাহুলের ফোটোগ্রাফও তো স্ট্যাটাস সিমবল। আর ভাস্কর চলে যায় বোমবাই ওই কোলাবরেশন প্রজেক্টটাকে দলিলিকৃত করার জন্য। সচ্চরিত্র, পরিবারের কর্তা ভাস্কর কিন্তু বাড়ির বাইরে, বোমবাই গিয়ে মদ্যপানে একটুও বিরাগী নয়, এমন-কি তার তরুণী সেক্রেটারিকে তার সঙ্গে রাত্রি কাটাবারও প্রস্তাব করে। সে প্রত্যাখ্যাত হয়। মেয়েটিকে সে তখন বলে 'বীচ'।

ইতিমধ্যে 'পরমা'র জীবনে ঝড় বয়ে গেছে। রাহুল এসেছে। যেন অজানতেই। পুরনো পিতৃপরিবারের পিসির বিষয়ে কথা বলতে-বলতে, ছেলেবেলার স্মৃতির কথা বলতে-বলতে, শ্যামকাঞ্চন ফুলের কথা বলতে-বলতে, সেতার শেখার কথা বলতে-বলতে যখন সে স্মৃতির মধ্যে ডুবে যেতে-যেতে আবেগে আপ্লুত, তখনই ঢের দিন ধরে বন্ধ পিসির ঘরের জানালা খুলে দিতে গিয়ে পায়রার ঝাপটায় তাকে রাহুলের বুকের ওপর ফেলে দেয়। আর সেই ভর্টেক্স অব অ্যাংগুইশ-এর তুঙ্গ মুহূর্তে রাহুল তাকে চুম্বন করে। দেহের ভেতরের আর মনের ভেতরের সব অবদমন একমুহূর্তে অর্গলমুক্ত হয়ে যায় বলে, সেও অজানতে প্রতিদান দেয়। কিন্তু পরমা এতে নিজেকে অপরাধী বোধই করেছে, ভাস্করকে

বোমবাইতে টেলিফোন করেছে অশ্রুরুদ্ধ-গলায়, আর ভাস্কর ওই টেলিফোন পাবার একটু পরেই তার সেক্রেটারিকে রাত কাটাবার প্রস্তাব দেয়। ভাস্কর খুব ভালো আদর্শনিষ্ঠ সাফল্যের প্রতীক এক প্রৌঢ়! 'পরমা' বেচারাই অপরাধবোধে ভুগতে থাকে। তবু নিয়তির মতোই রাহুল। রাহুল তার বহু ছবি তোলে। হোটেলের বিছানায় দুজনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও ঘটতে থাকে। তারপর একদিন রাহুল আমেরিকায় চলে যায়, আর, সেখান থেকে পাঠানো 'লাইফ' ম্যাগাজিনে পরমার অর্ধনগ্ন চিত্র পরমার 'সুখের সংসার' বিষাক্ত করে তোলে। শাশুড়ি হয়ে পড়েন অসুস্থ। স্বামীও তাকে বলে 'হোর'। পরমা তার 'অপরাধের' প্রতিতুলনা হিসেবে স্বামীর ওই ধরনের কোনো অ্যাফেয়ার আছে কিনা বুকে হাত দিয়ে উত্তর দিতে বলে। এভাবে স্বামীর কাছে তার 'অপরাধে'র একটা যুক্তি খোঁজে, তার আগে অসুস্থ শাশুড়ির ঘরেও (সম্ভবত) ক্ষমা প্রার্থনা করতে যায়। কিন্তু সেখানেও ব্যর্থ হয়: বন্ধু শীলার কাছে রাহুলের খবর জানতে যায়। কিন্তু রাহুলের খবর না জানায়, শেষ পর্যন্ত হাতের শিরা কেটে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। হাসপাতালে ডাকতার তাকে মনোরোগের শিকার বলে ভাবতে থাকে। শীলার কাছে পাওয়া খবরে জানতে পারে পরমার আর রাহুলের কাছে যাবার কোনো আশা নেই। আর, শীলা তাকে ছশো টাকা মাইনের খাদি গ্রামোদ্যোগের দোকানে সেলসগারল হিসাবে কাজের সুযোগ এনে দেয়। পরমার কাছে তখন স্পষ্ট হয়, সত্যিই তো তার কোনো অপরাধবোধ নেই। বন্দিনী ছিল সে যতদিন, ততদিন সে ছিল নির্ভরশীলা। তার ব্যক্তিত্বের দিকে তার নারীত্বের দিকে, তার অন্তর্গত মনুষ্যত্বের দিকে কারো লক্ষ্যই ছিল না। মানুষের যা অন্তঃসার, যা মানুষকে গড়ে তুলেছে, সেই শ্রমই যখন তার বাহন হয়ে উঠল, পরমার মুক্তির জগৎটাও খুলে গেল তখন। সে মুক্তি কল্পনায় ভরা রাহুলের স্বপ্ন দেখানো নয়। বরং তা পিসির শিকলভাঙার ডাক শোনা, বালিকা বয়সে শ্যামকাঞ্চনের ফুটে ওঠার সাফল্যে সফল। ঐ শ্যামকাঞ্চনের টবটি রাহুলই তাকে উপহার দিয়েছিল। রাহুল পরমার মুক্তির ভুবনে পা দেবার উপলক্ষ মাত্র, উপকরণ সে, যে তার অন্তর্গত মানুষটিকে জাগিয়েছে শুধু—আসলে আপন মনুষ্যত্বের মহিমায় পরমারই আপন শ্যামকাঞ্চন ফুটে উঠেছে। তার ষোড়শী মেয়ের সঙ্গে সে হাসপাতালে গভীর স্নেহে এবার কথা বলে। দুজনেই দেখে শ্যামকাঞ্চনের ফুল। পিসিমা বলেছিলেন শিকল খুলে দিতে, পরমার শিকল খুলতে বড়ো বেজেছিল, তার মেয়ের কাছে সেই শিকলের স্মৃতিও একেবারে অকিঞ্চিৎকর হয়ে উঠবে একসময়!

দারুণ মোটা দাগে 'পরমা'র কাহিনীটি বলা হল। এখন প্রশ্ন উঠবে, স্বৈরাচারিণী একটি মেয়েকে নিয়ে এমনভাবে যদি 'মুক্তি'র কোনো কথা বলা হয়, তবে তো 'পরিবারের পবিত্রতা' গোল্লায় যাবে। একশো বছর আগে ইবসেন নোরার মুখ দিয়ে বলে গেছেন 'পুতুলখেলার' সংসারের শূন্যগর্ভতার কথা। নোরাকে নিয়ে যাঁরা সমালোচনা করেছেন, সেসব পড়ে নিলেই পরমার 'নষ্ট চরিত্রে'র বিষয়ে সব সমালোচনা পড়া হয়ে যাবে। অবশ্য পরমা নোরার চেয়েও 'নষ্ট'। অনেকটা আন্না কারেনিনার মতো। তলস্তয় শেষ পর্যন্ত আন্নাকে বাঁচতে দেন নি। আত্মঘাতিনী করেছিলেন। পরমাও আত্মঘাতিনীই হতে গিয়েছিল। আন্নার তো আর 'নারীর' মুক্তির ব্যাপারটা ছিল না। ছিল গম্ভীর অভিজাত নিয়মনিরূপিত স্বামীর তুলনায় দুর্বলচেতা অথচ উন্মাদ প্রেমিক ভ্রনস্কির প্রতি অন্ধ আসক্তি। আন্নার পিছুটানে ছিল তার শিশু। ছিল ভ্রনস্কির বিশ্বাসভঙ্গ। পরমা কিন্তু কোনো বিশ্বাসভঙ্গের মুখোমুখি হয় নি। সে হয়েছে আপনারই মুখোমুখি। তার স্বামী আর পরিজন তাকে সংসারে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়, সেই সুন্দর 'সুখী' পরিবারে। আর প্রবল 'অসুখী' পরমা সে সুখ ছেড়ে দিয়ে আপন হাতে আপনার ভাগ্যকে জয় করে নেবার দায় বহন করতে চলে যায়।

শ্রীমতী অপর্ণা সেন সার্ত্র ও বোভোয়ার একটি নারীমুক্তিবিষয়ক বিতর্কের নিজের মতো করেই উত্তর দিয়েছেন। সার্ত্র বলেছিলেন, কোনো ধনী ব্যক্তির স্ত্রী যদি হঠাৎ স্বামী-পরিত্যক্ত হয়, সে নিজেকে দেখবে তার দাম দুনিয়ায় কানাকড়িও নয়। অপর্ণা দেখিয়েছেন, সেই নারী যদি স্বাধীনভাবে জীবিকা-অর্জনের লক্ষ্যে পৌঁছায়, তবেই তার বন্দীদশা থেকে নিরাময়ও ঘটে।

ওপরের কথাগুলিও খুব স্থূলভাবেই বলা হল। তা হোক। আসলে তো পেটিবুরজোয়া পরিবার নিয়েই প্রশ্ন। কোনো-কোনো বিপ্লবী বন্ধু বলছেন, গরিব শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে লড়াইটাই যখন অ্যাজেনডায়, তখন এসব দেখানো আসলে সত্যিকারের বাস্তব চিত্রকে দেখতে না দেওয়া। আমি তাঁদের সঙ্গে বিতর্কে যাব না। শুধু বলব, দেশের জনসংখ্যার তো অর্ধেকই নারী। আর সত্যিকারের যা মূল্য তা না দিয়ে যখন উৎপাদনের একটা অংশ সমাজ-অর্থনীতির বিশেষ অবস্থানের দাক্ষিণ্যে জমিদার বা জোতদার কেড়ে নেয়, আমরা তাকে বলি অ-অর্থনৈতিক পীড়ন (নন-ইকনমিক কোয়ারশন)। এই অ-অর্থনৈতিক পীড়ন চলে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে পুরুষ-শ্রমজীবীর থেকে মেয়ে-শ্রমজীবীর উপরে অনেক বেশি। এমনকি শ্রমজীবী পরিবারেও পুরুষপ্রাধান্যের দরুন মেয়েদের উপর নিপীড়ন বেড়েই চলে। আসলে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে যে-শ্রেণীর প্রাধান্য, সেই শ্রেণীর ভাবাদর্শই সমাজের মূল ভাবাদর্শ হয়ে থাকে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে পরিবার যদিও সমাজের সবচেয়ে ছোটো একক, ওই এককেও গোটা সমাজের প্রতিফলন থাকে। সেখানে পরিবারকে যতই গৌরবের মূল্য দিই না কেন, তাও শোষণেরও এক নমুনামূলক একক। আর, পুরুষপ্রধান সমাজে যে-কোনো পরিবারে মেয়েরাই সবচেয়ে বেশি শোষিতও। তার আত্ম-উন্মোচন উপেক্ষিত। সতীসাবিত্রীর নানা অভিধা তার উপর চাপিয়ে দিয়ে, তার মনোরাজ্য বিকলাঙ্গ বা অথর্ব করে দিয়ে, তার ব্যক্তিত্বহীনতাকেই ঢাকঢোল পিটিয়ে দেবীত্বের সম্ভ্রম দিয়ে তাকে গড়া হয়েছে যৌনভোগের উপকরণ, শ্রমোৎপাদিকা হাতিয়ে নেবার উপাদান এবং অপর নারীকে বাধ্য রাখার বাহন। এবং এইসব কাজে যে নারী দড়ো সে-ই সাজানো-গোছানো পুতুলের মতো হয়ে ওঠা পরিবারের স্ট্যাটাস সিমবল আর কর্ত্রী।

অপর্ণা পরমাকে দেখিয়েছেন প্রথমে ব্যক্তিত্বহীনা গৃহিণী হিসাবে। সমস্ত আত্মীয়পরিজনকে আপ্যায়ন করা, সময়মতো এ-ওর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এগিয়ে দেওয়া, এমন-কি সমাজের পুরনো মূল্যবোধ আঁকড়ে ধরা শাশুড়ির ভাবনার ছাঁদে খাপে-খাপে-বসে-যাওয়া এক পুতুল। খুবই সার্থক পুতুল। তার বন্ধু শীলার নিজস্ব ব্যক্তিত্ববিকাশের দাবিকে যখন প্রবীণেরা নিন্দা করে, সেও তাতে সায় দেয়। অর্থাৎ তারই ষোড়শী মেয়ের ভাষায় পরমা তখন 'একেবারে সেকেনড হ্যানড'। সে বাজারের পাইপয়সাটিরও হিসাব রাখে ঠিকঠাক। ধোবাকে যথাযোগ্য সময়ে সমঝে দিতে জানে। স্বামীর পোশাক-আশাকের নিখুঁত নিয়ন্ত্রণ রাখে। শাশুড়িকে সময়মতো মনে করে ওষুধ দেয়। ছোটো ছেলেকে ঠিক সময় পড়াতে বসে। স্বামী বিছানায় গেলে ঠিকঠাক প্রসাধন সেরে শয্যাসঙ্গিনী হবার পুরো প্রস্তুতি নিয়ে বিছানায় যায়। কিন্তু বিছানায় যাবার আগে হঠাৎই প্রসাধন-পর্বে হাতে ঠেকে যায় তার বিবাহপূর্ব-জীবনের সেতারের মেজরাপটি। জাপানি কোলাবরেশন প্রজেকট-এর সাফল্য বিষয়ে খুশি স্বামী তাকে কাছে টানে, উপভোগ করে, কিন্তু স্বামীর কাঁধে নিস্পৃহ পরমার আঙুল অজানতে সেতারের তারের ওপর কাঁপতে থাকে যেন। তার তো কোনো মন নেই। স্বামীর ইচ্ছাতেই তার ইচ্ছা। শুধু অন্ধকার অতীত থেকে হঠাৎই বয়ে আসে সেতারের স্মৃতি। যেখানে সে ছিল শিল্পী। ছিল আত্মনিবেদিত। পরমার শিল্পী-বান্ধবীর ঘরে আঁকা তার "ব্যক্তিগত সম্পত্তি" হিসাবে প্রতিবন্ধী এক বালিকার চোখ দেখে সে। সে চোখ বড়ো করুণ। কিন্তু প্রতিবন্ধীদের স্কুল গড়ে তুলে, তারপর তা সাফল্যে নিয়ে আসা বান্ধবীর কাছে প্রতীক হিসাবে পরমাও তো প্রতিবন্ধী। এরকম বহু ছোটো-ছোটো ডিটেলের কাজ আছে 'পরমা' ছবিটিতে। ডেনজারাসলি বাঁচবার কথা খুব হালকাভাবে তাকে শুনিয়েছিল রাহুল। রাহুল তো ঠিক ছাঁচমেলানো মানুষ নয়। তার কাছে মুক্তির হাওয়াটুকুই ছিল, একটু-আধটু বাইরের ছবিও ছিল তার কাছে—কিন্তু মুক্তি ছিল পরমার নিজের কাছেই অপেক্ষিত হয়ে। গ্রীসের ক্যাথিড্রালে মেয়েদের যে ঢুকতে দেওয়া হয় না, তাও খুব ক্যাজুয়ালি বলেছে রাহুল, এতে পরমার খুব ভাবান্তর হয় না। রাহুলের হালকা কথা, তার কল্পনায় মারকিন দেশ ওয়াগনে ভ্রমণ, অনিকেত সেই যাত্রা খুব রোমানটিক মনে হলেও-যে পায়ে তার মাটি নেই তা পরমা বোঝে ওই মারকিন কল্পভ্রমণের কাহিনীবিন্যাসে মুখ ফসকে বলে ফেলে তবলচীর নাম আল্লারাখা। নাকি পরমা নিজের মধ্যে সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখে রবিশঙ্কর না বিলায়েৎ নাকি নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের। রাহুলের অনেক কিছুই ক্যাজুয়াল। কিন্তু তা সবই পরমার দুদণ্ডের মুক্তির হাওয়া। কিন্তু সর্বশেষে প্রসাধনহীন, কেয়োকার্পিনে-পুষ্ট-কেশগুচ্ছ-কর্তিত পরমা মুখোমুখি হয় ওল্ড স্পাইসের আফটারশেভ লোশনের সুগন্ধে ম-ম ভাস্করের। মুখোমুখি ভাস্করের বোন, ভগ্নিপতি, ডাকতার ও তার নিজের মেয়ের। এই ভাস্কর চৌধুরীই পরমা-নামক 'পণ্য'-স্বরূপিণী নারীকে নিউইয়রকে তার জমানো ডলারে দারুণ-দারুণ দোকানে শপিং-এর সম্ভাব্যতার ছবি তুলে ধরেছিল। অর্থাৎ নর্মসহচরী সুগৃহিণী পরমার যেন পরম সুখ ওই শপিং-এই। ওই বন্দীদশা থেকে পরমার মুক্তিতে আমরা খুশি হই। ফিউডাল-বুরজোয়া, পেটিবুরজোয়া পরিবারের দাসত্বের পরম্পরায় নারীর কোনো মুক্তি ঘটে না। মুক্তি তার শ্রমজীবী ভূমিকার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। 'পরমা' এই শিক্ষাই দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত করে। আর সেই শিক্ষা তেমন পরিবারই গড়ে তোলবার অভিজ্ঞান বহন করে—যেখানে পুরুষ-নারীর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা তাদের প্রভু-দাসীর সম্পর্কের মধ্যে নেই, রয়েছে দুজনের স্বাধীন শ্রমমাধ্যমের দাক্ষিণ্যে, প্রেমে। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের এত বড়ো সত্য কথাটা 'পরমা' দেখে যদি ভুলে গিয়ে তথাকথিত বুরজোয়া পরিবারব্যবস্থা রক্ষার জন্য দাবি জানাতে থাকি, তা হলে আর যাই হোক, বিংশ শতাব্দীর সমাজতান্ত্রিক মানবিক মুক্তির সঙ্গী হতে পারি না।

'পরমা'র নানা দুর্বলতা আর অসংগতির কথা তুলে লাভ কী? বিপ্লবে বহু ঘর ভাঙে, রাজরাজত্ব ভেঙে পড়ে, তা বলে কি বিপ্লব আমরা চাইব না? বিপ্লব তো আবার নতুন করে ঘরসংসার আর নতুন ধরনের উন্নত সমাজব্যবস্থাও এনে দেয়।

অপর্ণা সেনকে ধন্যবাদ। বিজ্ঞাপন-সেবিত সংবাদপত্র, টিভি ইত্যাদিতে দেখানো হয় 'সুগৃহিণী' পরমাদেরই—তা সে রন্ধনমাধ্যম মশলার বিজ্ঞাপনই

হোক বা পোশাক কিংবা প্রসাধনই হোক। অপর্ণা সেন তার বিরুদ্ধে তাঁর পরমাকে পরমোত্তীর্ণ করে দেখান। বুরজোয়া ব্যবস্থাকে আগাপাশতলা এমনভাবে আঘাত করতে পেরেছেন কজন?

তরুণ সান্যাল

‘পরমা’তে ভুলের খতিয়ান

এক মহিলার বিশ্লেষণ

ভাগ্যিস ‘৩৬ চৌরঙ্গী লেন’ ইংরিজিতে তৈরি হয়েছিল মিস স্টোনহ্যামের কল্যাণে। ‘পরমা’ ইংরিজিতে করার দরকার হয় নি যেহেতু রাহুলকে শাদা সাহেব করেন নি অপর্ণা, যদিও তার মূল্যবোধগুলি সবই পশ্চিম দুনিয়ার দান! কিন্তু আমার মনে হয়েছে এ ছবিটাও ইংরিজি বা হিন্দিতে করলে বুদ্ধির কাজ হত। যত গোলমাল বাঙলার জন্যে।

এর চেয়ে ঢের বেশি খোলাখুলি সেকস দেখতে বাঙালি দর্শক অভ্যস্ত, কিন্তু বাঙলা ভাষাতে নয়। বাঙলা ভাষা মানেই প্রথাসিদ্ধ মূল্যবোধের মালা। অন্য কোনো ভাষাতে ‘পরমা’ হলে বাঙালি দর্শকের এতটা কালচার-শক লাগত বলে মনে হয় না। হিন্দিতে বা মালয়লামে তৈরি হলে বাঙলার দর্শক পরমাকে আর্ট ফিলম বলে ধরতেন, রীতিমত গ্রহণযোগ্য, এমনকি উপকারী শিল্পকর্ম বলে পরিগণিত হতে পারত ‘পরমা’।

তবে এও সত্যি যে অতগুলি শয্যা-দৃশ্য ‘পরমা’র মূল গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যার দিক থেকে অমনোযোগী দর্শকদের মন সরিয়ে দিয়েছে। একটি প্রধান ভুল হয়েছে রাহুলের সঙ্গে পরমাকে অতবার বিছানায় (যদিও হাসপাতালের রুগীর মতো রাখী চাদর ঢাকাঢুকি দিয়ে থাকেন) দেখানো। নারীমুক্তির প্রশ্নটি বিভ্রান্তির মুখোমুখি হয়েছে ওখানে। (যদিও দক্ষিণী ছবিগুলির তুলনায় বা বমবে ছবির সুইমিং পুলের দৃশ্যের তুলনায় এখানে যৌনতা ঢের কম—এইসব শয্যা-দৃশ্যের অন্য তাৎপর্য আছে, যৌনতা এর উদ্দেশ্য নয়। বরং ‘পরমা’ একটু বেশি চড়া-গলায় নীতিপরায়ণ।)

আসলে অপর্ণার হিসেবে অনেকগুলি ভুল ছিল। তাঁর ধারণা হয়েছিল বাঙালি দর্শকসমাজের প্রস্তুতি আছে পরদায় আত্মদর্শনের, আছে সত্যদর্শনের মতো পরিণতমনস্কতা এবং সততা-বোধ। তা ছাড়া ‘পিকু’ ইত্যাদির প্রতিক্রিয়া থেকে ওঁর এও মনে হয়ে থাকবে যে, শিল্পকর্মের বিচার করতে বসে শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবনকে টেনে আনার মতো কাঁচা ছেলেমানুষিকে বাঙালি দর্শক প্রশ্রয় দেবেন না। কিন্তু অপর্ণার মনে ছিল না, তিনি নারী। এখনো এদেশে নারীর শিল্পকর্মের বিচারে নৈর্ব্যক্তিক চোখ থাকা দুর্লভ।

অপর্ণা ‘পরমা’তে একসঙ্গে অনেকগুলি জরুরি প্রশ্ন তুলেছেন—জীবনের নানা জটিল দিককে উদঘাটিত করতে চেয়েছেন—তাই অনেক সমস্যাই অস্পষ্ট রয়ে গিয়েছে—গ্রন্থি-মোচন ঘটে নি। তবে ছবিতে গ্রন্থি-মোচনের কোনো দায়িত্বও পরিচালকের নেই।

‘শত্রু’ দেখতে যেমন ভিড় হয়েছিল ‘পরমা’ প্রায় সেরকমভাবেই লোক টানতে শুরু করেছে। ‘শত্রু’কে দর্শক ভক্তভাবে ভজনা করেছিল, ‘পরমা’কে কিন্তু শত্রুভাবে ভজছে। কেননা, ‘পরমা’ ‘শত্রু’-র মতো আদর্শবাদের চিত্র নয়, ‘পরমা’ আদর্শচ্যুতির ছবি। মানুষ দুর্বল, মানুষ-নশ্বর। ‘পরমা’ সেই নশ্বর, দুর্বল, রক্তমাংসের প্রাণীর কাহিনী। মুখে যে যাই বলুক, এ ধরনের ঘটনা আকছারই দেখছি এ-বাড়ি-ও-বাড়িতে। কিন্তু জীবনে যা দেখি, আমরা রুপোলি পরদায় কি সেটা সহ্য করতে পারি?

অপর্ণার কতগুলি হয়তো হিসেবের ভুল হয়েছিল। ‘পরমা’ খুবই গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দলিল হতে পারত, দর্শকদের এতটা এলিয়েনেট না করেও, যদি রাহুল রায়কে আমরা আরেকটু চিনতাম। বমবে ছবির নায়ক-নায়িকাদের বিশাল-বিশাল প্রাসাদ, দীর্ঘ-দীর্ঘ মোটরগাড়ি আর বিলিতি ঢং-কায়দা, মেমসায়েবি পোশাক, সবই আমরা মেনে নিই—কেননা ওদের কাউকেই আমরা চিনি না, সবটাই রূপকথা। নায়কও অচেনা, নায়িকাও তাই, ঘটনাগুলিও বাস্তব জীবনে অসম্ভব। কিন্তু ‘পরমা’ তা নয়। পরমার খুবই বিশ্বাসযোগ্য পরিবার, কাহিনীও বিশ্বাসযোগ্য, চরিত্রগুলিও তাই। কিন্তু মুশকিল হয় রাহুল রায়কে নিয়ে।

রাহুল রায়ের ভূমিকা খুবই জরুরি, অথচ সে নামেমাত্র বাঙালি। তার নড়াচড়া, চলাফেরা, তার বিলিতি জিনস, বুটজুতো, তার মূল্যবোধ, তার পরিপার্শ্ব (ঠোঁটে বিলিতি গানের শিশ, পশ্চাৎপটে বিলিতি বাজনা বাজে, সঙ্গে বিলিতি গারলফ্রেনড আসে) সবই বিদেশী—তার বাঙলা বলার অ্যাকশেনট পর্যন্ত মারকিনি। হঠাৎ এমন একটি বিদেশী ছেলের চোখেই পরমার অন্তর্নিহিত মূল্য ধরা পড়ল। সেটাই কি বেশি-বেশি রাগিয়ে দিয়েছে বাঙালি মধ্যবিত্ত দর্শককে? কী জানি! আমরা বরং ভাস্করকে চিনি, পরমাকেও চিনি, চিনি না রাহুলকে। সে বাইরের লোক, আমাদের ঘরের ছেলে নয়, পাড়ার ছেলে নয়। হ্যাঁ, উচ্চবিত্ত শহুরে পরিবারগুলিতে অবশ্য প্রতি-বছরই রাহুলের মতো অতিথিরা উড়ে আসেন সাগরপার থেকে—কিন্তু সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালির সঙ্গে তাঁদের তেমন চেনাশুনো নেই।

রাহুলের আনা মূল্যবোধও তাই (ভালোমন্দ যাই হোক) আমাদের দর্শকদের কাছে গ্রহণযোগ্য বা বিশ্বাসযোগ্যও মনে হয় না—ওসবই তো বিলিতিআনা। বাঙলায় চলে না। বোধহয় ভালো হত, রাহুলের চরিত্রটি অপর্ণা যদি দেশী ঘরানার কোনো যুবককে দিতেন। পরমাকে আত্ম-সচেতন করে তুলতে যদি কোনো পানজাবি-পাজামাপরা তরুণ কবি বা বিপ্লবী বেকার তরুণ নাই পারে; বেশ, জিনসপরা, শিশদেওয়া, ঝাঁকড়াচুলো স্মার্ট ফোটো-জারনালিসটই না হয় হল—কিন্তু চাকরিটা সে কোনো দেশী কাগজেই করুক না? আন্তর্জাতিক খ্যাতি তার নাই বা থাকল?—চাই তো কেবল একজোড়া তীক্ষ্ম, অন্তর্ভেদী, হৃদয়স্পর্শী নজর—শিল্পীর নজর, যা সুপ্ত পরমাকে চিনতে পারবে, জাগ্রত করতে পারবে। মধ্যবিত্ত বাঙালি দর্শক তাহলে ‘পরমা’তে সহসা অতটা কালচার-শক পেতেন না। কেননা বিবাহিত নারীর সঙ্গে বয়ঃকনিষ্ঠের প্রেম বাঙালি জীবনে অভূতপূর্ব দুর্ঘটনা নয়—বাঙলা চলচ্চিত্রে যদি তা অদৃষ্টপূর্ব হয়ও। রাহুল রায় প্রথমেই বিলিতিয়ানায় এলিয়েনেট করে ফেলেন দর্শকদের—নায়কের সঙ্গে আইডেনটিফায়েড না হয়ে তাঁরা রাহুলকে মনে-মনে প্রত্যাখ্যান করেন (মুকুল শর্মার অসামান্য অভিনয়ে রাহুল সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও), সাধারণ দর্শক রাহুল রায়ের সঙ্গে নিজের মিল পান না। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর মূল্যবোধগুলিও প্রত্যাখ্যাত হয়। হয়তো তাই পরমার আকস্মিক পরিবর্তন তাঁরা মেনে নিতে পারেন না। রাহুল ঈর্ষণীয়। রাহুল বাইরের লোক।

বিদেশী না হলে নায়ককে হোটেলে বসবাস করতে হত না। “হোটেলের-ঘরে-প্রেম” ব্যাপারটাকে বাঙালি মধ্যবিত্ত চিরকালই ‘নোংরা’ (অর্থের বিনিময়ে দেহসম্ভোগের অনুষঙ্গ থাকার দরুন) বলে মনে করেছেন। পরমার ঐ প্রণয়দৃশ্যই যদি ইনটারকনটিনেনটালের কামরায় না হয়ে নোনাধরা দেওয়ালের কোনো ঘরোয়া বাঙালি ছেলের ঘরে ঘটত তাহলেও কি বাঙালি দর্শক এতটাই খেপে উঠতেন? অথবা ঝরনার ধারে, “প্রকৃতির কোলে”? যেমন হিন্দি ছবিতে হয়? নিদেনপক্ষে যদি স্বামীর শয্যায় ঘটে যেত ঘটনাটা, —যেমন ‘পিকু’তে ঘটে? সেসব ক্ষেত্রে বাঙালি দর্শক আপত্তি জানান নি। ভয়ংকর ধর্ষণের দৃশ্যেও বাঙালি দর্শকের নৈতিক অবনয়নের ভীতি হয় না। রাহুলের সঙ্গে পরমার সম্পর্কটি যে লালসার নয়, সম্পর্ক অন্তরের, সেই সত্যও ঘোলাটে হয়ে গেছে দুর্ভাগ্যবশত হোটেলের কামরার অনুষঙ্গ এসে পড়ায়।

রাহুলকে মারকিন দেশ থেকে আমদানি করার ভুলে পরমার নবলব্ধ আত্মচেতনা, তার আত্মোপলব্ধি সবই মারকিন সংস্কৃতির আমদানি বলে প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে। অথচ এগুলি মর্মে-মর্মে বাঙালি মেয়ের জীবনসত্য। মারকিন জীবনদর্শন বলতে আমাদের প্রথমেই মনে হয় ধনতন্ত্রের মন্দ দিকগুলো—তার তথাকথিত দেহবাদী, সুবিধাবাদী, বস্তুবাদী আত্মাহীন জীবনদর্শন। আমাদের দুর্ভাগ্য যে ‘পরমা’র মতো একটি অসামান্য ছবি এই চিরাচরিত ধারণার কুপ্রভাবে পড়ে গিয়ে দর্শকদের কোপে পড়েছে। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠিপত্রগুলি পড়তে-পড়তে আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, দর্শকদের একাংশ চলচ্চিত্রে অপ্রিয় সত্য দেখতে পছন্দ করেন না, তাঁরা চান প্রিয় স্বপ্ন দেখতে। তাঁরা চান শত্রুর মতো সরল আদর্শবাদী ছবি—যা জীবনে ঘটে না, কিন্তু ঘটা উচিত। নশ্বর মানুষের দুর্বল অন্তর্জীবনের সৎ রূপায়ন ‘পরমা’। এ গল্প যা ঘটা উচিত তাই নয়, যা ঘটে থাকে তাকেই সৎ ভাবে গ্রহণ করার গল্প।

‘পরমা’ ছবিতে দাম্পত্য আদর্শ কে ভাঙে? পরমা? না ভাস্কর? ভাস্কর যেভাবে শয্যায় পরমাকে ব্যবহার করে সেটাই কি দাম্পত্য সম্পর্কের আদর্শ? যে ফাঁকিটা স্পষ্ট করে দেখাতে অপর্ণা দু-বার নিবিড় শয্যাদৃশ্য দেখিয়েছেন—আশ্চর্য, বেশির ভাগ সমালোচনা আর চিঠি পড়ে মনে হয় সেই মস্ত সত্যটাই অধিকাংশ দর্শকের চোখ এড়িয়ে গেছে। স্ত্রীর দেহ ভোগ করতে-করতে ভাস্কর উপভোগ করে তার কর্মক্ষেত্রের উজ্জ্বল সাফল্যের সম্ভাবনাকে—তার সমস্ত হৃদয়মন পড়ে আছে জল্পিত বিজনেস ডীলের প্রতি। অথচ কাগজে-কাগজে এই সম্পর্কটাকেই বলা হচ্ছে আদর্শ। “পূর্ণতার অভাব কোথায় পরমার জীবনে”? একটাও আদরের কথা না বলে, স্ত্রীর প্রতি বিন্দুমাত্র মনোযোগ না দিয়ে যে স্বামী স্ত্রীর দেহে উপগত হয় তাকেই “স্টিল সেকসুয়ালি অ্যাকটিভ হাজব্যানড” বলে অভিনন্দিত করি আমরা সমালোচক-দর্শকরা। ভাস্কর-পরমার প্রেমহীন শয্যাদৃশ্যে সমালোচকের মনে পড়ে যায় না বারনার্ড শয়ের সেই বিবাহের সংজ্ঞা—লিগালাইজড প্রসটিটিউশন? পরমা তার অন্নবস্ত্রআশ্রয়ের বিনিময়ে মুখে ক্রীম মেখে হঠাৎ-খুঁজে-পাওয়া স্মৃতি-জাল দূরে ফেলে রেখে, বশংবদ হয়ে স্বামীর বিছানায় চলে যায়। দ্বিতীয় শয্যাদৃশ্যের সঙ্গে ধর্ষণের মিল আছে। ঝঞ্ঝা-বিদ্যুতের তীব্র প্রতীকে অপর্ণা সেটাই হয়তো বোঝাতে চেয়েছেন। স্ত্রীর অনিচ্ছা, আপত্তি অগ্রাহ্য করে ভাস্কর তাকে ব্যবহার করে। স্ত্রী তার সম্পত্তি, যেমন খাট-বিছানা। শারীরিক সম্পর্কের ঘনিষ্ঠ দৃশ্য পরমা আর তার স্বামীর সঙ্গে দুটি, পরমা আর তার প্রেমিকের সঙ্গেও দুটি। এই দুটিতে কিন্তু পরমার ভাবভঙ্গি এবং ভূমিকা

একেবারেই আলাদা : এক জায়গাতে সে অন্যমনস্ক, শীতল, অসম্পৃক্ত ; অন্যত্র সে প্রাণবন্ত, হাসিগানে উজ্জ্বল। রাহুলের সঙ্গে তার সম্পর্কে রাহুলের মনোযোগ আছে। হৃদয়ের উন্মুখ আবেগ আছে। দেহটাই প্রধান নয়, কার দেহ সেটাই জরুরি। পরমার সাহচর্যটাই এখানে প্রধান। ভাস্করের আচরণ দেখলে কিন্তু মনে হয়—ওই সময়ে পরমার পরিবর্তে যে কেউ থাকলেই চলত। যে-কোনো অধিকৃত, বশীভূত নারীদেহ। ওই মুহূর্তে ওই সম্পর্কটিই বরং নীতিহীন। অথচ দর্শকের সহানুভূতি ভাস্করের দিকেই। কেননা সে প্রতারিত স্বামী, তার স্ত্রী অন্যের অঙ্কে শয়ন করেছে। কিন্তু পরমাও কি প্রতারিত স্ত্রী নয়? আত্মমগ্ন স্বামীর দ্বৈত শয্যায় পরমাকে দেখি একা, নিঃসঙ্গ। মিলনের মুহূর্তেও সে একা! এটা কেন যে আমাদের দর্শকদের (স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে) চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে, বোঝা কঠিন।

আমি মনে করি, রাহুল-পরমাকে শয্যায় অত বার বার না দেখালেই ভালো হত। 'পরমা' স্ত্রীমুক্তির একটি জরুরি মাইলস্টোন হয়ে থাকবে। কিন্তু এত বার শয্যাদৃশ্য দেখিয়ে অপর্ণা নারীমুক্তির সমস্যাকে একটুখানি মুশকিলেই ফেলেছেন। যাঁরা বলেন নারীমুক্তি মানেই তো ফ্রী সেকস ("ফ্রীডম তো লাইসেনস নয়")—তাঁদেরই সুবিধে হয়েছে। অথচ 'পরমা'তে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ফেমিনিসট স্টেটমেনট আছে, সৎ, সুচিন্তিত জীবনদর্শন আছে। মধ্যবিত্ত জীবনের শঠতাকে, দ্বৈত-মানকে নানাভাবে নগ্ন করে দেখানো হয়েছে। সংসার করতে-করতে যে মেয়েরা আর চিন্তাভাবনা করে না, নিজেদের নিজেরাই বন্দী করে রেখেছে, তাও বলা আছে ("কই, কিছু ভাবি না তো?")। যে-মানুষটি কিছুই ভাবে না তার জীবন মনুষ্যত্বের আদর্শে বিকশিত হয়ে ওঠে কি? সে সন্তানের সম্মানের পাত্রী হয় কি? যতই সতীত্বে, গার্হস্থ্যে, উজ্জ্বল একনিষ্ঠ জীবন যাপন করুক। সে নিজেই বুঝত না যে কতদূর "পরের হাত তোলায়" তার বাঁচা! পরমার মা বলেন—ছেলেবউ বাড়িতে না থাকলে তাঁর হাতে পয়সা থাকে না। পরমা তখন তাঁকে আর্থিক সাহায্য করে ("তোমার জামাইয়ের টাকা কি আমার টাকা নয়?")। তাঁর সেই অসহায়তার সঙ্গে পরমারও আর কোনোই তফাত থাকে না যে-মুহূর্তে ভাস্কর চৌধুরী তার প্রসারিত করুণাহস্ত গুটিয়ে নেয়। সংসার থেকে পরমাকে বয়কট করতে কোনো সময়ই লাগে না। তখনই বোঝা যায় পরমার অস্তিত্ব সংসারেও কত দূর শিকড়হীন ছিল—কেমন পরোপজীবী কৃত্রিম জীবনে সে এতকাল বেঁচে ছিল। ভাস্কর তার "জীবনযাপন" মুহূর্তেই নাকচ করে দিতে পারে—যে সংসারে সে অত জরুরি ছিল, সেই সংসারেই পরমা আবর্জনা হয়ে পড়ে। এই সত্যটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আগে সে ছিল অলংকারমাত্র। যার ফলে, গৃহিণীর অধিকারে বঞ্চিত হয়ে, প্রত্যাহৃত দায়দায়িত্বের সংসারে পরমা আর বেঁচে থাকে না। আত্মহনন ছাড়া আর পথ থাকে না পরমার। ব্যভিচারিণী স্ত্রীর চারিপাশে একাকিত্বের এবং অপমানের যে দুর্লঙ্ঘ্য দেয়াল তুলে দেয় ভাস্কর চৌধুরী, সেই দেয়াল ভাঙতে একমাত্র অস্ত্র মৃত্যুর দিকে ছুটে যেতে হয় পরমাকে।

কিন্তু মরে না। তাই দর্শকের কাছে এটা তার যথেষ্ট শাস্তি নয়। পরিচালকের ক্ষমা পেয়ে গেছে পরমা। ব্যভিচারিণী রমণীর যে আরো শাস্তি প্রয়োজন ছিল! এর পরে আবার অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পাওয়ার মতো বিপুল অপরাধ করে ফেলেছে পরমা। মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরলে, মানুষ যে একেবারে বদল হয়ে ফিরে আসে, একথা মনস্তত্ত্ববিদ ডাক্তারও কি জানেন না? অপরাধবোধ কি চিরদিনই বহন করতে হবে পরমাকে? তার স্বামী এবং পরিবারের অন্যান্য সকলেই তাকে কোনোদিনই ভুলতে দেবে না যে পরমা একবার একটি মহৎ অমার্জনীয় অন্যায় করেছিল?

অপর্ণার মুশকিল হয়েছে একটি তিনঘণ্টা সময়ের ছবির মধ্যে তিনি অনেকগুলি প্রথা ভেঙেছেন, সামাজিক বিধিনিষেধ ভঙ্গ করেছেন। একাধিক সোস্যাল ট্যাবু ভেঙে ফেলে দর্শকের সামনে কতগুলি জরুরি সমস্যা তুলে ধরেছেন। ফলে ছবির ফোকাস একটু নষ্ট হয়ে গেছে। এবং অন্ধের হস্তিদর্শনের মতো আমরা মধ্যবিত্ত দর্শকরা যার যেদিকে বেশি উৎসাহ সেই দিকে আলো ফেলে ছবিটি আংশিকভাবে উদ্ঘাটিত করছি। 'পরমা'তে অপর্ণা সেনের উত্থাপিত প্রশ্নগুলি স্পষ্ট। উত্তর দেবার দায়িত্ব তাঁর নয়।

এক : গৃহবধূর স্বারূপ্য নির্ণীত হবে কী ভাবে? একটি মানুষের ব্যক্তিগত পরিচয় নিশ্চয়ই কয়েকটি সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমে সম্পূর্ণ নয়। আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ মা, আদর্শ গৃহিণী, আদর্শ পুত্রবধূ হতেই কি মেয়েদের জন্ম? স্বকীয় ব্যক্তিত্ব—রুচি, প্রবণতা, ভালোলাগা—সব ফেলে দিয়ে আত্মবিস্মৃত হয়ে অন্যের মনের মতো হয়ে প্রথানির্দিষ্ট জীবনযাপন করাই কি বাঁচার আদর্শ হতে পারে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের জীবনে? সেটাই কি নীতিগতভাবে ঠিক বাঁচা? যে-পরিচয়গুলি সবই একমুহূর্তে প্রত্যাহৃত হতে পারে—যেহেতু সবই পতিনির্ভর—সেই পরিচয়ই কি কখনো একজন মানুষের পূর্ণ পরিচয় হতে পারে? সম্পূর্ণ নিজস্ব একটা পরিচয় থাকা একেবারেই অত্যাবশ্যক—যে পরিচয় অন্য কেউ কেড়ে নিতে পারে না। যা তারই নিজের একান্ত স্বরূপ। নিজের কাছে এবং পৃথিবীর কাছে।

দুই : স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ভিত কোথায়? দেহে? সংসারযন্ত্রের অংশ হয়ে? না, অন্তর্লোকে? দম্পতির মধ্যে একবার একজনের পদস্খলন ঘটলেই কি বিশ বছরের প্রাচীন দাম্পত্য সম্পর্কের ইমারত গুঁড়িয়ে যাবে? সেই ব্যক্তি তার নিজেরই গড়া সংসারে একঘরে হয়ে যাবে—টাকাকড়িতে, রোগীর সেবাতে, এমনকি সন্তানের শিক্ষাতে পর্যন্ত তার আর অধিকার থাকবে না? গোটা সংসারটা কেড়ে নেওয়া হবে তার হাত থেকে?—যতক্ষণ না সে মৃত্যু বেছে নেয়? আর এই অপরাধীটি যদি হতেন উপার্জনশীল গৃহকর্তা? সংসার তাঁকেও কি একঘরে করত? পারত?

তিন : পুরুষমানুষের মনে-মনে নারীর জন্য কতগুলো নৈতিক মান নির্দিষ্ট থাকবে? নিজের স্ত্রীর জন্য একটা (সতীত্বের)—সেটা সে না মানলে সে হোর ; অন্যের নারীর জন্য আরেকটা মান (সহজলভ্যতার)—সেটা না মানলেই সে বীচ। দুটো শব্দেরই অর্থ এক।

চার : আত্মকেন্দ্রিক, উচ্চাশী স্বামী অন্যমনস্কভাবে দেহমিলনের মধ্যে মনটাকে যখন সরিয়ে রাখে নিজের ব্যাবসার ব্যাপারে, সেকস্যুয়াল অ্যাকট যখন স্বামীর সাফল্য, পৌরুষ আর পারঙ্গমতার একটা প্রতীকমাত্র—যেখানে স্ত্রীর প্রতি তার মনই নেই, যেখানে স্ত্রীর ইচ্ছে-অনিচ্ছে সবই অ-জরুরি—সেই সম্পর্কই তো মলিন, পাশবিক, অপবিত্র। প্রেমহীন দাম্পত্য "মিলনের" মধ্যে এই যে কুশ্রীতা, অপূর্ণতা, স্বার্থপরতা—বাঙালি দর্শক তাকে কিন্তু নিন্দে করছেন না। বাঙালি দর্শকের প্রথা-অন্ধ চোখে ধরাই পড়ছে না যৌথ সম্পর্কের মধ্যে এই ফাঁকি। অথচ হোটেলের ঘরের দৃশ্য অমনস্ক লালসার নয়, ভালোবাসার। কিন্তু আমরা বাঙালি দর্শক স্বামীর অবৈধ শয্যাকে পবিত্র, আর হোটেলের অবৈধ শয়নকে অপবিত্র বলেই জানি। চোখে দেখেও তাই মনে-মনে দেখতে পাই না ঈশ্বরের চোখে সত্য দৃশ্যটা কী। এখানে নীতিবিষয়ক একটা অত্যন্ত জরুরি প্রশ্ন আছে : কোন্‌টা সুনীতি? দুর্নীতি কোন্‌টা?

পাঁচ : শীলা একটি অত্যন্ত জরুরি বাক্য বলে—"দ্যাখ, কোনো মানুষই অন্য কোনো মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়—সামাজিক সম্পর্ক থাকলেও।" তেমনি, মানসিক সম্পর্ক থাকলেও একজন মানুষ আরেক জনের সম্পত্তি হয়ে যায় না। ভাস্করেরও সম্পত্তি নয় পরমা, রাহুলেরও নয়। ব্যক্তিমানুষের নিজের শরীরের ওপর নিজের পূর্ণ অধিকার থাকা নিয়ে আজকের পৃথিবীতে দেশে দেশে মেয়েরা যুধ্যমান।

এই দিকটিও অপর্ণা ছুঁয়ে গেছেন।

ছয় : আরেকটি প্রথা ভেঙেছেন অপর্ণা। শাঁখাসিঁদুরে পবিত্র বঙ্গনারীর দেবীমূর্তিটি ব্যভিচারের ক্রূর আঘাতে নষ্ট করে ফেলা অপর্ণার পক্ষে ব্লাসফিমাস কর্ম হয়েছে। মাতৃমূর্তিকে প্রিয়ায় পরিণত করা অসহনীয়। তার ওপরে তিনি আরেকটি গোলমেলে প্রশ্ন তুলেছেন : প্রেমের জন্য নির্দিষ্ট বয়ঃসীমা থাকতে পারে কি? পুরুষের বেলায় হাঁটুর বয়সী মেয়ের সঙ্গে প্রেম অপরাধ নয়। কিন্তু নারীর বেলায়?

সাত : শুধুই কি বউ? বড়ো-বড়ো ছেলেমেয়ের মা পরমা। ছত্তিশগড়ের গল্প হলে বাঙালি দর্শক দিব্যি শিল্পমনস্ক হয়ে দিব্যি শান্ত অসম্পৃক্ত চিত্তে কলকাতার মঞ্চে গর্ভধারিণীর প্রতি পুত্রের কামভাব প্রকাশ করার দৃশ্যও সহ্য করতে পারেন, "নীতি গেল, সর্বনাশ হল" বলে চেঁচান না। অয়দিপাউসও তাঁদের পরিচিত। কিন্তু "পুত্রবৎ" ভাশুরপোর বন্ধুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার মতো নোংরামি বাঙালি দর্শক দেখেন নি। কেননা পরমা গ্রীকও নয়, ছত্তিশগড়িও নয়—পরমা বাঙালি। কুড়ি-পেরুলেই-বুড়ি বাঙালি মেয়ের চল্লিশোর্ধ্বে রূপসী থাকাটাই অপরাধ, প্রেমে পড়া তো অমার্জনীয়। তার প্রেমিক আবার বয়সে ঢের ছোটো। তবু, ভাশুরপোর বন্ধু না হয়ে স্বামীর বন্ধু হলেও বা কথা ছিল! একসঙ্গে কতগুলো প্রথা-ভাঙা সহ্য করব আমরা?

আট : আর্থিক স্বাবলম্বনের চেষ্টা পরমার যৌন স্বেচ্ছাচারের সুযোগ পাবার উদ্দেশ্যে—এমন চিঠি অনেক চোখে পড়েছে। একথা বলা বাহুল্য, অর্থ উপার্জন করলেই যে বাঙালি মেয়ে সামাজিকজীবনে স্বাধীন হয় না, "মহানগর", "একদিন প্রতিদিন" ইত্যাদি ছবিতে একথা অনেকদিন থেকেই আমাদের জানা, তেমনি স্বেচ্ছাচারের সুযোগ পাওয়ার জন্যও সেটার দরকার নেই। হিন্দি ছবির নায়িকারা চাকুরে হন না। কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা স্বাধীনতার জন্য একটি অত্যাবশ্যক ধাপ। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি কোনো দেশ বা কোনো জাতি—প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই। নিজের অন্নবস্ত্রের সংস্থানটুকু নিজেই করবার মতো শক্তি না থাকলে ব্যক্তিকে সামাজিক স্বাধীনতা হারাতে হয়, দেশকে হারাতে হয় অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক স্বাধীনতা। ছ-শো টাকা ভাস্কর চৌধুরীর স্ত্রীর পক্ষে তুচ্ছ হলেও একজন মানুষের একার অন্নবস্ত্রের পক্ষে যথেষ্ট। আর্থিক স্বাবলম্বিতা মানুষের মনে শক্তি সঞ্চার করে। আরেক বার ভাস্কর চৌধুরী যদি পরমার হাত থেকে পরমার অস্তিত্ব কেড়ে নেয়, তাহলে পরমাকে আর মৃত্যুর কাছে আশ্রয় নিতে হবে না। তার নিজস্ব একটি কর্মলোক, একটি জীবনধারা বাকি থাকবে।

এটি নারীমুক্তির ঘটনা নয় ; এই চাকরিটুকু ব্যক্তির মুক্তির প্রতীকী অবলম্বন।

নয় : কর্তিতকেশা পরমা হাসপাতালে নবজন্ম লাভ করে। মৃত্যুর ঘাট থেকে ফিরে এসে মানুষ আবার তার পুরনো খোলসে ঢুকতে পারে না। অপর্ণা দেখাতে চেয়েছেন, মৃত্যুর সামনাসামনি দাঁড়ানোর পরে একজনের ব্যক্তিত্বে কত

দূরে বদল হয়ে যায়। এখন যে পরমা সত্যিই পরিণত, তার আর রাহুলের ভালোবাসার লাঠিটুকুও দরকার নেই। এখন সে আবেগের দিক থেকে স্ব-নির্ভর। নিজের পায়েই সোজা হয়ে দাঁড়াতে শিখে গেছে। জীবনের মূল-সত্যগুলি জানা হয়ে গেছে তার। ভাস্করের সংসারের ফ্রেমের মধ্যে পরমার যে সংকীর্ণ অস্তিত্ব ছিল (এখানে ফ্ল্যাশব্যাকে পরমার চেনা ঘরদোর, বিছানা, রান্নাঘর দেখানো খুবই সুন্দর হয়েছে) আর সেখানে আঁটবে না পরমাকে। জীবনমরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে অনেক বিস্তৃত বিপুল এক দিগন্তের সন্ধান পেয়েছে পরমা। শুরু হয়েছে তার নতুন করে বাঁচা। নিজের জন্যে বাঁচা। আলাদা একজন মানুষ হিসেবে বাঁচা—স্ত্রী, মা বা প্রেমিকা হয়ে নয়। তাই তার সামনে বারবার আসে খোলা আকাশ, আর সামনে দাঁড়ায় একটি নাম-ফিরে-পাওয়া বাড়ন্ত উজ্জ্বল চারাগাছ। পরমা তার হারানো নামটি খুঁজে পেয়েছে। আইডেনটিটি ক্রাইসিস কথাটা খুব শোনা যায় আজকাল—'পরমা' এক গৃহবধূর আইডেনটিটি ক্রাইসিসের গল্প। কিন্তু সেই ছবি উপলক্ষে বিতর্কের মধ্য দিয়ে দুর্ভাগ্য- অথবা সৌভাগ্য-বশত পুরো বাঙালি মধ্য-বিত্ত সমাজের আইডেনটিটি ক্রাইসিস-টাই যেন ফুটে উঠেছে—দর্শকদের 'চিঠিতে' ধরা পড়েছে আমাদের হিপোক্রিসি, আমাদের নীতিহীনতা, এবং সত্যদর্শনের অনিচ্ছা।

দশ : অপর্ণা আরেকটা কথাও জানিয়েছেন। নতুন করে টাটকা জীবন আরম্ভ করার দিন কখনো ফুরিয়ে যায় না। মধ্য-চল্লিশেও নিজেকে নতুন করে গুছিয়ে নেওয়া যায়। পরমার নব-লব্ধ জীবনবোধের মধ্যে ফাঁক নেই। অভিজ্ঞতার আলোকবাতাস লেগে তার একটি সমসাময়িকতার জীবনদর্শন গড়ে উঠেছে। এবং গড়ে-ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে পরবর্তী প্রজন্মের সঙ্গে দূরত্ব ঘুচে গেছে পরমার। জননী আর সন্তান—দুটি পরিণত পরিপূর্ণ নারী পরস্পরের পাশে এসে দাঁড়ায় খোলা আকাশের সামনে—পারস্পরিক সম্মান এবং সহৃদয়তার আশ্বাস নিয়ে। পরমারই রক্তমাংস যেন ভবিষ্যতের পরমাকে শক্তি যোগাচ্ছে।

কিন্তু পরিচালক যদি পরমাকে শেষ পর্যন্ত এভাবে মুক্তি না দিয়ে শাস্তি দিতেন, তাহলে বিতর্ক এত দূর গড়াত না। চারুলতা মনে-মনে ব্যভিচারিণী, কিন্তু সেও শাস্তি পায়। চিরনিঃসঙ্গ এক দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে স্তব্ধ, শৃঙ্খলিত হয়ে যায় দিনগুলি তার। বিমলার ব্যভিচারের শাস্তি তার কর্তিতকেশা বৈধব্যমূর্তি। পিকুর মায়ের শাস্তি তার শ্রীহীন, স্থূল, রুক্ষ প্রেমিকেই নিহিত—তা ছাড়া শ্বশুরের নির্দয় সেবাহীন মৃত্যুতে। তার বিবেক কখনো মুক্ত হবে না। পিকুর প্রতি অপরাধবোধে তাকে কাঁদতেও দেখেছি। তাই দর্শক তাদের নিয়ে আরো রাগারাগি করেন না। কিন্তু পরিচালকের আবার সেখানেও ভুল। তিনি পরমাকে বয়কট করিয়ে সংসারে শাস্তি দিয়েছেন, আত্মহত্যা করিয়ে আত্মিক শাস্তির পাটও চুকিয়েছেন। "আমি অন্যায় করেছি, আমাকে শাস্তি দাও" বলিয়েছেন, এবং তার পরেই ঠেলে দিয়েছেন মৃত্যুর মধ্যে। কিন্তু তারও পরে, নতুন ব্যক্তিত্বে, আক্ষরিক অর্থেই নবলব্ধ জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন নতুন এক পরমাকে—যে স্বপ্নোত্থিতের গলায় বলে ওঠে: "কিন্তু আমার তো কোনো অপরাধ-বোধ নেই!" অপরাধ যার ছিল, সে পরমাও তো আর নেই। এই পরমার কাছে রাহুল রায়েরও অস্তিত্ব মুছে গেছে, বাতাসে ভেসে গেছে তার স্মৃতি।

অপর্ণা সেনের 'পরমা' আমাদের সবাইকে আরেকটু সৎ হতে শেখাতে চেয়েছিল। শিল্পের যা উদ্দেশ্য। সেটাও ভুল হয়েছিল।

নবনীতা দেবসেন

চিত্রকলা

বিশ্বপথিক শুভাপ্রসন্ন

শিল্পী শুভাপ্রসন্নর বয়স এখনও চল্লিশ স্পর্শ করে নি। কিন্তু এরই মধ্যে তিনি ভারতীয় পাঁচজন শিল্পীর এক-জন নির্বাচিত হয়ে ঢাকায় কমনওয়েল-থের প্রতিনিধিত্ব করতে চলেছেন। সম্প্রতি তাঁর নিজের বাড়ির গ্যালারিতে চতুর্দশতম প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এর আগে ক্যালকাটা আর্ট গ্যালারিতে, ম্যাকসমুলার ভবনে, আকাদেমি অব ফাইন আর্টসে শিল্পীর একক প্রদর্শনী হয়েছে একাধিক। কলকাতায় ছবি প্রদর্শনীর গ্যালারির সংখ্যাবৃদ্ধি করার ইচ্ছা শিল্পীর দীর্ঘ-দিনের—হয়তো-বা এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। সেই অভিপ্রায়েই নিজের বাড়ির স্টুডি-য়োর নিজস্ব পরিবেশে এবারকার আয়োজন করেছিলেন শিল্পী। মধ্য-কলকাতার কলেজ রো-এর একটি বাড়ি আর্টস একর-এর দৌলতে অনেকেরই পরিচিত। সেই বাড়িতেই বিলিতি পাতাবাহার, অরকিডে সাজানো একতলার ছিমছাম ঘর। ঝকঝকে পরিষ্কার ঠাণ্ডা মেঝেতে নীচু নরম কুশন পাতা, দুটি মাঝারি আকারের দেওয়ালে শোভা পাচ্ছে শিল্পীর ইদানীং কালের ভাবনাগুলি। কোনো চিত্রেরই নামকরণ করেন নি তিনি, এবং সেইহেতু প্রথাগত কোনো ক্যাটা-লগও নেই।

যুদ্ধোত্তর শিল্পীদের মধ্যে যে আন্তর্জাতিকতার বোধ লক্ষ করা যায়, তা ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে বিশেষ-ভাবে সক্রিয় শুভাপ্রসন্নর মধ্যে। মনে-প্রাণে তিনি নিত্যভ্রমণপর এবং বিশ্ব-পথিক। সুতরাং তাঁর শিল্পের কথা-মালাও জঙ্গমতায় জারিত। শিল্পী-জীবনের নাতিদৈর্ঘ্যের মধ্যেও বোধ-বোধান্তরে বারংবার বিবর্তিত হয়েছেন তিনি। সমসাময়িক সমাজ, সংশ্লিষ্ট মানুষ, দিনযাপনের বিপর্যয়ের নৈমিত্ত-কতা তাঁকে ভাবিত করেছে নিত্য নতুন নাগরিক যন্ত্রণায়। যতদূর মনে করতে পারি, 'ম্যান অ্যানড দ্য স্পেস'-এ সামূহিক সর্বনাশের আরব্ধ সূত্রকে ঘোষণা করেছিলেন শিল্পী। এরপর ক্রমপরিণতির পথে যথাক্রমে 'ইলুশন' 'অ্যাবোর্ড', 'টাইম', 'র‍্যাপড', 'অ্যাম-ফিবিয়াস', 'দ্য ফ্লাই উইংস' পার হয়ে, বর্তমান সিরীজ 'দ্য ব্ল্যাকে' তাঁর সামগ্রিকতা ও বৈশ্বিকতার নিজস্ব সংকেত খুঁজে পেয়েছে।

তেলরঙের পেইন্টিং-এর পাখিগুলি-তে শুভাপ্রসন্ন প্রধান করে তোলেন একসপ্রেশনিসট আক্রোশ। বলাই বাহুল্য, পাখিগুলির চেহারা রোম্যান-টিক 'ব্লু বার্ড'-জাতীয় ধারণার বিপরীত মেরুতে। মনে হয়, প্রাগৈতি-হাসিক অতিকায় পাখিদের উত্তরকালীন প্রজাতি—যারা প্রতি মুহূর্তে জীবন-ধারণের প্রচণ্ড লড়াইয়ে লিপ্ত। তারা সংঘবদ্ধ, তথাপি পরস্পর ঈর্ষান্বিত, সন্দিগ্ধ, ছিদ্রান্বেষী। প্রতিটি পাখির একসপ্রেশন যেমন হিংস্র, তেমনিই প্রাতিবাদিক। যেন পরস্পরকে গ্রাস করার বা পরাস্ত করার গোপন মতলবে তারা সতর্ক, ফন্দিবাজ। অবশ্যই এই পাখিরা আধুনিক সমাজবদ্ধ মানুষেরই প্রতীকী রূপায়ন। ফবিস্ট রঙের গাঢ় প্রলেপে তাদের তীক্ষ্ণ দাঁত, খরনখর, ক্রুদ্ধ চোখের দৃষ্টি তাৎপর্যময় হয়ে দাঁড়ায়।

সম্ভাব্য তৃতীয় মহাযুদ্ধের বিভী-ষিকায় আতঙ্কিত ভবিষ্যৎ এবং পার-মাণবিক অস্ত্রপ্রতিযোগিতার দুর্লঙ্ঘন বর্তমান বিশেষভাবে সাপ্রেসড কনসাস-নেসে শিল্পী শুভাপ্রসন্নের চিন্তার সমীপবর্তী হয়েছে বলে মনে হল। বিচ্যুত অস্তিবাদের অনিশ্চিতে দাঁড়িয়ে তিনি পৃথিবীকে দেখেন নঞর্থকতায়—রক্তাক্ত, দীর্ণ, ধ্বস্ত—এবং তা দেখাতে প্রধানত চারকোলের মিডিয়াকেই শিল্পী যোগ্য মাধ্যম হিসেবে নির্বাচন করে নেন। একই মানুষের মধ্যে সাদা-কালো দুটি ভিন্ন চেহারা, ভিন্ন সত্তা শিল্পী লক্ষ করেন। এই সিরীজে প্রধান ভূমিকার দায়িত্ব নেয় একজন মূকাভি-নেতা, একজন নায়ক। ইন্দ্রজালের রঙবদলের মতো বারবার প্রকটিত হয় তাদের ভাঁড়ামি, তাদের প্রতারণা, সমাজকে এবং প্রতিবেশী মানুষকে বোকা বানানোর পরম তৃপ্তি আর কদর্য উল্লাস। শূন্যগহ্বর নায়ক শিল্পীর প্রিয়তম এবং অবধারিত অনুষঙ্গ হয়ে ফিরে-ফিরে আসে। সাধারণ জনতা তাকে রাজমুকুট পরায়, অভিনন্দন দিয়ে শীর্ষে তোলে, পর-ক্ষণেই দেখা যায় তার বুলেটবিদ্ধ দেহ। কোনো তাৎক্ষণিক শৌখিন বিলাসে ভর করে নায়ক কখনো হালকা রঙিন প্রজা-পতি ধরতে যায়, পরমুহূর্তেই তারই নেপথ্যের অপরিত্যাজ্য দুর্ভেদ্য অন্ধ-কারকে সে আবিষ্কার করে। কখনো পৃথিবীর সবুজ জমিতে লুটিয়ে পড়ে থাকে তার রক্তাক্ত, খণ্ডিত শরীর।

মুণ্ডহীন পুরুষ শিল্পীর একটি প্রিয় প্রতীক, বক্তব্য প্রকাশের অনুকূল বাহন। এ ছাড়াও প্রায় প্রতিটি ছবির ক্যানভাসের প্রান্তেই একটি কীট--যা গোপনে দংশন করে নিহিত শুভবুদ্ধি। কবন্ধ পুরুষ নেপথ্য শক্তির অদৃশ্য-হস্তচালিত, পুত্তলিকাবৎ—অব্যর্থ চিন্তা, স্বাধীন সিদ্ধান্ত, সঠিক ঔচিত্য নির্বাচনে পরাঙ্মুখ, এবং প্রায়শ ব্যর্থ তার ভিত্তিহীন সমাধান। এইরকম নিষ্কন্ধেরাই মিছিলবদ্ধভাবে মিশে যেতে থাকে অবারিত দিগন্তে। তাদের দৃষ্টি থাকে বন্দী, স্বচ্ছতা বিসর্জন দিয়ে তারা অন্ধস্রোতে চলে অনির্দেশে। চর্মচক্ষু নয়, অন্তর্নয়নের প্রসাদবঞ্চিত বোধহীন মানুষ একেকটি মেকি সামা-জিক অস্তিত্বের ভূমিকায় অভিনয় করে, কানামাছির মতো দৌড়োয় নিশানা-বিহীন অন্ধকার গন্তব্যে।

বর্ণালী দাস

পথিকৃতের প্রয়াণ

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় স্মরণে

রবীন্দ্রজীবনীর পরিশিষ্ট হিসেবে শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীর ইতিহাস সংকলনের কাজে তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে বিশেষ সাড়া না পেয়ে প্রভাত-কুমার মন্তব্য করেছিলেন, "আমরা তত্ত্বালোচনায় যতটা আনন্দ পাই, তথ্য অনুসন্ধানে ততটা উৎসাহ পাই না।" এবং এই কারণেই বোধ হয় যাঁরা তথ্য অনুসন্ধানে দীর্ঘ জীবন নিযুক্ত থাকেন তাঁরা আমাদের কাছে প্রথম শ্রেণীর স্রষ্টার মর্যাদা পান না। তা নইলে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কাছে আমরা আর-একটু বেশি কৃতজ্ঞ থাক-তাম। বাঙালির ভাষা সাহিত্য ইতিহাস এবং সংস্কৃতি বিষয়ে যে কয়খানা গ্রন্থ আমাদের গর্বের বস্তু এবং পরম সহায়, তাদের মধ্যে প্রথম সারিতে পড়বে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'ওরিজিন অ্যানড ডেভলপমেনট অব বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ', হরিচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ', শ্রীসুকুমার সেনের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যসাধকচরিত-মালা', রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'দ্য হিস্টিরি অব বেঙ্গল', নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙ্গা-লীর ইতিহাস' এবং প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনী'। এ তালিকায় হয়তো আরও দুয়েকটি নাম যুক্ত হতে পারে, তবে তালিকা দীর্ঘ

হবে না কিছুতেই। উল্লিখিত গ্রন্থগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এগুলি যে নিছক তথ্যের সংকলন নয় তা স্বীকার করতে হবে। উল্লিখিত নামগুলির মধ্যে বেশ কয়েকজন আছেন যাঁদের বিধিবন্ধ শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ ছিল না বিদ্যা বা গবেষণার ক্ষেত্রে।

প্রভাতকুমার এই ধারারই মানুষ ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় যোগদানসূত্রে গিরিডির ইস্কুল থেকে বিতাড়িত হয়ে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে প্রভাতকুমারের বিধিবন্ধ শিক্ষার সমাপ্তি। তার এক বছরের মধ্যে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক হিমাংশুপ্রকাশ রায়ের পরামর্শে প্রভাতকুমার শান্তিনিকেতন আসেন। অচিরে এখানে শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন, ছ বছর পড়িয়েছিলেন প্রধানত ইতিহাস। প্রথম বই লেখেন ইতিহাসের গল্প নিয়েই, ভূমিকা লিখে দেন যদুনাথ সরকার। বাইশ বছর বয়সের জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথ আশীর্বাদ করেন :

প্রভাতের 'পরে দক্ষিণ করে
রবির আশীর্বাদ—
নূতন জনমে নব নব দিনে
তোমার জীবন করুক নবীন
অমল আলোকে দূরে হোক লীন
রজনীর অবসাদ।

১৯১৮ সালে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, "লাইব্রেরি দেখিবার লোকের দরকার।" এর পূর্বে প্রভাতকুমার কলকাতার সিটি কলেজে কিছুদিন গ্রন্থাগারিকের কাজ করেছিলেন। সেই সুবাদেই পাঠভবনের শিক্ষকতার সঙ্গে গ্রন্থাগারের ভার নিলেন। এই গ্রন্থাগারিকের দায়িত্বভার থেকে অবসর নেন ১৯৫৪ সালে। শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারের সমৃদ্ধি প্রভাতকুমারের হাতে। এবং গ্রন্থাগার পরিচালনার সূত্রেই তাঁর তথ্যানুসন্ধান এবং গবেষণার সূচনা।

১৯২১ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'ভারতপরিচয়' যার ভূমিকায় প্রফুল্লচন্দ্র রায় লেখেন, "এতগুলি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের একত্র সমাবেশ প্রায় দেখা যায় না।" ভারতপরিচয়ের ধারায় প্রকাশ করেন দুই খণ্ডে 'বঙ্গ-পরিচয়' (১৯৩৬-১৯৪২) এবং ১৯৬৬ সালে 'পৃথিবীর ইতিহাস', প্রথম খণ্ড। কোষগ্রন্থ রচনাতেও হাত দিয়েছিলেন প্রভাতকুমার। ১৯৪০ সালে 'জ্ঞানভারতী'র প্রথম খণ্ডের ভূমিকা লিখে দেন রবীন্দ্রনাথ। 'জ্ঞানভারতী' দ্বিতীয় খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। এ কাজ তিনি সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। আরেকখানি ভৌগোলিক কোষ সংকলন করেছিলেন 'নবজ্ঞান-ভারতী' নামে। তাঁর আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ১৯২৫ সালে প্রকাশিত 'ভারতে জাতীয় আন্দোলন'। যে সময়ে 'ভারতে জাতীয়-আন্দোলন রচিত হয় তখনও বিদেশী-শাসনমুক্তি কত দূরে বা কোন্ পথে তার স্পষ্ট ধারণা ছিল না। সে সময় এ-জাতীয় গ্রন্থ রচনা সাহসের কর্ম সন্দেহ নেই। ভূমিকায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লেখেন, "গ্রন্থখানি রচনার জন্য লেখককে বহু তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। বহিখানিতে এমন অনেক কথা দেখিলাম যাহা আমি জানিতাম না।"

ইতিহাস ছিল প্রভাতকুমারের অনুরাগের বস্তু। এবং সে ইতিহাস চর্চার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল নির্ভেজাল দেশপ্রীতি। তাঁর নানা গ্রন্থে তাই দেশপরিচয় এবং দেশোদ্ধারের সংগ্রামের ইতিহাসের কথা সংকলিত হয়েছে। ইতিহাস যেমন তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল, তেমনি বৃত্তিতে তিনি ছিলেন গ্রন্থাগারিক। গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব বহন করতে গিয়ে তিনি কোষগ্রন্থ বা এনসাইক্লোপিডিয়ার প্রয়োজন অনুভব করেন। তাঁর জ্ঞানস্পৃহা কখনোই আধুনিক বিশেষজ্ঞদের মতো কুঠুরীরুদ্ধ ছিল না। ছিল গ্রন্থাগারিকসুলভ এনসাইক্লোপিডিক। গ্রন্থাগারের প্রয়োজনেই কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হবার লক্ষ্য তাঁর ছিল না। তাই তাঁর 'ভারত-পরিচয়', 'বঙ্গপরিচয়', কোষগ্রন্থ বা 'ভারতে জাতীয় আন্দোলন' প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত হবে না। কিন্তু সাধারণ পাঠকের কৌতূহলী প্রশ্নের ভিত্তিতে সংকলিত তথ্যাশ্রয়ী এই গ্রন্থগুলি প্রাথমিকতথ্যসংবলিত প্রয়োজনীয় গ্রন্থ হিসেবে পঠিত হবে দীর্ঘদিন।

প্রভাতকুমার বিদ্যার কোনো ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন না—এ কথাও যে ভুল তা জানেন যাঁরা তাঁর বাঙলা দশমিক বর্গীকরণ বা হিন্দী দশমিক বর্গীকরণ বই দুখানির খবর রাখেন। ডিউই-পদ্ধতির ভিত্তিতে বাঙলা দশমিক বর্গীকরণ প্রভাতকুমারের এক অতি প্রয়োজনীয় সংযোজন। গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাই প্রভাতকুমার এক দিক্‌পাল বিশেষজ্ঞ হয়ে রইলেন। কেবল শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগার নয়, শান্তিনিকেতনের আশ্রমগুরুর সান্নিধ্যে প্রভাতকুমারকে আরেক বিশেষজ্ঞের ব্রতে উদ্বুদ্ধ করেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনীগ্রন্থ রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন প্রভাতকুমার ১৯৩৩ সালে—তখন "রবীন্দ্রনাথ আমাদের মধ্যে রহিয়াছেন।...জীবিত কোনো স্রষ্টার জীবনী লেখাই কঠিন, রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মনীষী কবির জীবনী কোনো কালেই যথাযথ লেখা অসম্ভব।...আমাদের কাহারো কাছে তিনি হয়তো কেবলমাত্র কবি বা নাট্যকার বা রাজনৈতিক ; কেহ বা তাঁহাকে শিক্ষক, ধর্মগুরু, বৈয়াকরণ, সংগীতকার বা নৃত্যকলাবিদ্ এইরকম কোনো বিশেষ একটি পরিচয়ে নির্দিষ্ট করিয়া জানিতে চাই।...বিশ্লেষণ করিয়া খণ্ড খণ্ডভাবে তাঁহাকে জানিবার চেষ্টায় বিপদ আছে—তাঁহার নানান কর্ম এবং সৃষ্টির গভীর ঐক্যসূত্র ধরা না পড়িলে তাঁহার প্রতিভাকে স্ববিরোধী বলিয়া ভ্রম হইতে পারে।" এই আশঙ্কা সত্ত্বেও প্রভাতকুমার রবীন্দ্রজীবনী রচনার দায়িত্ব স্বীকার করেছিলেন। "রবীন্দ্রনাথের জীবনী বাংলায় এভাবে লিখিবার চেষ্টা পূর্বে হয় নাই। ইহার মধ্যে দোষ ত্রুটি অনেক আছে... কিন্তু সাধ্যমতো প্রয়াসের নিশ্চয়ই কিছু মূল্য আছে।...সত্য প্রকাশিত হয়, ইহাই আমাদের কাম্য, এখানে ব্যক্তিগত মান-অভিমানের স্থান নাই।" ভূমিকায় এই প্রত্যয় নিয়ে সেদিন দুখণ্ডে যে রবীন্দ্রজীবনীর পরিকল্পনা প্রভাতকুমার করেছিলেন তা নানা কারণেই দুঃসাহসিক। ১৯৩৬ সালে রবীন্দ্রজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডে প্রভাতকুমার আবার বললেন, "জীবিত কবি, তারপর রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বহুমুখীন প্রতিভাশালী কবি ও মনীষীর অধুনাতম জীবনেতিহাস লেখা খুব কঠিন ; সুতরাং যাহা লিখিয়াছি তাহাকে ইতিহাস বলা যায় না, বলা উচিত ক্রনিকেল। পাঠকদের সম্মুখে তাঁহার বিচিত্র কর্মময় কাব্যময় জীবনের ঘটনাগুলি সাজাইয়া দিয়াছি।

"ঘটনাগুলি সংগ্রহ করা খুব সহজ নয়, কারণ আমরা 'জাতে' ঐতিহাসিক নই, আমাদের ধাতে নাই কোনো জিনিসকে ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখা।"

উদ্ধৃত উক্তি থেকে স্পষ্ট হয় প্রভাতকুমার তাঁর আরব্ধ কাজের গুরুত্ব এবং জটিলতা সম্বন্ধে কতখানি সচেতন ছিলেন, তাঁর সাধ্যের সীমা সম্বন্ধেও তিনি নির্মোহ ছিলেন। এই দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত রবীন্দ্রজীবনী যখন সম্পূর্ণ হয়, রবীন্দ্রনাথ তার পরেও পাঁচ বছর জীবিত ছিলেন। এবং এই পাঁচ বছর তাঁর সৃষ্টি এবং কর্ম নিষ্ফলা ছিল না। সূচনায় রবীন্দ্রজীবনী দুই খণ্ডে কবির ৭৫ বছরের জীবনবৃত্তান্ত ছিল, পরবর্তী কালে বহু তথ্য সংযোজিত এবং কিছু সংশোধিত হয়ে এই রবীন্দ্রজীবনী চার খণ্ডে সম্পূর্ণ হয়েছে ১৯৫৬ সালে।

রবীন্দ্রজীবনী যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখনও শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রভবনের সংগ্রহের সূত্রপাত হয় নি। রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলীর অধিকাংশই তখন কেবল অসংকলিত নয়, অনাবিষ্কৃত। শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'জীবনস্মৃতি'র সম্পাদনা করেছেন অনেক পরে। ঠাকুরপরিবারের হিসাবের খাতাপত্রে প্রবেশের অধিকারও তখন সুদূরপরাহত। প্রভাতকুমারের তথ্যানুসন্ধানের ভিত্তি তখন (১) রথীন্দ্রনাথ-কর্তৃক সংগৃহীত প্রেস-কাটিং, (২) প্রবাসী এবং মডার্ন রিভিউয়ে প্রকাশিত তথ্যাদি, (৩) বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি এবং বিশ্বভারতী নিউজ, এবং (৪) কিছু ভ্রমণসঙ্গীর ডায়রি। এইসব ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তথ্য বিচার করে প্রভাতকুমার যে জীবনীগ্রন্থ রচনা করেন তা স্বাভাবিকভাবেই সম্পূর্ণতা দাবি করতে পারে না। পরবর্তী কালে নানা সূত্র থেকে বহু নতুন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, তার ফলে রবীন্দ্রজীবনীর উপকরণ ক্রমশ সমৃদ্ধ হচ্ছে। পাণ্ডুলিপি, লিখিত এবং প্রাপ্ত চিঠিপত্র, সমসাময়িক পত্রপত্রিকার কাটিং, সমসাময়িক কালের মানুষদের স্মৃতিকথা, সরকারি মহাফেজখানায় রক্ষিত দলিল বা পারিবারিক হিসাবের খাতা, রবীন্দ্রজীবনী রচনার পক্ষে যা অপরিহার্য, তার সামান্যই প্রভাতকুমারের আয়ত্তে ছিল। সুতরাং তাঁর জীবনীতে যদি তথ্যের অপূর্ণতা থেকে থাকে তার জন্য প্রভাতকুমার দায়ী নন। এসব অপূর্ণতা সত্ত্বেও প্রভাতকুমারের রবীন্দ্রজীবনীর সবচেয়ে বড়ো গুণ "যাঁহার জীবনচরিত এখানে আখ্যাত হইয়াছে" তার সামগ্রিক পটভূমিকা এবং কাঠামো। সেখানে প্রভাতকুমার যে স্বচ্ছ এবং নিস্পৃহ ঐতিহাসিকের দৃষ্টি নিয়ে তাঁর বিষয়কে সাজিয়েছেন তা পরবর্তী কালের জীবনীকারদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ তথ্যের অপ্রতুলতা প্রভাতকুমারের রবীন্দ্রজীবনী সংকলনে যে বাধা সৃষ্টি করেছে, তার চেয়ে অনেক বড়ো সমস্যা তাঁর সামনে ছিল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় শান্তিনিকেতনে কবির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থেকে ঐতিহাসিকের স্বচ্ছ নির্মোহ নিস্পৃহ দৃষ্টিতে রবীন্দ্রজীবনকে দেখা একমাত্র প্রভাতকুমারের পক্ষেই সম্ভব ছিল। তাই তিনি প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় ঘোষণা করতে পেরেছিলেন, "সত্য প্রকাশিত হয়, ইহাই আমাদের কাম্য, এখানে ব্যক্তিগত মান-অভিমানের স্থান নাই।" এবং এই প্রত্যয় যে তাঁর কত দৃঢ় ছিল তা রবীন্দ্রজীবনীর কোনো প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য সত্ত্বেও প্রভাতকুমারের ঐতিহাসিক সত্তার স্বসিদ্ধান্তে অটল থাকার মধ্যে প্রমাণিত হয়।

রবীন্দ্রজীবনী প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ কোথাও মন্তব্য করে থাকবেন, "ওই গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের জীবনী নহে, উহা দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্রের কাহিনী।" শুধু তাই নয়, "ঠাকুরপরিবারের বিস্তৃত আলোচনাংশ পাঠ করিয়া কবি জীবনীলেখককে ওই অংশ পরিশিষ্টে সংযোজিত করিবার নির্দেশ দেন।" কিন্তু বস্তুবিচারী ঐতিহাসিকের বিচারে কবির সে নির্দেশ লঙ্ঘন করে "কবির বহুমুখী প্রতিভার অভিব্যক্তির জন্য তাঁহার পূর্বপুরুষদের দোষ ও গুণ সমভাবে দায়ী।...সেইজন্যই আমরা রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষগণের কাহিনীপর্বটি অবান্তরজ্ঞানে পরিত্যাগ ও পরিশিষ্টে সংযোজন করিতে পারিলাম না, গঙ্গোত্রী হইতেই আমরা যাত্রা শুরু করিলাম।" রবীন্দ্রনাথের আপত্তি বা ভিন্নমত সত্ত্বেও যে প্রভাতকুমার তাঁর বস্তুবাদী ইতিহাস-বিচারের উপর অধিক আস্থা রেখে এই অংশ "নিরর্থক বা অপ্রাসঙ্গিক" মনে করেন নি, সেইখানেই রবীন্দ্রজীবনকার হিসেবে প্রভাতকুমারের যথার্থ কৃতিত্ব, যার ফলে তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রবেশক' আজও বাঙালির কাছে অপরিহার্য গ্রন্থ।

প্রভাতকুমার একশো দশ বছর বাঁচবার ইচ্ছা প্রায়ই প্রকাশ করতেন। এ ইচ্ছাকে নিছক দেহধারণের সেন্টিমেন্টাল ইচ্ছা বলে কখনো মনে হয় নি। কর্মী প্রভাতকুমার তাঁর আরব্ধ কাজগুলি সম্পূর্ণ করতে ব্যাকুল ছিলেন। তাঁর প্রস্তুয়মান রবীন্দ্রদিনপঞ্জী এবং রবীন্দ্র-

জীবনীর সংশোধিত সংস্করণের জন্য তিনি যেভাবে আগ্রহ প্রকাশ করতেন তা থেকে তাঁর ইতিহাসচেতনারই পরিচয় পাওয়া যেত। নবলব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে তাঁর রবীন্দ্রজীবনী, গানের কালানুক্রমিক সূচী বা দিনপঞ্জী তিনি সমৃদ্ধ করে যেতে পারলেন না—সেই বিচারে তাঁর তিরানব্বই বছর বয়সে মৃত্যুকেও অকালমৃত্যু বলতে হয়। কারণ এই পরিমার্জন এবং পরিবর্ধনের কাজ হবে কি না, এই সংশয়েই প্রভাতকুমারের মৃত্যু আমাদের কাছে বিশেষভাবে শোচনীয়।

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

পাঠকদের প্রতি

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত 'চতুরঙ্গ'র প্রধান সম্পাদকের পদ ত্যাগ করেছেন। মাসিক চতুরঙ্গর প্রকাশে তাঁর সুবিবেচিত পরামর্শ এবং আন্তরিক সহায়তার কথা আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য ব্যক্তিগত কারণে 'চতুরঙ্গ' সম্পাদনার দায়িত্ব ত্যাগ করেছেন। তিনি বেশ কিছুকাল ত্রৈমাসিক চতুরঙ্গ সম্পাদনা করেছিলেন, পরে কয়েক মাস মাসিক চতুরঙ্গও সম্পাদনা করেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রকাশক, চতুরঙ্গ

WHEN AN ENGINEERING JOB HAS GOT TO BE DONE ON TIME

YOU CAN RELY ON TEXMACO

For a time bound engineering job Texmaco has both capacity and expertise. And maintaining delivery schedule is our forte. Time and again our performance has proved this.

15 km away from the heart of Calcutta lie four works of Texmaco, employing over 8000 people, run by a highly qualified team of professionals.

Today,it ranks as a leading industrial complex in the country engaged in the manufacture of a diverse range of sophisticated engineering products: textile machinery, rolling stock, boilers, hydraulic steel structures, sugar plants, pressure vessels, heat exchangers, road rollers, coal mining machinery, steel and grey iron castings etc. Texmaco has executed prestigious contracts for overseas projects financed by World Bank and Asian Development Bank in face of international competition.

Every challenge Texmaco takes as an opportunity.

Texmaco—an Industry for Industries

TEXMACO LIMITED

Calcutta 700 058

Regional Offices: Ahmedabad Bombay Coimbatore Madras New Delhi

LEAS/TEX/5/84